অষ্টম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৬৩ সন

*   *   *   *

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

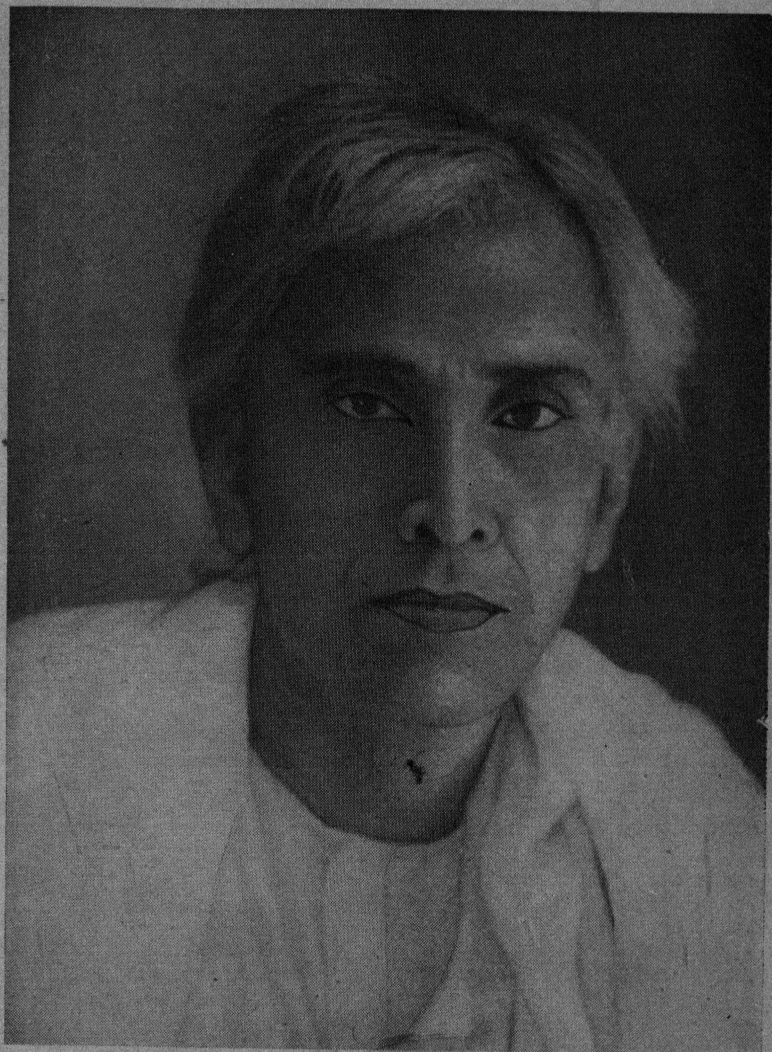
*   *

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

শ্রীপবিত্রকুমার বসু

প্রীতিনিলয়েষু

সূচীপত্র



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ　　　　মৃত্যু—১৯৩৮ খ্রীঃ অঃ

শরৎচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র

উপন্যাসে মানবজীবনের একটি সুদীর্ঘ কাহিনী চিত্রিত হইয়া থাকে। উপন্যাস লিখিত হয় গদ্যে। তাই ইহার কাহিনীতে বাস্তব জীবনের তুচ্ছ ঘটনাকেও বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; কোন একটি কাহিনীর আরম্ভ হইতে পরিণতি পর্যন্ত সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর হয়।

উপন্যাসের মধ্যে কোন্ উপাদানটি শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে আখ্যানভাগই মুখ্য; চরিত্রসৃষ্টি ও অন্যান্য উপাদানগুলি অপেক্ষাকৃত গৌণ। প্রাচীন কালের সমালোচক ও গল্পলেখকগণ গল্পকেই প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু আধুনিক কালে চরিত্রসৃষ্টিকেই মুখ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। একজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক ইংরেজ ঔপন্যাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে উপন্যাস হইতেছে চরিত্রসৃষ্টি। তিনি অন্যান্য উপাদানগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। য়ুরোপে আর এক শ্রেণীর সমালোচক ও লেখকের মত এই যে উপন্যাস (ও নাটক) সামাজিক জীবনের বাস্তব চিত্র আঁকিবে ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তর্ক করিবে। অতি আধুনিক এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলিতেছেন, উপন্যাসের উদ্দেশ্য গল্প বলা নহে, চরিত্রসৃষ্টি নহে, মতবাদের প্রচারও নহে। সচেতন ও অর্ধচেতন আত্মার উপরে বাহিরের ঘটনা আঘাত করিলে যে সকল নিগূঢ় অনুভূতি জাগে, তাহার অভিব্যক্তিই উপন্যাসের কাজ। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, জেম্‌স জয়েস্ প্রভৃতি লেখকগণ এই শ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

এই সকল তর্ক ও আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া একটি সহজ কথা স্মরণ করিলেই উপন্যাসের স্বরূপ ধরা পড়িবে। উপন্যাস মানুষের হৃদয়ের ছবি; মানুষের ধর্ম আছে, সমাজ আছে, রাষ্ট্রনীতি আছে, সচেতন ও অবচেতন আত্মা আছে। গ্রন্থকার যে কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মানুষের স্বরূপের অভিব্যক্তিই তাঁহার আদর্শ; কোন একটি বিশেষ লক্ষণকে সমগ্র ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে,

সেই চিত্র জীবন্ত হইবে না।* শুধু সমাজবন্ধন, শুধু ধর্ম, শুধু রাষ্ট্রনীতি, শুধু বাহিরের ঘটনা বা শুধু মগ্নচৈতন্য লইয়া উপন্যাস লিখিলে তাহা একদেশদর্শী হইবে। লেখকের রুচি অনুসারে কোন একটি উপাদান প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা অন্য সব উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করিলে চলিবে না।

(১)

বঙ্গসাহিত্যে প্রথম উপন্যাস কি তাহা বিচার করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের যে সমস্ত পুঁথি আমাদের হাতে পৌছিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উপন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয় উপন্যাস বিশেষভাবে আধুনিক কালের সৃষ্টি। মানুষের গল্প বলার প্রবৃত্তি সনাতন। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের প্রারম্ভ কালে গল্প লিখিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু যে কারণেই হউক, সেই সকল গল্প স্থায়ী হইতে পারে নাই। উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিবার চেষ্টা বর্তমান যুগেই বিশেষ করিয়া প্রচলিত হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, 'আলালের ঘরের দুলাল' বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। ইহার মধ্যে কাহিনী আছে, সামাজিক চিত্র আছে, বাস্তবতা আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে উপন্যাসের মৌলিক উপাদান নাই—মানবহৃদয়ের গোপনতম প্রদেশের চিত্র নাই। এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল কথিত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করিবার জন্য, এবং ইহার বিষয় হইতেছে নীতিশিক্ষা, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। ইহার মধ্য দিয়া কোন একটি সুবিন্যস্ত কাহিনী গড়িয়া উঠে নাই; কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্র একত্র গ্রথিত হইয়াছে মাত্র; তাহাদের মধ্যে যে যোগসূত্র রহিয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর।

বাস্তবিক পক্ষে বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম প্রবর্তন করিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'আলালের ঘরের দুলাল' কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; অথচ পরবর্তী যুগের উপন্যাসে বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের স্রষ্টা; এবং তাঁহার প্রতিভা এমনি অনন্যসাধারণ যে তিনি শুধু পথপ্রদর্শনই করেন নাই, তাঁহার রচনায় প্রথম ব্রতীর অপূর্ণতা ও ভীরুতার পরিচয় নাই। তিনি বঙ্গের প্রথম

* অতি আধুনিক লেখকগণ চেতনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান। তাই তাঁহাদের লেখায় কৃতিত্বের অভাব না থাকিলেও পাঠকের মনে হয় যে মানুষ সজীব পদার্থ নহে, সে একটি মুকুর মাত্র যাহার উপর নানা প্রতিবিম্ব পড়িতেছে ও সরিয়া যাইতেছে।

ঔপন্যাসিক এবং তিনিই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার উপন্যাসে কাহিনী আছে, চরিত্রসৃষ্টি আছে,—মানবহৃদয়ের গোপন রহস্যের সন্ধানও তিনি দিয়াছেন।

তাঁহার উপন্যাসগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। 'রাজসিংহ', সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস; 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসে সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র আঁকা হইয়াছে; 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', মৃণালিনী' প্রভৃতিতে ইতিহাস আছে, পারিবারিক জীবনের চিত্রও আছে; কিন্তু তবু ইহারা ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বা গার্হস্থ্য-জীবনের কাহিনী নহে, কারণ ইহাদের মধ্যে কল্পনার এমন একটি ঐশ্বর্য রহিয়াছে যাহা পারিবারিক জীবনের বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, যাহা ইতিহাসের দাবীকেও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লয় নাই। কল্পনার এই যে সমৃদ্ধি—ইহা শুধু এই তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ হয় নাই; সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতকালের যুদ্ধবিগ্রহ বা সামাজিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বাস্তব চিত্র দেওয়া হয় নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস থ্যাকারের হেনরি এসমণ্ড্ জাতীয় উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার কল্পনা ইতিহাসকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। যে দেশে জেবউন্নিসা ও মবারক, আয়েষা ও জগৎসিংহ বাস করিত, তাহা বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি নহে—কল্পনার অমরাপুরী। রোহিণীর মৃত্যু, কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন, নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর আকস্মিক মিলন—এই সব কাহিনীতে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা নাই; ইহারা অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও অনন্যসাধারণ।

যদি কোন একটি শ্রেণীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে এই লক্ষণটিকে মাপকাঠি করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক উপন্যাসই অতিশয় কল্পনা-সমৃদ্ধ। তিনি প্রধানতঃ রোমান্স-রচয়িতা। এই রোমান্স কখনও ইতিহাসে, কখনও সামাজিক জীবনের চিত্রে আপনার অপরূপ আলোক সম্পাত করিয়াছে। প্রশ্ন হইবে, রোমান্সের বিশিষ্ট ধর্ম কি? রোমান্স শব্দটি পশ্চিম হইতে আমদানী। ইহার অর্থ লইয়া য়ুরোপের নানা দেশের সাহিত্যে বহু আলোচনা হইয়াছে। (সেই তর্ক-কণ্টকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল কাব্য ও উপন্যাসে কল্পনা অতিশয় সমৃদ্ধিমান, যেখানে আখ্যায়িকা বা চরিত্র আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে, তাহাই রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।) আর্ট সত্যসুন্দরের সৃষ্টি। যাহা ঘটে নাই তাহা শিল্পী উদ্ভাবন করেন; অনেক সময়

তিনি অসম্ভব ব্যাপারও বর্ণনা করেন। কিন্তু বর্ণনাচাতুর্যে তিনি অসম্ভবকেও সম্ভাব্যতার সীমায় আনয়ন করেন; পাঠকের উদ্যত অবিশ্বাসকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। আবার, যদিও বস্তুতান্ত্রিক আর্টে কদর্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়, তবু প্রকাশের মাধুর্যে তাহাকেও সুন্দর হইতে হয়। গণিকাবৃত্তি কুৎসিত; কিন্তু Mrs. Warren's Profession নাটক সুন্দর। রোমান্স ও বস্তুতান্ত্রিক রচনার মধ্যে প্রভেদ এই যে, রোমান্স সত্যকে পায় সুন্দরের সাহায্যে, বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য সুন্দরের অনুসন্ধান করে সত্যের মারফতে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আখ্যায়িকা, চরিত্রসৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গী সবই শ্রেষ্ঠ রোমান্সের পরিচায়ক। রোমান্সের একটি বাহন হইতেছে অলৌকিক কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় অলৌকিক ঘটনার অভাব নাই। তাহার অনেক উপন্যাসেই সাধু সন্ন্যাসী জ্যোতিষীর সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে এই অলৌকিকতা আতিশয্যে পরিণত হইয়াছে; তাহা আমাদের অবিশ্বাসী বুদ্ধিকে নিরস্ত না করিয়া বরং জাগাইয়া তোলে। কিন্তু ইহা বাদ দিলেও দেখিতে পাই যে যাহা একেবারে সাধারণ, যাহা বিশেষভাবে মনুষ্য-জীবনের কাহিনী, তাহার অন্তরালে একটি বিরাট শক্তি রহিয়াছে যাহার অদৃশ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পার্থিব ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেই বিরাট শক্তিকে আমরা চিনি না, তাহার প্রকাশ অস্পষ্ট, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নাই, এবং তাহার নির্দেশ অনতিক্রমণীয়। যুদ্ধের সময় দলনী বেগম যে দুরবস্থায় পড়িল তাহার কারণ তকীর নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, কিন্তু দেখিতে পাই পূর্ব হইতেই ইহা নিশ্চিতরূপে স্থির হইয়া আছে এবং নবাব ইহার আভাসও পাইয়াছেন। মবারকের মৃত্যুর অন্তরালে রহিয়াছে কতকগুলি অচিন্তিতপূর্ব ঘটনার পারম্পর্য। কিন্তু যে জ্যোতিষীকে সে হাত দেখাইয়াছিল, তাহার কাছে ঘটনার এই অচিন্তিতপূর্ব পারম্পর্য চিহ্নিত হইয়াছিল। শ্রী শুনিয়াছিল যে সে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবে, কেমন করিয়া এই অসঙ্গত কার্য তাহার দ্বারা সংসাধিত হইবে সেই সম্পর্কে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু যে নিয়তি এই নির্দেশ দিয়াছিল তাহার কাছে কিছুই অজ্ঞাত ছিল না। এই অলৌকিক শক্তির প্রেরণা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রবল হইয়াছে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে। যে সমস্ত উপন্যাসে অপেক্ষাকৃত বাস্তব চিত্র আঁকা হইয়াছে—যেমন 'রজনী', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—তথা হইতেও রোমান্সের এই উপাদান পরিবর্জিত হয় নাই। 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ফলিত

জ্যোতিষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, 'রজনী' ফলিত জ্যোতিষ না হইলেও তাহার মধ্যে সন্ন্যাসীর শক্তির যে পরিচয় আছে তাহা অলৌকিক। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নে উপন্যাসের সমস্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার রহিয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একান্তভাবে গার্হস্থ্য চিত্র; ইহার মধ্যে অলৌকিকের স্থান নাই। তবুও ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে বলিয়াছিল,...... "তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে......আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আমার জন্য কাঁদিবে," তখন মনে হয় ভবিষ্যতের চিত্র সে দিব্যচক্ষে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার এই উক্তি খণ্ডিতার অভিশাপ নয়, মনস্তত্ত্ববিদের বিচার নয়, ইহা সত্যদ্রষ্টার ভবিষ্যদ্বাণী, ক্ষণেকের জন্য সে যেন ভবিষ্যতের অন্ধকার আবরণ চিরিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, এবং অপরার্ধে বর্ণিত ঘটনা যেন এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করিবার জন্যই সংঘটিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রোমান্সের অসাধারণত্বের ছাপ আছে। প্রথমেই মনে হইবে প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলা ও রহস্যময়ী মনোরমার কথা। ইহারা রক্তমাংসে-গড়া রমণী, রমণীজনোচিত প্রবৃত্তি ইহাদের মধ্যে আছে। তবুও মনে হয় ধরণীর ধূলি হইতে ইহারা অনেক দূরে, দৈনন্দিন জীবনে ইহারা অপরের চিত্তে বিভ্রমের সঞ্চার করিতে পারে, কিন্তু ইহারা কখনও প্রাত্যহিকের সম্পত্তি হইয়া থাকিবে না। প্রফুল্ল, সত্যানন্দ, জয়ন্তী—ইহাদের সঙ্গে প্রকৃতির সংস্রব কম, ইহারা রহস্যাবৃতও নহে, কিন্তু ইহারাও সাধারণ নরনারীর ক্ষেত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত; সাধারণ মনুষ্যের জীবনকে ইহারা নিজেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চায়, কিন্তু ইহারা নিজেরা সংসারে নিমগ্ন হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ করে না। ইহাদের ব্যক্তিত্ব মানবের কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। মাধবাচার্য, চন্দ্রচূড়, ভবানীপাঠক, রাজসিংহ—ইহারা সত্যানন্দ বা দেবীচৌধুরাণী অপেক্ষা হীনপ্রভ, কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিত্বও অনন্যসাধারণ ও অতিমানবোচিত। ইহারা একটা বিরাট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং সেই আদর্শের কাছে অন্য সকল কামনা বিসর্জন দিয়াছেন॥

এই সমস্ত বিরাট অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের, সাধারণ জীবনের সাধারণ নরনারীর চরিত্র পর্যালোচনা করিলেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত নায়ক-নায়িকার চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহারা সবাই একটু অনন্যসাধারণ। ইহার কারণ এই যে

প্রায় প্রত্যেকেই এক একটি আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং অবিচলিতদৃষ্টিতে অদম্য তেজের সহিত সেই আদর্শকে অনুসরণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে হিন্দুর প্রাচীন আদর্শে নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর মধ্যে রহিয়াছে এই অকুণ্ঠিত নিষ্ঠা, অবিচলিত একাগ্রতা। প্রতাপ, সূর্যমুখী, ভ্রমর—ইহাদের মনে কখনও কোন দ্বিধা নাই, অনুসৃত আদর্শের সম্পর্কে কখনও সন্দেহ বা জিজ্ঞাসা জাগে নাই। এই তো গেল নায়ক-নায়িকার কথা। প্রতিনায়ক ও প্রতিনায়িকার চরিত্রেও বঙ্কিম-চন্দ্রের এই একদেশদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। রোহিণী একান্তভাবেই পাপীয়সী, কুন্দের প্রতি তাহার স্রষ্টার করুণা আছে, কিন্তু তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা যে সর্বতোভাবে ঘৃণ্য সেই সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। এমনি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান চরিত্রগুলির আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাহারা কোন একটি বিশেষ গুণ বা দোষের প্রতীক, ইহাই তাহাদিগকে সজীব করিয়াছে। তাহাদের চরিত্রের প্রধান গুণ—নানা প্রবৃত্তির সমাবেশ নহে, কোন একটি প্রবৃত্তির ঐশ্বর্য।

শুধু দুই একটি চরিত্রে তিনি সাধারণ মানুষের চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথমেই মনে হইবে নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলালের কথা। ইহাদের মনে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি সমানভাবে বিরাজ করিয়াছে, ইহাদিগকে কখনও অতি নীচ বলিয়া মনে করিতে পারি না, অথচ ইহারা মহামানবও নহে। কিন্তু উপন্যাসে ইহাদের একটি প্রবৃত্তিকেই বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। কাম মানুষকে কত উন্মত্ত করিতে পারে, তাহার চিত্র ইহাদের মধ্যে আঁকা হইয়াছে, আবার যখন অনুশোচনা আসিয়াছে তখন তাহা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহারা সাধারণ মানুষ, কিন্তু সাধারণ মানুষ কোন প্রবল প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কিরূপ অসাধারণ হইয়া পড়ে, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় ইহাদের কাহিনীতে। ব্রজেশ্বর অবশ্য একান্তভাবে সাধারণ লোক এবং কোন একটি প্রবৃত্তির বাহুল্য তাহার মধ্যে নাই। এই হিসাবে ব্রজেশ্বর বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য নায়ক হইতে একটু পৃথক। তবে ইহাও মানিতে হইবে যে তাহাকে উপন্যাসে আনা হইয়াছে দেবীরাণীর প্রয়োজনে, উপন্যাস তাহার কাহিনী নহে। তাহার চরিত্র খুব সজীব হইয়া ফুটিয়াছে, কিন্তু তথাপি একথা ভুলিলে চলিবে না যে সে অপ্রধান চরিত্র। নায়িকার জীবনে সে ভবানী পাঠক অপেক্ষাও ছোট স্থান অধিকার করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশ-ভঙ্গীতেও তাঁহার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তিনি শক্তির সংঘর্ষের চিত্র আঁকিয়াছেন, নরনারীর হৃদয়ের নানাপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

করেন নাই। রোমান্সে এই জাতীয় বিশ্লেষণ যে অসম্ভব তাহা নহে ; শেক্সপিয়রের নাটকের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ে নানা প্রবৃত্তির সংঘর্ষ, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই দিক দিয়া যান নাই। তিনি এক একটি প্রবৃত্তিকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন এবং সেই প্রবৃত্তির অত্যধিক অনুশীলনের ফলাফল আলোচনা করিয়াছেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে কায়মনোবাক্যে যত ভালবাসাই দিক্ না কেন, যে নিয়তি গোবিন্দলালের রোহিণী-আসক্তির রূপ ধরিয়া আসে, তাহাকে সে নিয়ন্ত্রিত করিবে কি করিয়া ? অথচ নিয়তি আকাশবিহারী দেবতার খেয়াল মাত্র নহে, ইহার মূল রহিয়াছে পার্থিব ঘটনার বিবর্তনে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। প্রত্যেকের জীবন আপনার নিয়মে গঠিত, আপনার নিয়মে চলিতেছে, জীবনে ট্র্যাজেডি হইতেছে এই যে একজন মানুষের সুখ নিভর করে অপরের উপর। অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার স্বাধীন পথে সঞ্চরণ করিতে চায়, ভ্রমর গোবিন্দলালকে লইয়া সুখী হয়, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীকে চায়। শৈবলিনীকে পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রতাপ না করিয়াছে এমন কাজ নাই। সে জলে ডুবিয়াছে, শৈবলিনীকে শপথ করাইয়াছে, শৈবলিনীকে ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় নাই। লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলে সে কি করিত তাহার আলোচনা রমানন্দ স্বামী করুন, কিন্তু প্রতাপ দেখিয়াছে যে একটি শৈবলিনীর ভালোবাসাই নিয়তির মত দুর্বার, নিয়তির মত বিচারবিহীন। মবারকের জীবন দুইটি রমণীর অপরিসীম প্রেমের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু সীমাহীন প্রেম শুধু তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য নহে, ইহা চরম অভিশাপের আকারেও দেখা দিয়াছে। বাদশাজাদীর প্রণয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে তাহার দম্ভ ও সম্ভ্রমবোধ, আর দরিয়ার অপ্রমেয় ভালবাসার অন্তরালে রহিয়াছে তাহার অনির্বাণ জিঘাংসা।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি শুধু প্রবৃত্তিমাত্র বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি ইহাদিগকে বিরাট শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন, যেন ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। নরনারীর হৃদয়ের দ্বন্দ্বের চিত্র আঁকিতে যাইয়া তিনি তাহাদিগকে সুমতি ও কুমতি আখ্যা দিয়াছেন, যেন তাহাদের একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, যেন অপরাপর শক্তির মত তাহারাও স্বীয় গতিবেগ-প্রাবল্যে অগ্রসর হইতেছে। হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন বলিয়া তিনি ইহাদিগকে খণ্ডিত করিয়া চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন নাই। তাঁহার প্রতিভার লক্ষণ—কল্পনার বিশালতা, বিশ্লেষণের পুঙ্খানুপুঙ্খতা নহে। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল প্রথম জীবনে স্নেহপরায়ণ স্বামী ছিল, হঠাৎ তাহারা অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইল। এই পরিবর্তনের মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা নাই। বাহিরের কি কি

ঘটনায় এই পরিবর্তন সাধিত হইল তাহার চিত্র আছে, কিন্তু কেমন করিয়া মনের মধ্যে ধীরে ধীরে আদর্শচ্যুতি ঘটিল তাহার আভাস থাকিলেও বিস্তৃত চিত্র নাই। প্রসাদপুরে রোহিণী ও গোবিন্দলালের সম্পর্ক যে খুব সহজ ও তাহাদের জীবন যে খুব সুখময় ছিল এমন মনে হয় না। তাহা না হইলে রোহিণী রাসবিহারীর পটলচেরা চোখেব কথা ভাবিবে কেন এবং গোবিন্দলালই বা কোন কথা না শুনিয়া পিস্তলেব আশ্রয় লইবে কেন? কিন্তু রোহিণীর জীবননাট্যের চতুর্থ অঙ্কের উল্লেখযোগ্য কোন চিত্র আমরা পাই না, অথচ এই শ্রেণীর চরিত্রের আলোচনায় চতুর্থ অঙ্কই মুখ্য।

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে পাপের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহজ বিতৃষ্ণা ছিল। বর্তমানকালেব বাস্তবপ্রিয় সাহিত্যিকের ন্যায় তিনি পাপের বিশ্লেষণ করিতে ভালবাসিতেন না। এই উক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। কিন্তু কোন জায়গায়ই বঙ্কিমচন্দ্র চুলচেরা বিশ্লেষণ পছন্দ করিতেন না। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও পবিবর্তন অলৌকিক উপায়ে সাধিত হইয়াছে। প্রফুল্ল যে দেবীচৌধুরাণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাও একেবারে পার্থিব ব্যাপাব নহে, কাবণ প্রফুল্ল হইতেছে সেই শক্তি যাহা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

শ্রীর মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহাও যেন বাহিরের ঘটনার পরিবর্তন। সীতারামের পতন খুব বিস্ময়কর, কিন্তু ইহা সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। আমরা এই পরিবর্তনকে সহজে মানিয়া লইতে পারি না। ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়।

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; অবশ্য তাঁহার প্রভাব হইতে এই সাহিত্য কখনও মুক্ত হইতে পারিবে না। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐতিহাসিক উপন্যাস একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ও তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পবে কেহ কেহ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুইখানি উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'—ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ইতিহাস আছে। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে ৺হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী ও ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের আসন দাবী করিতে পারেন না। বোধ হয় ভাবতবর্ষের ইতিহাসের ও সামাজিক জীবনের এমন একটা বৈচিত্র্য আছে যে এক অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। তাই যদিও বঙ্কিমচন্দ্র বহু উপন্যাসেই ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তবু তিনি খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন মাত্র একখানা—'রাজসিংহ'। তাঁহার নিজের মতেও শুধু 'রাজসিংহ'ই তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ করিয়াছে। তিনি প্রধানতঃ কবি হইলেও ঔপন্যাসিকও বটেন। এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা তাঁহাব প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির সহজ গতিতে বাধা দিতে পারে নাই। উপন্যাসে—বিশেষতঃ সামাজিক উপন্যাসে—বাস্তবের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার। তারপর প্রত্যেক উপন্যাস একটি কাহিনীকে আশ্রয় কবিয়া গড়িয়া উঠে, সুতরাং ইহার মধ্যে বাহিরের ঘটনা বা প্লটকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গীতিকবির রচনায় উপন্যাসের এই দুইটি উপাদান প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগেব উপন্যাসে এই দুইটি উপাদানের অভাব নাই। তাঁহার উপন্যাসে বাংলার সামাজিক জীবনের যে চিত্র পাই তাহা বাস্তবজীবনের সহিত নিবিড় পরিচয়ের সাক্ষ্য দেয়, এবং এই সকল উপন্যাসে ঘটনার দৈন্যও নাই। রবীন্দ্রনাথ অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিযা আমাদের পারিবারিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ কবিয়াছেন ও তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। এই সব চিত্রে রোমান্সের সুদূরতা নাই: ইহারা তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে কবিপ্রতিভা অপেক্ষা বাস্তবপন্থীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের শক্তির পরিচয় রহিয়াছে বেশী।*

আশা—মহেন্দ্র—বিনোদিনীর কাহিনীর সঙ্গে ভ্রমর—গোবিন্দলাল—রোহিণীর কাহিনীর মৌলিক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে প্রভেদের অন্ত

* রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কবিপ্রতিভার পরিচয় নাই এমন নহে। তিনিও এক নূতন ধরণের রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই রোমান্সেব পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হইযাছে তাঁহার শেষ বয়সের উপন্যাস—'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতিতে। এই সকল উপন্যাসে দৈনন্দিন জীবনের কথা কাব্যের কল্পলোকে উন্নীত হইয়া অপরূপ হইযাছে। যে সমস্ত নরনারীর কথা এইখানে লেখা হইয়াছে তাহারা অনন্যসাধারণ নহে, তাহাদের জীবনে অলৌকিক ঘটনার

নাই। গোবিন্দলাল যে রোহিণীর প্রেমে পড়িয়াছিল তাহা ঠিক এক মুহূর্তের দর্শনে নহে, তবুও এই ভালবাসা একটা সহসা-সঞ্জাত মোহ। এই আকর্ষণ যে কত দুর্নিবার বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইযাছেন, কিন্তু কেমন করিযা নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া এই মোহ গোবিন্দলালের চিত্ত আচ্ছন্ন করিল, তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ নাই। রবীন্দ্রনাথেব চিত্র অন্য প্রকারের। মহেন্দ্রকে যে বিনোদিনী উদ্‌ভ্রান্ত কবিল, তাহা সহসা দর্শনেব ফলে নহে, নানা ক্ষুদ্র চাতুরী ও তুচ্ছ ঘটনাব মধ্য দিযা এই আকষণ জন্মিল ও সঞ্জীবিত হইল। রোহিণীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে গোবিন্দলাল ও ভ্রমর সুখে কালযাপন করিতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার কোন বিস্তৃত বণনা নাই। 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র-আশার মিলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বণনা দিযাছেন। ইহার মধ্যে মাযের অভিমান, চারুপাঠের পুরুভুজ, কলেজ কামাই করা ও পরীক্ষায় ফেল হওয়া সবই আছে। এমন কি বর্ষাব দিনকে বাত্রি ও পূর্ণিমার রাত্রিকে দিন মনে করার আকাশকুসুম কল্পনা পযন্ত বাদ যায নাই।

চরিত্রসৃষ্টিতেও ববীন্দ্রনাথেব কল্পনার বাস্তবপ্রিযতাই প্রমাণিত হয। ভ্রমবেব মধ্যে একটা অলৌকিক তেজ ও মহিমা আছে, কিন্তু আশা সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ মেযে, কি করিযা যে তাহাব সর্বনাশ সাধিত হইতেছে তাহাও সে ভাল কবিযা বুঝে না। অন্যান্য উপন্যাস আলোচনা করিলেও এই নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইবে। গোরাকে প্রথমতঃ মহামানব বলিযা ভুল হইতে

সন্নিবেশ হয নাই। কিন্তু ইহাদেব অনুভূতি এত তীব্র, কল্পনা এত রঙিন, বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম যে ইহাদেব জীবনযাত্রাকে বাস্তবজীবনেব প্রতিচ্ছাব বলিযা মনে কবা যায না। এই সব উপন্যাসের আখ্যানভাগেব সেই পরিপূর্ণতা নাই যাহাকে উপন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ বলিযা মনে কবা হয। ইহাবা যেন জীবনেব কযেকটি কবিত্বময মুহূর্তেব সমষ্টি মাত্র, ইহাদেব মধ্যে কাব্য ও উপন্যাসেব প্রভেদ ঘুচাইযা ফেলিবাব চেষ্টা কবা হইযাছে। ইহাদের মধ্যে মন্থবগতি বিশ্লেষণ নাই, শুধু কবিকল্পনার মধ্য দিযা মাঝে মাঝে এক প্রকাব তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওযা যায়। এই প্রকাবেব উপন্যাসকে খাঁটি উপন্যাস বলা যায কিনা, ইহা লইয়া নানা সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল উপন্যাসের গুণ নির্দেশ করিযাছেন, তিনি ইহাও বলিযাছেন, "এই উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশ্লেষণ ও সাঙ্কেতিকতার সমন্বয মোটেই সন্তোষজনক মনে হয না।" এই সকল উপন্যাসেব গুণাগুণ যাহাই থাক্ না কেন, এই জাতীয আর্ট রবীন্দ্রনাথেব পরবর্তী ঔপন্যাসিকগণ অনুশীলন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয না। ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, এই শ্রেণীর উপন্যাসও হযত রবীন্দ্রনাথের পরে আর লিখিত হইবে না। ইহা শুধু অভিনব নহে, অননুকরণীয়ও বটে।

পারে।* কিন্তু উপন্যাস বেশীদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখি সে সাধারণ মানুষ ; যাহা কিছু অসাধারণত্ব আছে তাহাও ভিত্তিহীন। তাহার জন্ম হইয়াছিল ম্যুটিনির সময়ে, সে লালিত পালিত হইয়াছিল হিন্দুর ঘরে ; তাই তাহার অত্যুগ্র নিষ্ঠা অর্থহীন, ইহা এক প্রকারের বিকার মাত্র। তারপর দেশসেবায় উগ্র উৎসাহ থাকিলেও তাহার কার্যকলাপে অনন্তসাধারণত্ব নাই। সর্বশেষে তাহার জন্মরহস্য আবিষ্কার করিয়া দিয়া ও সুচরিতার সঙ্গে তাহাকে মিলিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাকে একেবারে সাধারণ মানবের গণ্ডিতে আনিয়াছেন। 'নৌকাডুবি'তে রমেশ ও কমলার মিলন একটু অতিনাটকীয়, কিন্তু তাহাদের যৌথ জীবনযাত্রার চিত্র আঁকা হইয়াছে নানা খুঁটিনাটির মধ্য দিয়া। কমলার বিবাহ সম্বন্ধে সত্যকথা জানিতে পারিয়া রমেশ অতিনাটকীয় কিছু করে নাই, জটিল সমস্যার সহজ সরল সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে তিনি চিরপ্রচলিত নীতিকে মানিয়া লইয়া তাহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার জন্য উপন্যাস রচনা করেন নাই। নীতিসম্পর্কে তাঁহার এই পক্ষপাতশূন্যতা তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতার পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র চিরাচরিত নীতিকে মানিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপন্যাসে ভাল ও মন্দ এই দুই শক্তির সংঘর্ষের চিত্র আঁকিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে 'নৌকাডুবি'তে প্রচলিত রীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হইয়াছে, কিন্তু 'চোখের বালি'তে এই নতিস্বীকার নাই। 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারাকে নূতন পথে প্রবাহিত করিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর যদি কোন গ্রন্থ উপন্যাসের ক্ষেত্রে নূতন যুগ প্রবর্তনের দাবী করিতে পারে, তবে সে 'চোখের বালি'। 'চোখের বালি'তে বিধবার প্রণয়াকাঙ্ক্ষার চিত্র আঁকা হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথাও বিনোদিনীকে কশাঘাত করেন নাই। তাহার আকাঙ্ক্ষাকে রমণীর সহজাত স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তিনি উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি এই উদ্দাম প্রবৃত্তির জয়গান করেন নাই, বরং এই উচ্ছৃঙ্খলতা কিরূপ প্রলয়ের সৃষ্টি করে তাহারই চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু বিনোদিনী বিধবা সেই কারণে তাহার পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া অসঙ্গত হইবে এমন বদ্ধমূল ধারণা লইয়া রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। বরং তাহার

* 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই ভুল হইতে পারে। কিন্তু কবি দেখাইয়াছেন যে তাহার উগ্র স্বাদেশিকতা ব্যর্থকাম বৈজ্ঞানিকের মনের বিকার মাত্র। ইহা মহামানবতার সহজ স্ফূর্তি নহে।

মত অবস্থায় পড়িলে মহেন্দ্র বা বিহারীর প্রতি আসক্ত হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ইহাই উপন্যাসের অন্যতম প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই কারণেই উপন্যাসের শেষের অংশে বিনোদিনীর চরিত্র যেন অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মনে হয় গ্রন্থকার এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন যাহার পরিণতি সম্পর্কে তিনি মন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তবু তিনি যে প্রচলিত সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া নরনারীর হৃদয়ের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং ইহাই বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের গতির নিয়ামক হইল। বঙ্কিমের যুগ অতিক্রম করিয়া আমরা এক নূতন যুগে উপনীত হইলাম।

(৩)

'রবীন্দ্রজয়ন্তী'তে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে তিনি সাহিত্যে গুরুবাদ মানেন এবং প্রসঙ্গক্রমে 'চোখের বালি'র উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে সংস্কারমুক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারই পূর্ণতর বিকাশ হইয়াছে শরৎ-সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র রমা, রাজলক্ষ্মী, অভয়া প্রভৃতির পক্ষ লইয়া প্রীতিহীন ধর্ম ও ক্ষমাহীন সমাজকে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহারা মানুষের কোন্ মঙ্গল সাধন করিতে পারিয়াছে? জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন যে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের গোড়ার কথা হইতেছে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা, এই যুগের সাহিত্য সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছে। য়ুরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য কিনা তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে, কারণ তথায় অধিকাংশ সাহিত্যিক শুধু প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, প্রশ্নের মীমাংসা লইয়াও উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনা শরৎচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। সমাজে যাহারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, তিনি তাহাদের জীবন অতিশয় গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণের নিবিড়তা, বিশ্লেষণের পুঙ্খানুপুঙ্খতা, বর্ণনার বাস্তবতা সর্বজন-বিদিত এবং এইখানেও তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৌলিকতার সমধিক প্রকাশ হইয়াছে প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। তিনি সামাজিক সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন নাই, শেষ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নাই, কিন্তু

নিগৃহীত, প্রপীড়িতদের হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহাদের পক্ষ হইতে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যে সমাজ ক্ষমা কবিতে জানে না, সামঞ্জস্য করিতে জানে না, উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার গৌরব কোথায়, তাহার বিধিনিষেধের মূলে যদি কোন শক্তি থাকে, তবে সে কিসের শক্তি ?

বঙ্কিমচন্দ্র যে সব চরিত্র আঁকিযাছেন (ও যে সমস্ত ঘটনাব বর্ণনা দিয়াছেন) তন্মধ্যে কেহ কেহ শরৎচন্দ্রের রচনায় পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের স্বরূপ বদলাইয়া গিযাছে। শৈবলিনী যে বজরায় উঠিয়া লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল তাহা বঙ্কিমের উপন্যাসে একটা ঘটনা মাত্র। বিরাজ বৌ বজরায় উঠিয়া রাজেন্দ্রের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল; শবৎচন্দ্র বলিতে চাহেন যে যদিও বিরাজ কুলত্যাগ করিযাছিল তবুও তাহার সত্যিকার পাপ হয় নাই। 'বিরাজ বৌ' শরৎচন্দ্রের অপরিণত রচনা। এখানে তিনি সাহসের সহিত নিজের মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। স্নতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের রচনার পার্থক্য তুলনা করিতে হইলে, শরৎচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত পবিণত রচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতাপ ও দেবদাসের জীবনে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাতে অভিশপ্ত হইযাছিল; উভয়ের জীবনের পরিসমাপ্তি মৃত্যুর ট্র্যাজেডিতে এবং সেই মৃত্যু বাল্যপ্রণয়ের সঙ্গে বিজড়িত। কিন্তু ইহাদের জীবনের কাহিনী ও চরিত্রের পার্থক্যও খুব বেশী। প্রথমতঃ প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয়ী; স্নতরাং শৈবলিনীকে ভালবাসিলেও সে চিত্ত জয় করিয়াছে এবং যে নারীতে তাহার অধিকার নাই তাহার জন্য লিপ্সাকে দলিত করিয়া রূপসীকে বিবাহ করিয়াছে ও তাহাকে নিঃসঙ্কোচে বরণ করিয়াছে। কিন্তু দেবদাসের কথা অন্য রকমের। যাঁহারা তাহার জন্য সহানুভূতি অনুভব করিবেন, তাঁহাদের যুক্তি হইবে এই :—ইন্দ্রিয়জয়ে যে পুণ্য হয় তাহার মূল্য কতটুকু? হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিযা যে আকাঙ্ক্ষা জাগিযা উঠিয়াছে তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। তারপর অন্য নারীকে বিবাহ করা—দেবদাসের কাছে তাহাই তো যথার্থ পাপ। যাহাকে ভালবাসিয়াছে শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে তাহাকে পাইল না বলিয়াই হৃদয় হইতে তাহার আসন টলাইবে কোন্ রূপসী? আর এই আসনই যদি টলে তবে তাহাই তো হইবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

এই তো গেল ইহাদের জীবনের কাহিনী। ইহাদের মৃত্যুর বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে বিভিন্ন উপায়ে। প্রতাপের মৃত্যুর পর রমানন্দ স্বামী বলিয়াছেন, "তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে

কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্যময়লোকে যাও, লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না।" দেবদাসের জীবনলীলা যখন শেষ হইল তখন গ্রন্থকার এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, "তোমরা যে কেহ এই কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও আর যাহাই হউক যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া মরিতে পারে!" বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের রচনার পার্থক্য এইখানে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সংযমের জয়গান করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র মানবহৃদয়ের দুর্বলতাকে সহানুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অন্যান্য চরিত্র গভীরভাবে আলোচনা করিলেও এই পার্থক্য ধরা পড়িবে। গোবিন্দপুর জমিদার বাড়ীর বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিল হীরা এবং সেই বৃক্ষ মুকুলিত হইয়াছিল হীরার জীবনে। হীরা যুবতী, সুখের কাঙাল। সে ধর্ম মানে না, চিত্তসংযমে তাহার আস্থা নাই, নিজের সুখের লোভে সে বহু পাপ কাজ করিয়াছে, তাহার প্রণয়ীর প্রণয়াস্পদকে হত্যা করিয়াছে, যে প্রণয়ী তাহার ভালবাসার প্রতিদান দেয় নাই তাহার উপর প্রতিহিংসা লইয়াছে, তার পর উন্মাদিনী হইয়াছে, উন্মাদের মধ্যেও তাহার জিঘাংসাবৃত্তি বলবতী রহিয়াছে। এই হীরার সঙ্গে কিরণময়ীর সাদৃশ্য আছে। এইখানেও দেখি সেই উদ্দাম প্রণয়লিপ্সা, সেই অসাধারণ কার্যতৎপরতা, ধর্মাধর্মের প্রতি সেই ঔদাসীন্য, সেই কঠোর প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও পরিশেষে সেই উন্মাদ-গ্রস্ততা। কিরণময়ীর প্রতিহিংসার উপায় একটু মৌলিক, সে সুরবালাকে হত্যা করে নাই, দিবাকরের সর্বনাশ করিয়াছে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের রচনারীতির প্রভেদ। ধর্মসম্পর্কে কিরণময়ী শুধু যে উদাসীন তাহাই নহে, ধর্মের বিরুদ্ধে, পরকালের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া, লড়াই করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া তাহার মন পরিপুষ্ট হইয়াছে। উপেন্দ্রের

স্ত্রীকে হত্যা করিলে উপেন্দ্রের আদর্শকে আঘাত করা হয় না, তাহাকে অপমান করা হয় না। তাই সে এমন একটা কাজ করিল যাহাতে উপেন্দ্রের মাথা হেঁট হয়, তাহার বহুদিনের সঞ্চিত স্নেহের মূল উৎপাটিত হয়। এই উদ্দেশ্য লইযা সে দিবাকরকে প্রলুব্ধ করিল, তাহাকে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌছাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিল। সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে যে ঔদাসীন্য হীরার মধ্যে দেখিতে পাই, তাহাই কিরণময়ীর হৃদযে তীক্ষ্ণ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইযাছে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত হইয়াছে কিরণময়ীর মধ্যে।

যে সব নরনারী সমাজের অনুশাসন অনুসারে কোন অধিকার লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রতি শরৎচন্দ্র অনেক সময়ই সম্পূর্ণরূপে অনুকূল হইতে পারেন নাই। এইখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির সহিত তাঁহার সৃষ্টির পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে। সুরবালার কাছে কিরণময়ী পরাজিত হইয়াছে, সুরবালার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের কোন নালিশ নাই, কিন্তু তবু সুরবালা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগাইতে পারে না। তাহার প্রতি আমাদের মনে শুধু কৌতুকমিশ্রিত স্নেহের সঞ্চার হয়। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল সাধ্বী রমণীর চিত্র আঁকিয়াছেন—ভ্রমর, সূর্যমুখী প্রভৃতি—তাহাদের আচরণে আমরা বিস্মিত ও শ্রদ্ধাবনত হই, কখনও কৌতুক অনুভব করি না। হারাণবাবু অধ্যয়ন লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন, স্ত্রীর যৌবনোদ্গমের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তাহার সঙ্গে কখনও ভালবাসার আদান প্রদান করেন নাই। চন্দ্রশেখরও অনেকটা এই জাতীয় লোক। কিন্তু ইঁহাদের প্রভেদও সামান্য নহে। চন্দ্রশেখর শান্ত, সৌম্য, উদার, মহান্ এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই উপন্যাসের নায়ক করিয়াছেন। আর হারাণবাবুর মধ্যে দেখি একটি নির্জীব গ্রন্থকীট, যাঁহাকে প্রশংসা করা যায়, কিন্তু ভালবাসা যায় না, যাহার কাছেও আসা যায় না,—"শুষ্ক কঠোর মূর্তিমান বিদ্যার অভিমান, বিজ্ঞানের শক্ত বেড়া দিযা যিনি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দিবারাত্র নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন সেই স্বামী।"

প্রকাশভঙ্গীতেও শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত রীতি অবলম্বন করেন নাই। 'চোখের বালি', 'গোরা' প্রভৃতির মধ্যে যে বিস্তৃত বিশ্লেষণের চিত্র পাই তাহাই বিস্তৃততর ও সূক্ষ্মতর হইয়াছে শরৎচন্দ্রের রচনায়। তিনি সমাজবিগর্হিত পাপের সম্মুখে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, বরং বিধবার সূতিকা-রোগের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে তিনি নানা প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখিতে পাইয়াছেন, কোন একটি প্রবৃত্তির প্রাবল্যে তাঁহার

নায়ক-নায়িকার চরিত্র আচ্ছন্ন হয় নাই। এই কারণে তাঁহার উপন্যাসে মানসিক দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের চিত্র হইয়াছে খুব জীবন্ত। যে বড়দিদি সুরেন্দ্রনাথকে ছোট বোনের মাষ্টার বলিয়া একটু কৃপামিশ্রিত স্নেহ দেখাইয়াছিল এবং যে বড়দিদি মুমূর্ষু সুরেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতই না প্রভেদ এবং সেই প্রভেদের মূলে রহিয়াছে বহুদিনের বহু ঘটনা ও বহু চিন্তা। একদিন রমা তারিণী ঘোষালের শ্রাদ্ধে উপস্থিত হওয়ার কথা কল্পনা করিতে পারিত না, আব একদিন সে যতীনকে রমেশের হাতে দিযা পল্লীসমাজ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল; কিন্তু এই পরিবর্তনকে অসম্ভব বলিযা মনে হয় না, কারণ ইহা আসিয়াছে ধীরে ধীবে, তিল তিল করিয়া।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মানসিক দ্বন্দ্বের ও পরিবর্তনের চিত্র খুবই কম। যেখানে মানসিক পরিবর্তনের চিত্র আছে, সেখানেও দেখি পরিবর্তন এত সহসা সংঘটিত হইয়াছে যে মনে হয় যেন একটি চরিত্র হঠাৎ অপর একটি চরিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে শ্রী স্বামিপরিত্যক্তা হইয়া বাগানের ফুল চুরি করিয়া তুলিত ও মনের মত মালা গাঁথিয়া গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে কবিত স্বামীকে পরাইয়াছে, যে শ্রী অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিযা মনে করিযাছে তাহাকে খাইতে দিল, সেই একদিন স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিল, সন্ন্যাসিনীর অন্তরালে রমণীর ভোগলিপ্সা নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। স্বামিপবিত্যক্তা ভৈরবী ষোড়শী স্বামীকে একদিন অতর্কিতে ফিরিয়া পাইল, ইহাতে তাহার সমস্ত জীবনে গভীর পরিবর্তন আসিল। সুপ্ত অলকা আবার জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ষোড়শীও নিঃশেষে মরিল না; ষোড়শী ও অলকার মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে তাহার বাকী জীবনটা কাটিয়া গেল, এবং কোন সামঞ্জস্য সম্ভবপর কিনা তাহা শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত রহিয়া গেল। মতিবিবির মধ্যে পদ্মাবতী নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছিল; সে যেদিন সহসা পুনরুজ্জীবিত হইল, সেই দিন মতিবিবিও নিঃশেষে মরিয়া গেল,—রহিল শুধু তাহার অকুণ্ঠিত, দৃপ্ত তেজ, তাহার প্রবল অধিকারলিপ্সা। পিয়ারীবাইজীর মধ্যে রাজলক্ষ্মী কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল আমরা জানি না,* কিন্তু সে যে নিভৃতে তাহার বৈশিষ্ট্যকে সজীব রাখিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। যেদিন শ্রীকান্তের সঙ্গে পুনরায় তাহার দেখা হইল সেইদিনই পিয়ারী মরিয়া যায় নাই, রাজলক্ষ্মীর জীবনে পিয়ারী মাঝে মাঝে উঁকি দিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। যে রাজলক্ষ্মী শিকারশিবিরে শ্রীকান্তকে অভিবাদন করিয়াছিল এবং যে

* চতুর্থ পর্বে ইহার আংশিক বর্ণনা আছে।

রাজলক্ষ্মী গঙ্গামাটিতে শ্রীকান্তকে বিদায় দিতে সম্মত হইয়াছিল—ইহাদের মধ্যেও কত প্রভেদ ? অথচ এই পরিবর্তন একদিনে সাধিত হয় নাই, ধীরে ধীরে বহু তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়া তিল তিল করিয়া তাহার চরিত্রে এই পরিবর্তন আসিয়াছে, এবং ইহার বিশ্লেষণেই শরৎপ্রতিভা অভিব্যক্তি পাইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের সূচনা ও পরিণতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বঙ্কিমচন্দ্রই উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা। তিনি নানা শ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসই রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। এই রোমান্সের মূল রহিয়াছে তাঁহার চরিত্রসৃষ্টিতে ও প্রকাশভঙ্গীতে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায়ই মহামানব; সাধারণ মানুষের চরিত্রেও কোন একটি প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন নাই, নরনারীর হৃদয়কে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন এবং প্রচলিত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি দেখাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা প্রকট হইয়াছে চরিত্রসৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গীতে। রবীন্দ্রনাথ মহামানবের কথা লিখেন নাই, সাধারণ মানুষের সাধারণ কাহিনী নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাদের কথা লিখিতে যাইয়া তিনি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন ও তথায় নানা প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও লুকোচুরি দেখিতে পাইয়াছেন; কাহাকেও একটি প্রবৃত্তির প্রতীকমাত্র মনে করেন নাই। প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন নাই, কিন্তু তাহার জয়গানও করেন নাই। মানুষকে তিনি মানুষ হিসাবে দেখিয়াছেন; প্রচলিত ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার নায়ক-নায়িকারা খুব সাধারণ লোক; তিনি তাহাদের জীবন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও তাহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁহার রচনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মানবহৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে সংস্কার ও অনুভূতির যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিতেছে তিনি তাহার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অনুভূতির গভীরতায় ও বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় তাঁহার রচনা অনন্যসাধারণ। তারপর, প্রচলিত ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ থাকেন নাই; তিনি ইহাকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু ইহাকে কল্যাণকর বলিয়া শিরোধার্য করেন নাই। তাঁহার রচনায় বিদ্রোহের সুর রহিয়াছে; তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে ধর্ম মানুষের হৃদয়ের প্রতি অবিচার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল্য কোথায়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা

অতীত যুগের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ। মানুষ যে সমাজের অঙ্গ, তাহার জীবনের গতিবিধি যে সমাজের সহস্র বিধিনিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ একথা তখন কেহ বড় খেয়াল করিয়া দেখিত না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কুলি-মজুরদের মধ্যে মহান্ জীবনের পরিচয় পাইয়াছিলেন,—তিনি বিচার করিয়া দেখেন নাই উহাদের জীবন কত দীন, কত অত্যাচারে নিষ্পেষিত। শুধু কুলি-মজুরদের কথাই বা বলি কেন? যাহাদের জীবনে আর্থিক দৈন্য কম তাহারাই কি সব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন? হ্যাম্‌লেট ভাবিয়া ভাবিয়া নিজের জীবন ব্যর্থ করিল, তাহার কর্মপথের প্রায় সমস্ত বাধাই আসিল তাহার ব্যক্তিগত প্রকৃতি হইতে। কিন্তু তাই কি হয়? মানুষ তাহার সকল কর্মে সমাজের অঙ্গ; তাহার মনকে স্বাধীন মনে করিলে চলিবে কেন? যে স্বাধীনতা তাহার নাই—তাহা কি তাহার মনের থাকিতে পারে?

"মানবের এই অধীনতার কথা বিশেষ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে বর্তমান যুগের সাম্যবাদের প্রভাবে। গত একশ' বছরে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছে খুব বেশী করিয়া, এবং সেই আলোচনার ফলে সাহিত্যে বিশেষ করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে মানুষের আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর উপর। মনীষী ট্রট্‌স্কি বলিয়াছেন, সাহিত্য হইতেছে অর্থনৈতিক চিন্তার প্রকট ছবি।" সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ কথা পূর্বের যুগে তেমন করিয়া কেহ বলে নাই। আমরা শুনিতাম যে কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণের তথ্যই সাহিত্যের রসদ যোগায়। সাহিত্য যে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার—ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সংঘাতের ছবি—এ-কথা অতীত কালের সাহিত্য বা সমালোচনায় বড় একটা পাই না। কিন্তু এই ধারণা হইতেছে বর্তমান যুগের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কথা। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের নিকট সম্বন্ধ। তাই বর্তমান যুগের সাহিত্য হইয়াছে একেবারে বস্তুতান্ত্রিক।" তাহা পরীক্ষা করে মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানবমনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া। পূর্বযুগের নীতিবিদ্‌রা মানুষের চরিত্রের সংস্কার করিতেন। কিন্তু বর্তমান-কালের নীতিবিদ্‌রা বলেন যে, নীতির মূল হইতেছে সামাজিক অবস্থার

মধ্যে। কাজেই নীতির পরিবর্তন করিতে হইলে প্রথম করিতে হইবে সমাজের আমূল সংস্কার। মহাভারতের কাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম যে নীতি ঈশ্বরের দেওয়া জিনিষ। উহা ধর্মের অঙ্গ, সমাজ উহাকে অম্লান বদনে মানিয়া লইবে, এবং উহাকে যে অমান্য করিবে, তাহাকে পাপী বলিযা শাস্তি দিবে। কিন্তু ইহাব মধ্যে আছে একটা চরম ফাঁকি। পর্বতের শীর্ষদেশ হইতে অবতবণ কবিয়া মুশা যে দশটি অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ভগবানেব সম্বন্ধ খুব কম, কিন্তু ইহলোকের সম্বন্ধ খুব নিবিড়। পবের দ্রব্য অপহবণ কবিলে স্বর্গে সুখাসীন ঈশ্ববের ক্ষতি সামান্য, কিন্তু আমার মর্ত্যের প্রতিবেশীর ক্ষতি প্রচুব। তাঁহার স্ত্রীব প্রতি কটাক্ষ করিলে ভগবানের কিছুই হইবে না—কিন্তু আমার প্রতিবেশীব ক্ষতি না হউক নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে যথেষ্ট। কিন্তু এই বাণীগুলি মুশা চালাইলেন ভগবানেব বাণী বলিযা! এম্‌নি কবিয়া ধর্মের সঙ্গে নীতির একটা সম্পর্ক খাড়া হইয়াছে সর্বদেশে ও সর্বকালে। বর্তমান যুগের সমাজসংস্কারকেবা দেখিলেন যে সমাজের আমূল পবিবর্তন করিতে গেলে প্রথম টান পড়িবে মহাভারতের নীতিকথায়। তাঁহারা দেখাইলেন যে নীতির ভিত্তি হইতেছে সমাজের সুবিধা-অসুবিধায়, তাহার সঙ্গে পাবলৌকিক ঋতের কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্বে মানুষ নীতির অনুগামী হইত, এখন নীতি হইল মানুষের অনুগামী।

এই আবিষ্কারেব সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেবও রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। এই যুগের সাহিত্য দেখাইযাছে ব্যক্তির উপর সমাজশক্তিব বিচারবিহীন পীড়ন আর মঙ্গলহীন নীতির বিরুদ্ধে মানবমনের বিদ্রোহ। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক আনাতোল্ ফাঁসেব বচনায় এই কথাব অভিব্যক্তি হইয়াছে হাস্যোজ্জ্বল ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া। তাঁহাব অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চবিত্র হইতেছে Jerome Coignard। এই মজাব লোকটি দেখাইয়াছে যে নীতির সঙ্গে ভগবানেব কোন সম্বন্ধ নাই। পৃথিবীর সমস্ত দুর্নীতিব জন্য সে ধর্মের দোহাই দিয়াছে,—তাহার সকল কুকর্মের মধ্যে ভগবানের ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছে। ইহাই বর্তমান যুগেব সাহিত্যের নৈতিক অবনতিব গোড়ার কথা। শেক্সপিয়রে অশ্লিলতা আছে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অশ্লীলতা আছে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে অশ্লীলতাকে অশ্লীলতা বলিযাই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। বর্তমান কালের সাহিত্যের উদ্দেশ্য অন্য রকমের। এখনকার অশ্লীলতা শ্লীলতার মর্মে আঘাত করিয়াছে, তাহার মূল উচ্ছেদ করিবাব চেষ্টা করিয়াছে। বর্তমান যুগের লেখকগণ দেখাইয়াছেন যে যাহাকে আমরা নীতি বলি তাহার মূলে আছে

শক্তিশালীর প্রচণ্ড লোভ। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে হইবে, কাজেই শূদ্রের পক্ষে কোন কিছু দাবী করাই দুর্নীতি। শক্তিমান্ পুরুষ নারীদেহের উপরে অচল কর্তৃত্ব চাহিয়াছিল; কাজেই নারীর সতীত্ব ইহকাল ও পরকালের ধর্ম, পুরুষের ব্যভিচার সামান্য অপরাধ মাত্র।

ইহাই বর্তমান যুগের সাহিত্যের প্রধান ধারা। ইহাতে মানুষের হৃদয়াবেগের কথা নাই—ইহাতে রোমান্সের একান্ত অভাব। ইহাতে আছে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সঙ্গে মানবের মিলনসংঘর্ষের কথা আর আছে চিরাগত নীতির ভিত্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষ। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা লইয়া কি সাহিত্য হয়? সাহিত্যের বিষয় হইতেছে মানুষের সুখ-দুঃখ-অনুভূতির কথা। সমাজশক্তির কোন রূপ নাই। অথচ সাহিত্য হইতেছে সুন্দরের ছবি। সুন্দর নিজেকে ধরা দেয় রূপে। তাই রূপহীন শক্তিকে লইয়া সাহিত্য হয় না। আবার সমাজশক্তিকে বাদ দিয়া ব্যক্তির যে খণ্ডরূপ আমরা পাই তাহাতে সৌন্দর্য থাকিতে পারে কিন্তু সে সৌন্দর্য মিথ্যা। সত্যহীন সাহিত্য লইয়া কি হইবে? ইহাই আজকালকার সাহিত্যের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। যিনি শেক্সপিয়রের সাহিত্যের উপাসক তিনি বার্ণার্ডশ'র সাহিত্যে সুন্দরের অভাব দেখিবেন; আর যিনি বার্ণার্ডশ'-পন্থী তিনি বলিবেন শেক্সপিয়রের নাটকের রূপ মূল্যহীন, কারণ তাহার ভিত্তি মিথ্যা।[১]

(২)

এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। বর্তমান যুগের সাহিত্যেই অনেক সময় দেখিতে পাই যে যাহা সত্য তাহা সুন্দরে মিশিয়া গিয়াছে। হয়ত ইহাতে উভয়ের গৌরবের হানি হইয়াছে, হয়ত ইহাতে সত্যের তীক্ষ্ণতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অথবা সুন্দরের মহিমা নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তবু তাহার মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির, ব্যক্তির হৃদয়াবেগ ও রূপহীন সমাজশক্তির গতিবেগের একত্র সন্নিবেশ দেখিতে পাই। শরৎচন্দ্র এই শ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের রস উপলব্ধি করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে তিনি বর্তমান যুগের সাহিত্যিক। সমাজশক্তির বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিযোগ বিদেশীয় সাহিত্যে আন্দোলিত হইয়াছে তাঁহার রচনায়ও তাহার ধ্বনি পৌঁছিয়াছে। তাঁহার রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে সমাজশক্তির নিপীড়নে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আরও মনে রাখিতে হইবে যে তিনি সমাজশক্তিকে আঘাত করিয়াছেন প্রধানতঃ তাহার নীতির দিক দিয়া, অর্থনীতির দিক দিয়া ততটা নহে। আমাদের দেশ দারিদ্র্যনিপীড়িত এবং এই দৈন্যের হাহাকার তাঁহার রচনায় অভিব্যক্ত হয় নাই এমন নহে।* কিন্তু তাঁহার রচিত অধিকাংশ প্রণয়-কাহিনীতে দারিদ্র্যের পীড়নের পরিচয় নাই। 'পল্লীসমাজে' এই সব পীড়নের ধ্বনি আছে বটে কিন্তু রমা-রমেশের হৃদয়ের আদানপ্রদানের কাছে তাহা গৌণ। তাঁহার অঙ্কিত নরনারী সবাই ধনশালী। গুরুচরণের অবশ্য অর্থ নাই—কিন্তু শেখরের দেরাজ কখনও খালি হয় না। গিরীনের পরোপচিকীর্ষা যেমন প্রবল অর্থও তেমনি প্রচুর। ললিতা ও শেখর, বিজয়া ও নরেন্দ্র, সাবিত্রী ও সতীশ—ইহাদের প্রেম আদানপ্রদানের অবকাশ ছিল প্রচুর, কারণ যে দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে মানবজীবনের সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায় তাহার পীড়ন তাহাদিগকে দীর্ণ করে নাই। ইহার আভাস দেখা গিয়াছে শুধু কিরণময়ীর জীবনে। সে যে অনঙ্গ ডাক্তারের কাছে নিজেকে বিক্রীত করিতে বসিয়াছিল তাহার মধ্যে তাহার উৎকট প্রেমলিপ্সা তো ছিলই, আর তাহার সঙ্গে ছিল সেই ডাক্তারের উপর তাহার একান্ত নিভরশীলতা। এই অধীনতা কি করিয়া মানবজীবনকে প্রতিহত করে শরৎচন্দ্র সে-বিষয়ের অণুমাত্র আলোচনা করেন নাই। উপেন্দ্রের আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের সমস্ত ভাবনা চুকিয়া গেল, হারাণবাবুর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হইল আর অনঙ্গ-ডাক্তারের সঙ্গে যে অভিনয় চলিতেছিল তাহারও অবসান হইল। বাস্তবিক শরৎচন্দ্রের রচনায় এই দিকটা প্রায় একেবারেই বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

'বিরাজবৌ', 'অরক্ষণীয়া', 'মহেশ', 'শেষ প্রশ্ন', 'হরিলক্ষ্মী', 'অভাগীর স্বর্গ'—ইহাদের মধ্যে দারিদ্র্যের চিত্র আছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে শরৎপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আর কমলের ও 'হরিলক্ষ্মী'র মেজবৌয়ের দারিদ্র্য তাহাদিগকে ম্লান করিতে পারে নাই; তাহাদের দারিদ্র্য বিজয়ী হইয়াছে। সে যাহা হউক শরৎচন্দ্র যে দারিদ্র্যের নিখুঁৎ নিপুণ চিত্র আঁকিতে পারেন তাহার প্রমাণ উপরি-উল্লিখিত গল্প ও উপন্যাসগুলিতে রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান উপন্যাসগুলিতে দারিদ্র্যের প্রভাব নাই বলিলেই চলে। এই সম্পর্কে বার্ণার্ডশ' বলেন, "Shakespeare's characters are mostly members of the leisured classes. The same thing is true of Mr. Harris' own plays and mine. Industrial slavery is not compatible with that freedom of adventure, the personal refinement and intellectual culture which the higher and subtler drama demands." বার্ণার্ডশ' যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা শরৎচন্দ্রের মনেও উঠিয়া থাকিবে।

ইহারও বোধ হয় একটা কারণ আছে। সমাজের জটিল প্রশ্নগুলিই যদি তাঁহার কাছে মুখ্য হইত, পুলিশকোর্টের বিচার, সুদখোরের অত্যাচার আর শ্রমিকের ধর্মঘট এই সব বিষয় লইয়া যদি তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে নানা রূপহীন শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে নরনারীর হৃদয়ের মাধুর্য লুপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহার সাহিত্যে বর্তমান যুগের এই বিশেষ ছাপটি নাই। তিনি সমাজকে দেখিয়াছেন শুধু চিরাগত নীতির দিক দিয়া। এখানে তাঁহার একটি বিশেষত্বের কথা নির্দেশ করিতে হইবে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে সমাজশক্তির প্রকাশ হইয়াছে একটা প্রাণহীন জড়পিণ্ডরূপে। মানবমন তাহার দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রাণহীনের সঙ্গে প্রাণবানের দ্বন্দ্ব। শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তাঁহার রচনায় সমাজশক্তি নরনারীর অন্তরাত্মার মধ্যে আশ্রয় পাইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা নির্জীব রূপহীন শক্তিমাত্র নহে। ইহা মানবের হৃদয়ের জিনিষ, তাহার অনুভূতির রসে প্রাণবান্। নীতির বচনগুলি খুব স্থূল, তাহা সকলের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। অথচ সাহিত্যে ধ্বনিত হয় নায়ক ও নায়িকার মর্মকথা—তাহার উপজীব্য তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ। যাহা সর্বসাধারণের উপরে প্রযোজ্য তাহা এত ব্যাপক যে তাহার মধ্যে রূপগ্রাহ্য সৌন্দর্যের অবকাশ নাই। শরৎচন্দ্র এই অস্পষ্টরূপ শক্তিকে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত অনুভূতিতে রঞ্জিত করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়াছেন।

(৩)

সমাজশক্তি অনেক সময় নিজেকে প্রকাশ করে চিরাগত সংস্কারের মধ্য দিয়া। সংস্কার কিন্তু একেবারে বাহিরের জিনিষ নহে। তাহার আসন রহিয়াছে আমাদের মনের মধ্যেই। মানব মনের জটিলতা অনন্ত। মানুষের বুদ্ধি আছে, অনুভূতি আছে। কতকগুলি অনুভূতি সংস্কারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাহাকে প্রাণ দিয়াছে। আবার অনেকের মনে বুদ্ধিও সংস্কারকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। এই যেমন 'চরিত্রহীনে'র সুরবালা। তাহার সমস্ত অনুভূতি ও বুদ্ধি জন্মার্জিত সংস্কারকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকের মন এত সহজ ও সরল নহে। তাহাদের সংস্কার আছে—এবং সংস্কারকে তাহারা বাহিরের জিনিষ বলিয়াও মনে করে না, উহা তাহাদের অন্তরাত্মার অঙ্গ। আবার বুদ্ধির সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে অনুভূতি। বুদ্ধি হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত, সংযত করিতে চাহে, কিন্তু হৃদয়ের যে গভীরতম তলদেশে

অনুভূতি সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত হয় বুদ্ধি সকল সময় সেখানে পঁহুছিতেই পারে না। মানবের ধর্মবুদ্ধি, বিবেক, সংস্কার-অনুবর্তিতা—হৃদয়ের আবেগ ইহাদিগকে মানিয়া চলে বলিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে, আবাব অন্তরাত্মার গুহাহিত অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে সমাজশক্তির মধ্যে মিশিয়া যায নাই বলিয়াই হৃদয়ের গতি এত বৈচিত্র্যময়, এবং এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রাণশক্তির শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের মনে দুই স্তবের চেতনা আছে। একটা অনুভূতি আমাদের বুদ্ধি, সংস্কার ও সমাজ হইতে পাওয়া—আর দ্বিতীয় ও গভীবতর স্তবেব অনুভূতির প্রেরণা আসে হৃদয়ের অন্তবতম প্রদেশ হইতে। শরৎচন্দ্রেব প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে এই পরস্পববিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের চিত্রণে। তাঁহাব অঙ্কিত নারীচরিত্রের বিশেষত্ব সর্বজনসম্মত। তাহারও কারণ আছে। পুরুষ বুদ্ধিজীবী। তাহার কাছে সংস্কার আসে প্রধানতঃ বুদ্ধির পথে এবং সাধারণতঃ বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়েব গভীরতম প্রদেশে আঘাত করে না। নারীর কাছে হৃদয়াবেগের মূল্য অনেক বেশী, সে সমস্ত অভিজ্ঞতা ও সংস্কারকেই অনুভূতি দিয়া রঞ্জিত করে। কাজেই সমাজশক্তি তাহার কাছে আন্তবিক প্রবৃত্তির বিরোধী বহিঃশক্তিমাত্র নহে—ইহা তাহার অন্তরেবই জিনিষ। ইহাকেও সে আপনাব কবিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ কবিযাছি তাহা বিশেষ করিয়া দেখা দেয নারীর চিত্তে। এই জন্যই শবৎ-সাহিত্যে নাবীচরিত্রেব স্থান এত উঁচু।

(নাবীচরিত্রেব মধ্যে প্রবৃত্তির সহিত সচেতন সংস্কাবের এই সংঘাতকেই শবৎচন্দ্র বড় করিয়া দেখিযাছেন। ভালবাসার আকর্ষণ অযস্কান্তের আকর্ষণের মত প্রবল, আবাব তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিও পর্বত-নিঃসৃত প্রবাহের মত দুর্বার। এই দ্বন্দ্বের কোনও মীমাংসা নাই—ইহাতে কোন কল্যাণ নাই. ইহাই তো সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। আমাদের দেশেব প্রাচীন সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নাই।) যুরোপীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি আসে মরণের মধ্য দিয়া। ডেস্‌ডিমোনা, কর্ডেলিয়া, হ্যামলেট যদি না মরিত তাহা হইলে কোন ট্র্যাজেডি হইত না। (কিন্তু শরৎচন্দ্র যে ট্র্যাজেডির চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাব মধ্যে মৃত্যুর স্থান নাই।) যে মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বেব মধ্যে নাবীজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত মহিমা নিঃশেষে নষ্ট হইযা যাইতেছে তাহাই সবচেযে বড় ট্র্যাজেডি। মৃত্যুর মধ্যে গৌবব আছে—কাজেই যে বিফলতা ট্র্যাজেডির প্রাণ, মৃত্যুর গৌরবে তাহা ঐশ্বর্যবান্ হইয়া যায়। কিন্তু এমন অবস্থা আসিতে পারে যখন জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য লুপ্ত হইয়া যায়—অথচ এই যে অপব্যয়, প্রাণশক্তির এই যে অপচয় ইহার

একটা অপরূপ মাধুর্যও আছে। সাবিত্রী অথবা রাজলক্ষ্মীর জীবন আলোচনা করিলে এই জিনিষটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। সাবিত্রী সতীশকে ভালবাসিত, নিজেকে সতীশের ভালমন্দের জন্য দায়ী মনে করিত, শত অপমানে বিদ্ধ হইয়াও তাহার কাছেই উপস্থিত হইত; সর্ববিষয়ে সে ছিল তাহার প্রিয়তম—তাহার চির-আকাঙ্ক্ষার পাত্র। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, এই তৃষ্ণা জীবনকে শুষ্ক করিয়া ফেলিলেও ইহার নিবৃত্তি নাই। যে আকর্ষণ তাহাকে সতীশের কাছে টানিয়া লইত, সেই আকর্ষণই তাহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। এই যে আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থিতজনকে পাইয়াও যাহা সার্থক হইতে পারে না, এই যে শূন্যতা যাহা পূর্ণ হইয়াও তেমনি রিক্ত থাকে ইহাই তো জীবনের চরম বেদনা। সাবিত্রী মনে করিত, যে দেহ পঙ্কিল হইয়াছে সেই দেহ দিয়া আরাধ্য জনের পূজা হইতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি তাহার দেহ তাহার মনের মতই পবিত্র ছিল। তাহাতে কোন কালিমা স্পর্শ করে নাই। আর যাহাকে সে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়াছে, যাহার কাছে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার কাছে ঐ দেহই কি হইল অদেয়, হউক না তাহা পঙ্কিল, হউক না তাহা নিকৃষ্ট? তারপর, যে পরিপূর্ণ মিলনের জন্য সে উন্মুখ হইয়াছিল তাহার কাছে দেহ তো খুব তুচ্ছ জিনিষ। সাবিত্রীর দুর্বলতা ছিল অন্যত্র। সতীশের প্রতি তাহার হৃদয় গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল—অন্তরের নিভৃত প্রদেশে এই প্রেমের আহ্বান উঠিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্যের সংস্কার, রমণীর একনিষ্ঠতার শিক্ষা তাহাকে বার বার বলিয়াছে এ ভুল, এ অন্যায়। তাই সাবিত্রী কাছে যাইয়াও সরিয়া গিয়াছে, আঘাত পাইয়াও অগ্রসর হইয়াছে, অগ্রসর হইয়াও পিছাইয়া গিয়াছে। তাহার মন একান্ত করিয়া বলিতে পারে নাই যে সতীশ ও তাহার প্রেমে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নাই। শুধু দেহের মলিনতা আশ্রয় করিয়া অন্তরের এত বড় আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইতে পারিত না। কিন্তু সাবিত্রী জানিত না যে তাহার দুর্বলতা কোথায়—তাহার অজ্ঞাতসারে তাহারই মনে যে কত বড় সংস্কার, সমাজশক্তির কত প্রবল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। ইহারই জন্য সে যে প্রেম একের কাছে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই তাহা দশের কাজে বিলাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। তাহার প্রেমের সমস্ত গৌরব ব্যর্থ হইয়া গেল সমাজশক্তির এই সমবেদনাহীন, অলক্ষিত পীড়নে। সমাজ বাহির হইতে তাহাকে আক্রমণ করে নাই—তাহার মনের ভিতরে বসিয়া তাহার বুদ্ধিকে, সংস্কারকে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিল।

এই দ্বন্দ্ব সব চেয়ে বেশী করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে। রাজলক্ষ্মী হিন্দুঘরের বিধবা, কিন্তু তাহার যদি সত্যিকার কোন বিবাহ হইয়া থাকে তবে তাহা শ্রীকান্তের সঙ্গেই। সে মিলন হইয়াছিল নিভৃতে, অজ্ঞাতসারে। যখন সে পিয়ারী বাইজী সাজিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিল তখন তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর প্রেম এমনি করিয়া নিজেকে মুদ্রিত করিয়াছিল যে তাহাকে মুছিয়া ফেলিবার শক্তি তাহার ছিল না। কিন্তু যখন সেই প্রার্থিত প্রিয়তমের সাক্ষাৎ জুটিল তখন রাজলক্ষ্মী বুঝিতে পারিল যে তাহার মনের ভিতরেই আর এক শক্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বেগও কম প্রবল নহে। সে শক্তি প্রথম দেখা দিল মাতৃত্বের গৌরবে। শেষে তাহা দেখা গেল তাহার ও শ্রীকান্তের সমাজভীতিতে। বাহিরের শক্তিকে মানিয়া লইলেও শরৎচন্দ্র তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনায় ইহাকে কখনও উচ্চ স্থান দেন নাই। "পৃথিবীতে কেবল মাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।" দ্বিতীয় পর্বের শেষে সমাজের প্রতিকূল দৃষ্টির মধ্যে শ্রীকান্ত 'লক্ষ্মী'কে স্বীকার করিয়া লইল। আমরা মনে করিলাম যে সমস্ত বাধা চলিয়া গেল,—বঙ্কুও সরিয়া গেল, সমাজের বাধার তুচ্ছতাও প্রমাণ হইয়া গেল। তাহারা যখন গঙ্গামাটিতে গেল, আমরা মনে করিলাম—এইবার সমস্ত বাধা টুটিয়া যাইয়া পরিপূর্ণ মিলন আরম্ভ হইবে।

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মধ্যে যে ধর্মবুদ্ধি একান্ত সচেতন হইয়াছে তাহাকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না; রাজলক্ষ্মীর মনে দুই বিরাট শক্তির মিলন ও সংঘাত চলিতে লাগিল। হিন্দুর চিরাগত ধর্ম ও বিধবার পুঞ্জীভূত সংস্কার —ইহাকে সে শ্রদ্ধা করিয়াছে, প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। রাখাল পণ্ডিত ও শিবু পণ্ডিতের কাছে বিবাহমন্ত্র অর্থহীন—শ্রীকান্তের কাছে ইহা নির্জীব, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কাছে ইহা প্রাণবান্। এই মন্ত্রের সাহায্যে সে শ্রীকান্তকে পায় নাই; কাজেই সে মনে করিত তাহার সমস্ত প্রেম ব্যর্থ, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কলঙ্কিত। তাই চলিল উপবাস, ব্রতপার্বণ ও সুনন্দার কাছে শাস্ত্রচর্চা। ইহাতেও শান্তি নাই, কারণ ইহাতে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই. এই জন্য ব্রত-পার্বণের ও নিমন্ত্রণের কলরোলে ও কাজের দিনের সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেও রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের জন্য স্বহস্তে রোগীর আহার্য প্রস্তুত না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে তীর্থদর্শনে যাইয়াও ঠাকুর দেখিতে পায় নাই—দেখিয়াছে শ্রীকান্তের লক্ষ্যহারা বিরস মুখ। শ্রীকান্তের সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ তাহা হিন্দু-ধর্ম-সম্মত নহে। কিন্তু তবু রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছে ধর্মের উপরও ধর্ম আছে এবং

শ্রীকান্তকে বাদ দিয়া সে যদি পূজাপার্বণ করে তবে তাহার স্বর্গের সিঁড়ি উপরের দিকে না যাইয়া নীচের দিকেই যাইবে। এই দুই প্রতিকূল প্রবাহের যে সংঘাত ইহা লইয়াই তাহার ট্র্যাজেডি। এ ট্র্যাজেডিতে মরণ নাই—কিন্তু ইহাতে জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত গৌরব ও মহিমা নিঃশেষে অপচিত হইতেছে। এই অপচয়ই তো ট্র্যাজেডি। আর ইহার গোড়ায় আছে সামাজিক শক্তির বিচারবুদ্ধিহীন নিপীড়ন। রাজলক্ষ্মী নিজেই সমাজের বিরুদ্ধে এই প্রশ্ন তুলিয়াছে, আর অভয়া এই সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। সে বলিয়াছে যে তাহার প্রেম অবৈধ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে মিথ্যার গ্লানি নাই। কিরণময়ী সমাজনীতিকে উপহাস করিয়াছে, ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়াছে, উপেন্দ্রের উপর প্রতিহিংসা লইতে গিয়া দিবাকরকে বলি দিয়াছে। ইহাতে তাহার নিজের জীবন মরুভূমির মত উষর হইয়া গিযাছে, এবং ইহা হইয়াছে সমাজ তাহাকে যে স্বামী দিয়াছিল তাহার জন্য এবং উপেন্দ্রের মনে সমাজ যে বিবেক জাগাইযা দিয়াছিল তাহার জন্য।[১]

(৪)

রাজলক্ষ্মীর মনে যে প্রশ্ন উঠিযাছিল, অভয়া যাহাকে অগ্রাহ্য করিযাছে, কিরণময়ী যাহাকে উপহাস করিয়াছে সেই প্রশ্নের সত্যিকার কোন মীমাংসা নাই। মানুষের হৃদযের যে অন্তরতম আত্মা তাহা হইতেছে তাহাব ব্যক্তিগত নিজস্ব জিনিষ। তাহা একান্ত একক—অথচ সমাজের নিয়ম হইতেছে সংহত গোষ্ঠীর জন্য। তাহা ব্যক্তিবিশেষের খবর রাখে না, সমাজের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। যে নিয়ম সমষ্টির জন্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহা স্থূল, মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিব সঙ্গে তাহার মিল হইবে কি করিয়া? অন্নদাদিদি, নিরুদিদি, অভয়া, রাজলক্ষ্মী—এই চারিজন মহিলার সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় হইয়াছিল। সমাজের অনুভূতিহীন, স্থূল নিয়মের সঙ্গে তাহাদের সবারই সংঘর্ষ হইযাছে। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের মন এত স্বাধীন, এত একক যে এমন কোন আইনই হইতে পারে না যাহার দ্বারা ইহাদের সবারই জীবনের মাধুর্য ও গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিত। অন্নদাদিদি যাহা পারিয়াছিল অভয়ার দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না, নিরুদিদি যে প্রলোভনে পড়িয়াছিল রাজলক্ষ্মী তাহাকে অবহেলা করিত। সমাজসৃষ্টির গোড়াতেই এত গলদ যে ইহার জন্য ব্যক্তি-বিশেষকে দায়ী করিলে চলিবে না—ইহার মূলে রহিয়াছে একটা সংহত শক্তি যাহা রূপহীন, বিচার-বুদ্ধিহীন, সমবেদনাহীন। আর এই যে গভীর

উপলব্ধির অক্ষমতা, ইহার জন্য শুধু সমাজকে দোষ দিলেও চলিবে না। মানুষের সচেতন বুদ্ধিই হৃদয়ের অলিগলির সন্ধান রাখিতে পারে না।" দেবদাস যখন পার্বতীকে ফিরাইয়া দিয়াছিল ও বলিয়াছিল যে পিতামাতার অবাধ্য সে হইতে পারিবে না তখন সে জানিত না যে তাহার সংজ্ঞাহীন অন্তরে পার্বতী যে আগুন জ্বালাইয়াছে তাহা তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিবে। সৌদামিনী যখন স্বামীর জন্য শাশুড়ীর সঙ্গে কোঁদল করিয়াছে তখন সে জানিত না যে নরেন্দ্র তাহার মনের মধ্যে নিভৃতে বসিয়া হাসিতেছে। নরেন্দ্র যখন তাহাকে লইয়া গেল তখনও সে বুঝিতে পারে নাই স্বামী ও সংস্কারকে সে কত ভালবাসে। কুসুম যখন হিন্দুর সংস্কার ও শিক্ষা এবং বড়মানুষের মেয়েদের সংস্রবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বৃন্দাবনকে পরিত্যাগ করিয়াছিল তখন সে জানিত না যে তাহার মনে মাতৃত্বের ও নারীত্বের আকাঙ্ক্ষা কত তীব্র। আবার সে যখন বৃন্দাবনের মাতার নিকট হইতে বালা রাখিল ও চরণকে মানুষ করিতে লাগিল তখন সে বুঝিতে পারে নাই তাহার পূর্বের সংস্কার কত দৃঢ়।

নিজের সম্পর্কে এই যে অনভিজ্ঞতা ইহা সব চেয়ে বেশী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে অচলার চরিত্রে। বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকের চরিত্রে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য লুক্কায়িত আছে। তাই আমাদের প্রত্যেক সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে ব্যবধানের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাই আমাদের সমস্ত প্রেম-মিলনের মধ্যে ব্যর্থতার সুর বাজিয়া উঠে। মানুষ কখনও নিঃশেষে আপনাকে দান করিতে পারে না— কারণ সে ত নিজেকে নিঃশেষে চিনিতেই পারে না। তাহার আত্মা স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে যে তাহাকে হাতে ধরিয়া দান করিবে। সমস্ত প্রেমের মধ্যেই এই ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত আছে। অচলা মহিমকে সমস্ত মন দিয়া ভালবাসিত আর সুরেশকে সমস্ত মন দিয়া ঘৃণা করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু ক্রমশঃ মহিমের নীরব আবেগহীনতা লক্ষ্য করিয়া ও মৃণালের সঙ্গে তাহার গোপন সম্বন্ধ সন্দেহ করিয়া মহিমের প্রতি তাহার প্রবল বিতৃষ্ণা জন্মিল ও সুরেশের প্রতি অলক্ষিতে একটা আকর্ষণ জন্মিল, কিন্তু ইহাকে পরিপূর্ণ প্রেম বলা যায় না। অচলা তাহার রুগ্ন স্বামীকে লইয়া যখন হাওয়া পরিবর্তন করিতে বাহির হইয়াছিল তখন সুরেশ যে কাণ্ড করিল তাহা তাহার একান্ত বিশ্বাসঘাতকতা ও পাশব নীচতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু এই যে বিশ্বাস-ঘাতকতা ইহার মূলে আছে এক দুর্দমনীয় প্রেমলিপ্সা। দুর্বার জলস্রোত যেমন করিয়া পাষাণের পায়ে আছড়াইয়া পড়ে এ প্রেম তেম্‌নি করিয়া অচলার গায়ে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। অচলার হৃদয় তো পাষাণ নহে। সে এই

দুর্দমনীয় প্রেমের প্রতিদান দিতে পারিত না, কিন্তু ইহাকে সে বুঝিতে পারিয়াছিল। ইহার উপরে ছিল তাহার অপরিসীম করুণা। কাজেই সুরেশের বিরুদ্ধে সে কোন দিন বিদ্রোহ করে নাই—তাহাকে সে সহ্য করিয়াছে। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মনে সুরেশের প্রতি একটা গভীর সহানুভূতি গোপনে আত্মরক্ষা করিতেছিল—টান পড়িলেই তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে স্বামীর যে মিথ্যা গৌরব সুরেশ দাবী করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে সে একটা কথাও বলে নাই—কিন্তু সুরেশের মৃত্যুর পর সে তাহার মুখাগ্নি করিয়া তাহার অমঙ্গলের বোঝা বাড়ায় নাই। মহিমকে সে শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, সুরেশকে সে শ্রদ্ধা করে নাই, তাহাকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিতেও পারে নাই, কিন্তু তাহার মনকে সে বুঝিতে পারিত, তাহার প্রতি তাহার গভীর সহানুভূতি ও একটা অলক্ষিত আকর্ষণ ছিল। এই যে তাহার অন্তর্নিহিত সহানুভূতি ইহা যে কত রূপহীন, কত গোপন, কত গভীর ইহা সে নিজেই বুঝিত না, এবং এই যে গোপন সংজ্ঞাহীন প্রীতি ইহাই তাহার জীবনের প্রধান দুর্দৈব,—এই জন্যই স্বামীকে পাইয়াও সে হারাইয়াছিল, এবং তাহাকে হারাইয়া আর ফিরিয়া পায় নাই। ইহাই জীবনের গভীরতম ট্র্যাজেডি। কারণ ইহার ক্ষয় করিবার, ধ্বংস করিবার শক্তি আসে নিজের হৃদয় হইতে। অথচ ইহার মধ্যে সমাজের বিরুদ্ধে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ নিহিত আছে। এই ট্র্যাজেডি দেখাইয়া দেয় সমাজনীতি কত স্থূল, মানবমনের ভালমন্দের বিচার করিবার অধিকার তাহার কত কম। অচলাকে কি আমরা অসতী বলিয়া গালি দিব? অথচ সে তো তাহার নিজের মনের ধর্মের সঙ্গে কখনও প্রবঞ্চনা করে নাই। এই যে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা যাহার গতি এত বিসর্পিত, যাহার মূল রহিয়াছে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে তাহার সম্পর্কে কোন স্থূল আইনই খাটিবে না। ইহাকে বুঝিতে হইবে, সহানুভূতি দিতে হইবে, ইহাকে স্বীকার করিতে হইবে। হয়ত ইহা কোনদিন সমাজশক্তির বশীভূত হইবে না, হয়ত কোন আইনেই ইহার নিজস্ব গতি নিয়ন্ত্রিত হইবে না। কিন্তু এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে বাদ দিয়া, না বুঝিয়া যে সমাজশক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সত্যিকার মূল্য কতটুকু?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শরৎ-সাহিত্যে নারী

রমণীর প্রেম

শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন মানবমনের সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ছবি। বর্তমান যুগের সাহিত্যের উপজীব্য হইতেছে সমাজের প্রভাব। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে এখানে সমাজশক্তির প্রভাবও দেখা দেয় বাহিরের শক্তি হিসাবে নহে; তাহাও তাহার মনের মধ্যেই নীড় বাঁধিয়াছে। মানব-হৃদয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা তাহার নিজস্ব সম্পদ্ আর ধর্মবুদ্ধির মূল রহিয়াছে সংস্কারে। নারীর চিত্তে এই দুইটি শক্তির মধ্যে নিরন্তর যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তিনি তাহাকেই রূপ দিয়াছেন। মেঘের আড়াল ভেদ করিয়া বাহির হয় বলিয়াই তো বিদ্যুৎ এত উজ্জ্বল, উপলবহুল পথ ভাঙ্গিয়া আসিতে হয় বলিয়াই তো স্রোতস্বিনী এত বেগবতী। তাই মানবহৃদয়ের মাধুর্য সেইখানেই বেশী করিয়া ক্ষরিত হইয়াছে যেখানে তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে প্রবল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে। এই প্রতিকূল শক্তি যত অন্তর্নিহিত হইবে তাহার গতি হইবে তত দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাবৃত, তাহার ক্ষমতা হইবে তত অসীম।

সংস্কারের শক্তি আসে দুই দিক হইতে। মানুষ তাহাকে পায় বাহিরের সমাজ, সভ্যতা ও ধর্ম হইতে, কিন্তু সে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার মনে। আর প্রেমলিপ্সার সঙ্গে ইহার সংঘর্ষ হয় বেশী করিয়া নারীর হৃদয়ে। পুরুষের চিত্তে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা বহু প্রবৃত্তির মধ্যে মাত্র একটি। পুরুষের অধিকাংশ কাজ বাহিরের জগতের সঙ্গে; সেখানে সে অর্থ চায়, ক্ষমতা চায়। তাহার রাজনীতি, তাহার অর্থনীতি—ইহার সঙ্গে তাহার ভালবাসার সংস্রব নাই। কিন্তু নারীর পক্ষে এ-কথা খাটে না। তাহার সমস্ত চেষ্টার মূলে রহিয়াছে প্রেম ও স্নেহ। রাজলক্ষ্মীর ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল শ্রীকান্তকে পাইয়া আর সাবিত্রীর অধিকারলিপ্সা সীমাবদ্ধ ছিল সতীশকে লইয়া। কিন্তু পুরুষের পক্ষে ইহা সত্য নহে। তাই গঙ্গামাটিতে শ্রীকান্তের দিন কাটিত না; রাজলক্ষ্মী নিজেই বলিয়াছে, "গঙ্গামাটির অন্ধকূপে মেয়েমানুষের চলে, পুরুষমানুষের চলে না। এখানকার এই কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন তো তোমার পক্ষে আত্মহত্যার সমান।" প্রশ্ন হইবে আজকালকার নারী তো সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে

সমান অধিকার দাবী করিতেছে। কিন্তু এ নিতান্ত আধুনিক কালের কথা। শরৎ-সাহিত্যে এই নূতন যুগের মানবীর পরিচয় নাই বলিলেই চলে। তাঁহার সাহিত্যে নারী জানে শুধু স্নেহ-মমতা। আর তাঁহার উপন্যাসের ক্ষেত্র রাজনীতির ক্ষেত্রও নহে। তাহা হইতেছে মায়া-মমতার ক্ষেত্র এবং তথায় নারীর অচল কর্তৃত্ব। তাই শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে সমস্ত জোর আসিয়াছিল রাজলক্ষ্মীর নিকট হইতে। শ্রীকান্ত জোয়ারের স্রোতকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই আর ভাটার টানকেও প্রতিহত করিতে পারে নাই। সতীশ ছিল খুব শক্তিশালী সাহসী পুরুষ, কিন্তু সাবিত্রীকে দেখিলে তাহার সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইত। যদুনাথ কুশারী মহাশয় তর্কালঙ্কার অধ্যাপক পণ্ডিত মানুষ কিন্তু তাঁহার স্ত্রী সুনন্দার কাছে তিনি নগণ্য। গিরিশের ছোটভাই রমেশ যতই নিষ্কর্মা, তাহার স্ত্রী শৈলজা আবার ততই নিপুণা। প্রায় সব উপন্যাসেই এই রকম। অবশ্য পল্লীসমাজের রমেশ একজন পুরুষসিংহ—কিন্তু তাহার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র এমন জায়গায় যেখানে রমার সঙ্গে তাহার সংস্রব কম। সামাজিক ব্যাপারে যেখানে তাহাদের সংঘর্ষ হইয়াছে সেইখানেই রমেশ রমার কাছে পরাজিত হইয়াছে। শরৎ-সাহিত্যে মাত্র একটি পুরুষ আছে যাহার চিত্তপটে রমণী তাহার প্রাধান্য মুদ্রিত করিতে পারে নাই। সে হইতেছে 'শেষ প্রশ্নে'র রাজেন। রাজেন ঘোর বিপ্লবী—প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র লইয়া তাহার কারবার; কাজেই কুসুমেষুর সঙ্গে তাহার সংস্রব নাই। ইহা ছাড়া অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন প্রণয়ের চিত্র—আর তাহাতে বিশেষ করিয়া চিত্রিত হইয়াছে রমণীর মন—তাহার সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা লইয়া।

নারীর মনকে তিনি দেখিয়াছেন একটা সংঘাতের মধ্য দিয়া যেখানে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার ধারা বাধা পাইয়াছে চিরাগত সংস্কারের পাষাণ-প্রাচীরে। এই প্রকারের উপন্যাসের প্রধান দোষ এই যে অনেক সময় অনেক মিথ্যা বাধাকে সত্যিকার বাধা বলিয়া ভ্রম হয়, আর তাহাতে হৃদয়াবেগ অনাবশ্যক রকমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অনুভূতি মানুষের বড় সম্পদ, কিন্তু যদি তাহা সামান্য কারণেই উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, তবে তাহার অকিঞ্চিৎকরত্বই প্রমাণিত হয়। চোখের জল মুক্তার সঙ্গে উপমিত হইয়াছে, কিন্তু ফুলটি পড়িলে বা পাতাটি নড়িলেই যে অশ্রু বর্ষিত হয়, তাহা নকল মুক্তার মতই মূল্যহীন। প্রত্যেক মহার্ঘ জিনিষই দুষ্প্রাপ্য, একথা অর্থনীতিবিদ্‌রা স্বীকার করিবেন, আর সাহিত্যেও সেই কথা খাটে। সমুদ্রের অতলতলে ডুব দিলে তো খাঁটি মুক্তা মিলিবে, ডুব না দিয়াই যে মুক্তা মিলে তাহা মেকী। বুদ্ধি

ও সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়াবেগের যে দ্বন্দ্ব তাহাকেই শরৎচন্দ্র ভাষা দিয়াছেন। কিন্তু অনেক জায়গায় আঘাত অপেক্ষা ব্যথা হইয়াছে বেশী আর ব্যথা অপেক্ষা কান্না হইয়াছে আরও বেশী এবং সেইখানে সৎসাহিত্যের পরিবর্তে আমরা পাইয়াছি সেন্টিমেণ্টাল সাহিত্য।

এই যেমন 'স্বামী'। ছেলেবেলায় সৌদামিনী ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল। কিন্তু সেই ভালবাসার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। একদিন সৌদামিনী ফুল চুরি করিতে গিয়াছিল আর তখন নরেন্দ্রনাথ কি একটা করিয়া বসিল—এই যা। ইহা শৈবলিনী-প্রতাপের ভালবাসার মত নয়, পার্বতী-দেবদাসের ভালবাসার মতও নয়। বিবাহের পর সৌদামিনী নিজেই বলিয়াছে, "আগে যে ভেবেছিলুম নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হলে সেই দিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না।" শ্বশুরবাড়ীতে যাইয়া স্বামীর পক্ষ লইয়া সে ঝগড়া করিত সৎশাশুড়ীর সঙ্গে, এমন সময় সেখানে আসিল নরেন্দ্রনাথ। সে মুখে বলিল আসিয়াছে শিকার করিতে, কিন্তু এ অভিযান সৌদামিনীশিকারের, পাখীশিকারের নয়। পরস্ত্রীলুব্ধের এই নির্লজ্জতায় সৌদামিনীর মন গভীর বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু শেষে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই সে আবার পলায়ন করিল। কেন তাহার এই দুর্মতি হইল বলা কঠিন। হয়তো তাহার সৎশাশুড়ী তাহার স্বামীর উপর যে অবিচার করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া শিক্ষিত রমণীর মন গভীর বিরুদ্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর সে এইভাবে পলায়ন করিয়াছিল তাহারই জন্য। কিন্তু স্বামীর জন্য তাহার স্নেহহীনা বিমাতার সঙ্গে কলহ করিয়া স্বামিত্যাগ করিবার ইহাই যথেষ্ট কারণ হইতে পারে না। এই অবিচার তাহাকে আরও বেশী করিয়া স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিবে, ইহাই বরং স্বাভাবিক। সৌদামিনীর হৃদয়ে নরেন্দ্রের প্রতি যথার্থ আসক্তি ছিল বড় কম; তাহার প্রায় সমস্ত প্রেরণাই আসিয়াছিল একেবারে বাহির হইতে। বাহিরের শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি হইতে পারে না এমন নয়। গ্রীক্ ট্র্যাজেডি দৈবের নির্মম পীড়নের কাহিনী। শেক্সপিয়রের নাটকেও দৈবের কথা নাই এমন নহে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ইহাকে আশ্রয় করে নাই। তিনি বাহিরের একটি শক্তিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন; তাহা হইতেছে সমাজের নীতিধর্ম। আর সেই নৈতিক আদর্শও রূপ লইয়াছে নারীচিত্তে সংস্কারের মধ্য দিয়া। সৌদামিনীর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যথেষ্ট আর নরেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণও ছিল খুব কম। স্বামীর

আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাওয়ার কোন উপযুক্ত কারণ তাহার মনের ভিতর ছিল না। তাই শরৎচন্দ্র বাহিরের দিক দিয়া কতকগুলি কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন সৎ-শাশুড়ীর সন্দেহ, আড়িপাতা, স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার, তাহাদের বাড়ী পুড়িয়া যাওয়ার সংবাদ তাহার স্বামীর সময়মত তাহাকে না দেওয়া। কিন্তু মনের ভিতরে যাহার শিকড় নাই, বাহির হইতে তাহার উপর জলসেচন করিয়া কি লাভ হইবে? উপসংহারে সৌদামিনী বলিয়াছে, "এত কান্না বোধ হয় জীবনে কাঁদি নাই।" এই উপন্যাসখানিতে কান্না আছে প্রচুর, কিন্তু প্রকৃত বেদনা আছে খুব কম। তাই শিল্পের দিক দিয়াও ইহা নিকৃষ্ট। ইহাতে উচ্ছ্বাস আছে—কিন্তু গভীর অনুভূতির চিহ্ন নাই।

'পল্লীসমাজে'ও বাহিরের শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। রমা রমেশকে ছেলেবেলায় ভালবাসিত, তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইবার কথাও হইয়াছিল; তারপর রমেশ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল শিক্ষালাভের জন্য, আর রমা বিবাহের পরে ছয়মাসের মধ্যেই বিধবা হইল। শিক্ষা শেষ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর দেশে ফিরিয়া রমেশ দেখিল যে জমিদারি লইয়া রমা ও তাহার মৃত পিতার সঙ্গে বহু মোকদ্দমা হইয়াছে। দুই বাড়ীর মধ্যে সম্প্রীতি নাই মোটেই। দেশে আসিয়া রমেশ পল্লীসমাজের নানা সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলির মধ্যে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিল। আর এই দলাদলির মধ্যে তাহার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা যাহারা করিল তন্মধ্যে রমা প্রধানা। অথচ রমা তাহাকে ভালবাসিতও খুব। ইহাই হইতেছে রমার জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি যে, প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় সে তাহার একান্ত প্রেমাস্পদের শত্রুতা সাধন করিয়াছে। রমেশ দেশে আসিয়া পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই সে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। রমেশের পিতার শ্রাদ্ধের উল্লেখ করিয়া সে প্রথমেই বেণী ঘোষালকে বলিয়াছে, "আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ীতে?" ইহার কিছুদিন পরে মাছের ভাগ লইয়া সে অতিরিক্ত রূঢ়তার সহিত রমেশের চাকরকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অথচ ইহার পরেই সে তাহার ভাই যতীনকে যেরূপ সস্নেহে রমেশের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, তাহাতে বুঝা গেল রমেশকে সে কত ভালবাসে। কাজেই রমেশের প্রতি এই অকারণ কঠোর আচরণের একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে এই কঠিন বর্ম দিয়া সে তাহার হৃদয়ের গভীর প্রীতিকে লুকাইয়া রাখিতে চাহে। ইহার সঙ্গে ছিল সমাজের শক্তি আর যদু মুখুয্যের মেয়ে হওয়ার গৌরব ও তারিণী ঘোষালের প্রতি শত্রুতা। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, তাহার সুস্থ সময়ে রমেশ তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, সে বলিয়া উঠিত, "মুখুয্যেদের দান গ্রহণ করিতে

ঘোষালদের লজ্জা হয় না।" রমেশের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় শত্রুতা সে করিয়াছিল রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া, আর ইহা সে করিয়াছিল সমাজের কলঙ্কের ভয়ে। কাজেই তাহার জীবনের গভীর ট্র্যাজেডির মূলে রহিয়াছে বাহিরের সমাজশক্তি ও দলাদলির জের। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত জোর কতটুকু? আর ঐ যে মুখুয্যেবংশের গৌরব ইহা রমার নারীর পক্ষে শোভা পায়, রমার মত মেয়ের কাছে ইহা কত অকিঞ্চিৎকর। তারপর যে সমাজশক্তির ভয়ে সে রমেশকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, জেলে পাঠাইয়াছে তাহারই বা মূল্য কতটুকু? সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছে, 'যে সমাজের ভয়ে এত বড় গর্হিত কর্ম করিয়া বসিল, সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও ক্রুর হিংসার বাহিরে কোথাও কি তাহার অস্তিত্ব আছে?' কাজেই দেখা যাইতেছে যে যে শক্তির বিরুদ্ধে রমাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রবল নহে, অথচ ইহারই কাছে সে বলি দিয়াছে তাহার একান্ত প্রেমাস্পদকে। তাই তাহার ভালোবাসারই মূল্য কি? শেষে রমা রমেশের কলঙ্ক মোচন করিয়াছে, রমেশের কাছে ক্ষমা চাহিয়াছে, তাহাকে তাহার ভাই যতীনের অভিভাবক করিয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে বাধার তুলনায় ব্যথা হইয়াছে বেশী, ব্যথার তুলনায় কান্না হইয়াছে অতিরিক্ত।

এই রকম আরও দুই একখানা উপন্যাস আছে যেমন 'বড়দিদি', 'পথ নির্দেশ' ও 'পণ্ডিতমশাই'। 'বড়দিদি' মাধবীর সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছিল তাহার অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া—কোন কিছুরই খেয়াল খবর সে রাখিত না। এরূপ খেয়ালী লোকই স্নেহ ও কৃপার পাত্র। বিধবার উষর হৃদয়ে সুরেন্দ্রনাথ স্নেহের নির্ঝর উৎসারিত করিয়া দিল। মাধবীর হৃদয়ে প্রথম জাগিয়াছিল খানিকটা মাতৃস্নেহ, তার পরে সেই স্নেহই রূপান্তরিত হইল প্রেমে। সে তাহার বাপের কাছে বলিয়াছিল, 'বাবা, পাগল যেমন তার মাষ্টারও তেমনি দুজনেই ছেলেমানুষ।' কিন্তু ক্রমে ছেলেমানুষের প্রতি কৃপাই ভালবাসায় পরিণত হইল। ইহা প্রথমে দেখা গেল তাহার কৃতজ্ঞতা আকাঙ্ক্ষায়। মাষ্টারমশাইকে চশমা কিনিয়া দিল অথচ সে কোনরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল না, ইহাতে মাধবী কুণ্ঠিত এবং পীড়িত হইল, প্রমীলাকে খুঁটিনাটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া দেখিল মাষ্টার কোনরূপ আনন্দ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে কিনা। সে শুধু ভালবাসা দিয়াছে তাহাই নয়, অজ্ঞাতসারে তাহার মনে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার সখী মনোরমার কাছে সে এক চিঠি লিখিল আর তাহাতে সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে

লিখিল, 'শুনিতে পাই তাহার পিতামাতা আছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ। আমি ত বোধ হয় এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না।' এই শেষের পংক্তিতেই মাধবীর মন মনোরমার কাছে ধরা দিল। শেষে কৃতজ্ঞতা যখন আর জুটিল না তখন সে চলিল কাশী—সুরেন্দ্রনাথ বুঝুক মাধবী না থাকিলে তাহার কত অসুবিধা ও কষ্ট হয়। মাধবীর মনে এই ক্রমশঃ প্রেম সঞ্চারের ছবি খুব স্বাভাবিক ও চিত্তাকর্ষক। আর ইহাই শরৎচন্দ্রের নিজস্ব ক্ষেত্র। কিন্তু এখানেও শরৎচন্দ্র বাহিরের শক্তি আনিয়া এই উপন্যাসের মাধুর্য নষ্ট করিয়াছেন। বাহিরের সে শক্তি মানব মনের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহার বর্ণনায় কোথাও তাহার প্রতিভার বিকাশ হয় নাই। মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে একরকম তাড়াইয়াই দিয়াছিল, কিন্তু সে জানিত না যে সুরেন্দ্রনাথ আর আসিবে না এবং তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না। কাজেই এই যে তাহার আকস্মিক ভুল যাহাতে তাহার অন্তর্যামী কখনও সায় দেয় নাই ইহাই হইল তাহার সবচেয়ে বড় বোঝা। হিন্দুবিধবার আজন্মার্জিত সংস্কারের সঙ্গে নারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা—ইহার চিত্রণেই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। মাধবীর মনেও সেই সংঘর্ষ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাহার কাহিনীতে সেই জিনিষটিকে একেবারে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন, মুহূর্তের আকস্মিক ভ্রান্তিই হইতেছে এই ট্র্যাজেডির মূল।

এইরূপ আকস্মিক ভুলকে ট্র্যাজেডির অঙ্গীভূত করা যায় অবশ্যই। ডেসডিমোনা রুমাল হারাইয়া ফেলিয়া নিজের জীবনে কত অনর্থ ঘটাইয়াছিল, দলনী বেগমের দুর্ভাগ্যের গোড়ায়ও ছিল এমনি একটা আকস্মিক ভুল। ভ্রমর যদি অভিমান করিয়া অসময়ে পিত্রালয়ে না যাইত তাহা হইলে হয়ত সে অমন করিয়া স্বামিহারা হইত না। কিন্তু বর্তমানযুগের সাহিত্যে, বিশেষতঃ শরৎ-সাহিত্যে, আকস্মিক ঘটনার স্থান খুব কম। মানুষ যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাহা হইতেছে সমাজের সংহত শক্তি, তাহার মধ্যে আকস্মিক, অনিশ্চিত কিছুই নাই। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে হৃদয়াবেগের সঙ্গে বুদ্ধির সংগ্রামের চিত্র অঙ্কনে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে পাইয়াও পায় নাই, সতীশ সাবিত্রীর কাছে গেলেই সাবিত্রী তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। পরিপূর্ণ প্রেমের এই যে অপরিতৃপ্তি, ইহারই বেদনা শরৎ-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মাধবীর সমস্ত দুঃখের মূলে হইল এক আকস্মিক ভুল। সুরেন্দ্রনাথ যে তাহার কথায় সত্যি সত্যি চলিয়া যাইবে, চলিয়া গেলে তাহাকে যে আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না—ইহা ত সে মনে করিতেই

পারে নাই। আর যখন তাহাকে পাওয়া গেল তখন সে মাধবীর আশ্রয় ছাড়িয়া গিয়াছে—সে আর আসিল না, মাধবীও তাহার কাছে গেল না। মাধবীর এই যে না-যাওয়া, হিন্দুবিধবার এই যে প্রলোভন নিরোধ তাহার দিক্ দিয়া ইহাই সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু শরৎচন্দ্র ইহাকে করিয়াছেন নিতান্ত গৌণ। সুরেন্দ্রনাথ জমিদারি পাইলে তাহার শিথিল শাসনে তাহার আমলারা নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল আর তাহাদের সেই অত্যাচারের কবলে পড়িল 'বড়দিদি' মাধবী। এই উৎপীড়নের সঙ্গে মাধবীর হৃদয়ের কোন সংস্রব নাই, সুরেন্দ্রনাথও ইহা জানিয়া করায় নাই, আর এই অত্যাচারে বহু বিধবা, বহু মাধবী দলিত হইয়া গিয়াছে। এই সামাজিক চিত্র এখানে অবান্তর, কারণ জমিদারের বিচারহীন অত্যাচার বা তাহার আমলার উৎপীড়ন গল্পের বিষয় নহে। ইহা মানবমনের কাহিনীও নয়—কারণ ইহার সমস্ত আঘাত আসিয়াছে বাহির হইতে, ঘটনাপরম্পরার আকস্মিক ঐক্য হইতে। মৃত্যুশয্যায় সুরেন্দ্রনাথ যে রক্তবমন করিতে লাগিল তাহার কারণও সেই পূর্বেকার আঘাত, যাহার জন্য মাধবী ছিল মাত্র অংশতঃ দায়ী। "সুরেন্দ্রনাথ মাধবীকে বলিল, 'বড়দিদি, সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কেমন শোধ হলত?' মুহূর্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুণ্ঠিত মস্তক সুরেন্দ্রের স্কন্ধের পার্শ্বে রাখিল। যখন জ্ঞান হইল বাড়ীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।" প্রেমকাহিনীর এই যে করুণ উপসংহার হইল ইহার মূলে রহিয়াছে বাহিরের ঘটনার সমাবেশ। অথচ গ্রীক ট্র্যাজেডিতে, শেক্সপীয়রের নাটকে বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দৈবের যে বিশালতা, যে দুর্দমনীয় প্রভাব আমরা অনুভব করি—এখানে তাহার কোন চিহ্ন নাই। মানবমনের অনন্ত জটিলতা, সমাজশক্তির অনতিক্রম্য প্রভাব, হৃদয়ের অজেয় আকাঙ্ক্ষা—এই কাহিনীতে ইহাদের সুস্পষ্ট পরিচয় নাই। ইহা করুণ রসাত্মক গল্প—ট্র্যাজেডির গভীরতা ইহাতে নাই।

'পথ-নির্দেশ'ও অনেকটা এই রকমের। গুণীনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য হেমনলিনীর মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রতিকূল কোন শক্তি তাহার নিজের মনের মধ্যে ছিল না। হিন্দুরমণীর সংস্কার তাহার মনে দৃঢ় হইতে পারে নাই। গুণীন্ তাহার রক্ষক হইয়া আবার তাহাকে ভক্ষণ করিতে চায়, সে এই কথা বলিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাই তাহার যথার্থ মত একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। বিধবা হইয়া সে এম্‌নি করিয়া গুণীনের কাছে

আসিয়া উপস্থিত হইল যে গুণীন্ তাহার হাবভাব দেখিয়া বুঝিতেই পারে নাই কত বড় বিপদ্ তাহাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সদ্যঃবিধবার বৈরাগ্য ও গভীর বেদনার কোন চিহ্নই ছিল না। সে তাহার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ ও নিজের একান্ত ক্ষুধাবোধের কথা উভয়ই একসঙ্গে তাহার গুণীদাকে জানাইয়া দিল এবং এই সঙ্গে ইহাও বলিল যে সে সেই পরিবার হইতে কোন জিনিষই আনে নাই, যাহা খাইয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দান করিয়াছে। সে ইহাই বুঝাইতে চাহে যে স্বামিগৃহের সঙ্গে তাহার কোন সত্যিকার যোগ ছিল না; স্বামীর মৃত্যুর পব তাহার যেন মনে হইল যে তাহার এক বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং সে মুক্ত হইয়া তাহার একান্ত প্রণয়াস্পদ গুণীনের কাছে আসিয়াছে। শেষে কিন্তু পতিভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সে আরম্ভ করিল প্রচণ্ড ধর্মচর্চা আর ইহারই তেজে সে গুণীনের প্রণয়প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিল। ইহাই হইতেছে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব ক্ষেত্র—নারীহৃদয়ের এই কঠোর সংগ্রাম;—একদিকে দুর্দমনীয় হৃদয়াবেগ আর একদিকে প্রবুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি। খাটি ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিতে হইলে এই উভয় শক্তিকে করিতে হইবে সমভাবে প্রবল, কিন্তু হেমনলিনীর মনে সংস্কারের প্রভাব খুবই ক্ষীণ। বিবাহের পূর্বেই সে ব্রাহ্ম গুণীনের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছে, বিবাহে সে গভীর আপত্তি জানাইয়াছে, বিবাহের পর গুণীনের বাড়ীর উল্লেখ করিয়া সে বলিয়াছে যে সেখানে যত পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে তাহা বৈকুণ্ঠে বসিয়াও হয় না। স্বামীর মৃত্যুর পরেও তাহার সমস্ত আচরণে স্বামীর প্রতি প্রীতির একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির নিষ্ঠার সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না। যে রমণীর বিশ্বাস এত শ্লথ, সেই যদি হিন্দুরমণীর সতীধর্মের বড়াই করিয়া তাহার প্রিয়তমকে প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে এই প্রত্যাখ্যান বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ট্র্যাজেডির উপাদান ক্ষীণ—তাই ইহাকে উচ্চাঙ্গের আর্ট বলা যায় না।

আর একটা কথা। হেমনলিনী ও ললিতার প্রেমের মধ্যে একটা একান্ত নির্ভর রহিয়াছে অর্থের দিক দিয়া। গুণীন্ হেমনলিনী ও তাহার মাকে আশ্রয় দিযাছিল আর শেখরের অর্থসাহায্য ছিল ললিতার একটা প্রধান অবলম্বন। যে প্রেমের মূল হইতেছে আর্থিক নির্ভরশীলতায়, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহার মধ্যে খানিকটা নীচতা থাকিবেই, তাহা কখনও স্বতঃপ্রণোদিত প্রেমের গৌরব দাবী করিতে পারে না। ললিতা ও শেখর এবং হেমনলিনী ও গুণীনের ভালবাসার সঙ্গে নরেন্দ্র ও বিজয়ার প্রেমের তুলনা হইতে পারে না। বিজয়া নরেন্দ্রের কাছে

অর্থের জন্য ঋণী তো ছিল না বরং তাহার সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে কাড়িয়া লইয়াছিল, নরেন্দ্র ছিল এমনি স্বাধীনচেতা যে একটা মাইক্রস্কোপ পর্যন্ত বিজয়া তাহাকে উপহার দিতে সাহস পায় নাই। বিজয়া নরেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহার উন্নত, বলিষ্ঠ দেহ ও তাহার ততোধিক উন্নত, বলিষ্ঠ চরিত্র দেখিয়া। রাজলক্ষ্মীর অর্থ ছিল অগাধ, কিন্তু শ্রীকান্ত তাহা গ্রহণ করে নাই একটুও—সে গিয়াছে সুদূর বর্মাদেশে তাহার আহার সংস্থানের জন্য। পরভৃৎ হইয়া কোকিলের সুরের মাধুর্য নষ্ট হয় না কিন্তু মানুষের জীবনের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়।) সুরেশ অচলার বাবার ঋণ পরিশোধ করিয়া অচলাকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে অচলার মন সুরেশের প্রতি শুধু বিরুদ্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মানুষের অন্তরাত্মা কখনও পণ্যের মত বিক্রীত হইতে পারে না। এই অগৌরবের কথা হেমনলিনী ও ললিতার মনে কখনও জাগে নাই। শেখর ও গুণীনের চরিত্রে ভালবাসিবার মত কিছু ছিল না এমন নহে, কিন্তু একথা মানিতেই হইবে যে তাহারা ললিতা ও হেমনলিনীকে আকর্ষণ করিয়াছিল প্রধানতঃ তাহাদের ঐশ্বর্য দিয়া। শেখর যে অভিমান করিত তাহা কি শুধু ভালবাসারই দাবী? হেমনলিনী যে রাগ করিয়া বলিয়াছিল যে গুণী রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইতেছে ইহার মধ্যে কি কোন সত্য নাই? শরৎচন্দ্র এসকল প্রশ্নের আলোচনা একেবারেই করেন নাই, হেমনলিনী ও ললিতার চিত্ত বিশ্লেষণে এই দিকটা একেবারে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

'পণ্ডিতমশাই' সম্বন্ধে এসব কথা খাটে না।। কুসুম নিরন্ন, বৃন্দাবন অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন। কিন্তু কুসুম কোনোদিন বৃন্দাবনের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় নাই। আর যেদিন সে বৃন্দাবনের আশ্রয় চাহিয়াছিল, সেদিনও আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কৃপা ভিক্ষা করে নাই, ইহা পরিণীতা স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার দাবী। কুসুমের জীবনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাহার উপরে বাহিরের তাড়না খুব কম। সমাজশক্তির প্রভাব দেখা দিয়াছে তাহার নিজের শিক্ষার মধ্য দিয়া। তাহার স্বামী বৃন্দাবন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পর হইল তাহার কণ্ঠিবদল, আবার কণ্ঠিবদলের 'আসল বৈরাগী'টিও শুভকার্যের ছয়মাসের মধ্যেই নিত্যধামে গমন করিলেন। ইহার পর তাহার স্বামী তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে রাজি হইল, আর বোষ্টমদের মধ্যে ইহাতে বাধাও হইত না বিশেষ কিছু। কিন্তু শিশুকাল হইতেই কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে একত্র প্যারীপণ্ডিতের পাঠশালায় লিখিয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে; আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গী সাথী। তাই এসব প্রসঙ্গে ঘৃণায়

লজ্জায় তাহার মন শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু ক্রমে তাহার স্বামীর সহিত পরিচয় হওয়ায় একদিন তাহার সপত্নীপুত্রকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে নারীত্ব ও মাতৃত্ব জাগিয়া উঠিল। তখন যে স্বামীকে সে এতদিন নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাকে পাইবার জন্যই তাহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইল। কিন্তু তবু সেই মিলন অপূর্ণই রহিয়া গেল। সে নিজে যখন তাহার স্বামীকে স্বামী বলিয়া মানিয়া লইল তখন আর প্রকৃত বাধা রহিল না কিছুই। আর পূর্বের বাধার মূলেও ছিল বইয়ে পড়া বিদ্যা, হিন্দু বিধবার আজন্মার্জিত সংস্কার নয়। সে যাহাকে ভালবাসিয়াছিল সে শ্রীকান্ত বা সতীশের মত নিঃসম্পর্কিত নয়, সে তাহারই স্বামী, কাজেই তাহার সঙ্গে মিলনের পথে তেমন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা কিছুই থাকিতে পারে না। মিলনের অন্তরায় হইল একদিনের ক্ষণিকের অভিমান যাহার জন্য সে তাহার স্নেহশীলা শাশুড়ীর দেওয়া আশীর্বাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহার পরে সে বারংবার তাহার জন্য অনুশোচনা করিয়াছে, স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য। বৃন্দাবন তাহাকে নিজে লইয়া যাইতে স্বীকার করে নাই, তাহাকে একাকী পায়ে হাঁটিয়া যাইয়া তাহার মার কাছে উপস্থিত হইতে বলিয়াছে। অভিমানিনী কুসুমের হৃদয় ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সে বলিয়াছে, "কি করে আমি দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ভিক্ষুকের মত গ্রামে গিয়ে ঢুকব?" কিন্তু নিজের মনে মনে বলিয়াছে, "·········তিনি নিজেও জানেন আমিই তাঁর ধর্মপত্নী, তবে কেন তিনি আমার এই অন্যায় স্পর্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্প পা দিয়া ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না?" এই ভাবে কুসুমের সমস্ত বাধাই আসিয়াছিল একটা সামান্য স্পর্ধা ও দর্প হইতে যাহাকে সে নিজেই ভাঙিয়া ফেলিতে চাহিত। তাহার অন্তরতম অন্তঃস্থলে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার কাছে ইহার মূল্য কতটুকু? বাস্তবিক এই ট্র্যাজেডির মূলে কোন গভীর সংঘর্ষ নাই। নারীর স্বামিসঙ্গ আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিয়াছে পাঠশালার শিক্ষা আর ক্ষণিকের অভিমান। ইহাদের মিলনকে নিবিড় করিয়া তুলিবার জন্য কবিকে চরণের মৃত্যু কল্পনা করিতে হইয়াছে। তাহা না হইলে এই মিলন হইত একেবারে কমেডি।)

'দেবদাসে'র মধ্যেও সেই একই সমস্যা। বাল্যকালে দেবদাস ও পার্বতী এক পাঠশালায় পড়িত এবং তখন তাহাদের মধ্যে গভীর ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল। শরৎ-সাহিত্যে পাঠশালা বাগ্‌দেবীর পীঠস্থান হউক না হউক

অতনুদেবতার প্রধান লীলাভূমি—এখানে রমার সঙ্গে রমেশের দেখা হইয়াছিল, পার্বতী দেবদাসকে পাইয়াছিল আর রাজলক্ষ্মী বঁইচিমালা দিয়া শ্রীকান্তকে বরণ করিয়াছিল। সে যাহা হউক, পার্বতী ও দেবদাসের মধ্যে বিবাহ হইতে পারিল না,—যেমন সামাজিক কারণে রমা ও রমেশের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে নাই। রমা ছিল রমেশের চেয়ে বড় কুলীন আর পার্বতীর অপেক্ষা দেবদাসের বংশগৌরব বেশী। কিন্তু পার্বতীর কাছে এই সব মানমর্যাদার মূল্য কম। সে দেবদাসকে বলিল বাপমায়ের অবাধ্য হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে। দেবদাস বলিল, "বাপমায়ের অবাধ্য হইব ?" পার্বতী উত্তর করিল, "দোষ কি ?" পার্বতীর মধ্যে একটা সাহস আছে যাহার তুলনা মিলে শুধু রমার অভয়াতে। পরে মনোরমার পত্র পাইয়া সে যখন দেবদাসকে নিতে আসিল, তখনও সে মনোরমার আপত্তিকে জোরের সহিত নিরস্ত করিল। মনো বলিল, "পারু কি দেবদাসকে দেখ্‌তে এসেছিলে ?"

"না সঙ্গে করে নিতে এসেছিলাম। এখানে আর আপনার লোকত কেউ নাই।" মনোরমা অবাক্ হইল। কহিল, "বলিস কি ? লজ্জা করত না ?"

"লজ্জা আবার কাকে ? নিজের জিনিষ নিজে নিয়ে যাব তাতে লজ্জা কি ?"

"ছিঃ ছিঃ ও কি কথা ? একটা সম্পর্ক পর্যন্ত নেই—অমন কথা মুখে এনো না।" পার্বতী ম্লান হাসিয়া কহিল, "মনোদিদি জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে বাসা করে আছে, এক আধবার তা মুখ দিয়ে বার হয়ে আসে।"

পার্বতীর এই সাহস ছিল নিজের জিনিষকে নিজের বলিয়া দাবী করিবার। তবুও সে পারিয়া উঠে নাই, প্রথম অন্তরায় হইয়াছিল তাহার অভিমান। সে সদর্পে দেবদাসকে বলিয়াছিল, "তোমার বাপ মা আছে, আমার নেই ? তাদের মতামতের প্রয়োজন নেই ?" তারপর সে হিন্দুর ঘরের বউ—তাহার পক্ষে সমাজত্যাগ করার কথা বলা যত সহজ তাহা কার্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। বোধহয় দেবদাসও তাহাতে রাজি হইত না। হয়ত বা হইত। পার্বতীর চরিত্র বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র এই সব কারণের যথোপযুক্ত আলোচনা করেন নাই। যে সভ্য সংস্কারের দুরতিক্রমণীয় শাসনের কাছে হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হয় তাহা পার্বতীর মনে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার সম্যক্ বিচার করা হয় নাই। শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনার মধ্যে এই উপন্যাসখানি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে তাঁহার প্রতিভার আভাস আছে কিন্তু তাহার বিকাশ হয় নাই।

(২)

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে বাহিরের শক্তিগুলিকে যথাসম্ভব গৌণ করিয়া লইয়া সমস্ত সংগ্রামটাকে মনের ভিতরে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। দুর্বার প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও প্রবুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি এই দুই প্রতিকূলগামী শক্তির মধ্যে নিরন্তর যে নিদারুণ সংঘর্ষ হইতেছে তিনি তাহারই চিত্র আঁকিয়াছেন। ধর্ম-বুদ্ধি বলিয়া কোন মৌলিক বৃত্তি আছে কিনা সন্দেহ। আমরা যাহাকে নীতি ও ধর্ম বলি তাহা হইতেছে সমাজ হইতে পাওয়া। কিন্তু ইহার বিকাশ হয় মানুষের মনে। শরৎচন্দ্রের রচনায় বাহিরের সমাজশক্তির প্রভাবের কথা বেশী করিয়া দেখান হইয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির ক্রীড়াভূমি হইতেছে মানুষের মন যেখানে তাহাকে বাধা দিয়াছে নারীর সহজাত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা। ইহাতে উচ্ছ্বাস নাই, আতিশয্য নাই, ইহার মূল রহিয়াছে অন্তরের অন্তঃস্থলে। ইহা মানব জীবনের চরম দুর্ভাগ্য ও শ্রেষ্ঠ সম্পদের কথা জানাইয়া দেয়। জ্বরের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় শ্রীকান্তকে পাটনায় লইয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মী অপরিসীম যত্নে তাহার সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া আবার নিজেই তাহাকে বিদায় দিতে উদ্যত হইল। ইহা বাহিরের তাড়না নহে; সমাজ প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে বাধা দেয় নাই, সেখানে কোন 'পল্লীসমাজ' ছিল না। তাহার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিল তাহার মাতৃহৃদয়। "তাহার অসংযত কামনা ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাহুক কিন্তু একথাও ভুলিতে পারে না যে সে একজনের মা এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোন মতেই অপমান করিতে পারে না।" শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট হইয়া গেল—হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মাঝখানে দাঁড়াইল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের কাছ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইল আর শ্রীকান্ত গেল তাহার নিজের শয়নকক্ষে নিদ্রাহীন রজনী যাপন করিবার জন্য। অনেক রাত্রে রাজলক্ষ্মী গোপনে শ্রীকান্তের ঘরে ঢুকিয়া বাহিরের জানালা বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া তাহার গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া দিল। শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল। নিভৃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শ, তাহার এই লুকান একাগ্র সেবা—ইহার মাধুর্য অভিব্যক্তি পাইয়াছে এই আসন্ন বিচ্ছেদের গ্লানিমার মধ্য দিয়া। বুদ্ধি দিয়া যাহাকে সরাইয়া দিয়াছিল, গোপন আবেগ দিয়া এম্‌নি করিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার কাছে আত্মনিবেদন করিল। শ্রীকান্ত

নিজেই বলিয়াছে, "যে গোপনে আসিয়াছিল তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।"

ইহার কিছুকাল পরে শ্রীকান্ত আবার হাজির হইল বর্মা যাওয়ার ও বিবাহ করিবার প্রস্তাব লইয়া। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের একান্ত শুভানুধ্যায়িনী— তাহার বিবাহের প্রস্তাবে সে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া অগ্রণী হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ইহাতে আমি সুখী না হইলে কে সুখী হইবে?" কিন্তু সে শ্রীকান্তের শুভানুধ্যায়িনী অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে শ্রীকান্তকে পাইবার জন্য আর তাহারই বলে শ্রীকান্তের হৃদয়ে সে চায় অচলকর্তৃত্ব। তাই শ্রীকান্তের বিবাহে তাহার বুদ্ধি সায় দিতে পারে; কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা সম্মত হইবে কি করিয়া? শুভানু-ধ্যায়িনীর অন্তরাল ভেদ করিয়া প্রণয়িনীর হৃদয়ের বেদনা ফুটিয়া উঠিল। এই সংবাদ প্রথমে সে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিল, পরের চিঠি পড়িবে না বলিয়া উপেক্ষা করিয়া রাখিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চিঠি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরিয়া রাখিল! কিছুক্ষণ পরে চিঠি পড়িয়া সে নিতান্ত নিরপেক্ষভাবে পাত্রী সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু যে বিবাহের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার সম্পর্কে নির্বিকার হইবে সে কি করিয়া? বাহিরে সে যতই ঔদাসীন্যের ভান করিতে লাগিল, তাহার মন ততই আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল; মুখে সে যতই উৎসাহ জ্ঞাপন করিতে গেল, হৃদয় তাহার ততই বিষাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে সে বুঝিতে পারিল যে সে শুধু ভালবাসা দেয় নাই, পাইয়াছেও; তাহার নিন্দিত জীবনের সঞ্চিত কালিমা সত্ত্বেও তাহার প্রণয়াস্পদ তাহারই জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার সমস্ত সন্দেহ আশঙ্কা কাটিয়া গেল, তাহার কলঙ্কলিপ্ত জীবন অপূর্ব গৌরবে ভরিয়া উঠিল, হতভাগিনীর সমস্ত দুর্ভাগ্য ভেদ করিয়া আনন্দের বান ডাকিয়া গেল। ইহার বর্ণনা দিতে যাইয়া শ্রীকান্ত বলিয়াছে, "পলকের জন্য দুজনে চোখোচোখি হইল এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারীবাইজীর বুকফাটা অভিনয় যেন

অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।" যে কান্না পিয়ারীর সমস্ত উৎসব ঐশ্বর্যের অন্তরালে এত দিন জমিয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা তাহার মিথ্যা মুখোস ফেলিয়া দিয়া ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নানা বাধা অতিক্রম করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই তো এই কান্না এত বেদনাময় ও এত মধুর।

'দেবদাস' প্রভৃতি উপন্যাসের ট্র্যাজেডির গোড়ায় রহিয়াছে ক্ষণিক অভিমান বা ক্ষণিকের ভ্রান্তি। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর কাহিনীতে মান অভিমান আছে; কিন্তু ট্র্যাজেডির মূল রহিয়াছে হৃদয়ের অন্তরতম অন্তঃস্থলে; তাহা মান-অভিমানের অতীত। অভিমান ও ঈর্ষায় ইহার সঞ্চিত মাধুর্য আরও বেশী করিয়া উপচিয়া পড়ে মাত্র। রাজলক্ষ্মীর বাড়ী আসিয়া শ্রীকান্ত দেখিল যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজের কুটুম্ব পূর্ণিয়া জেলার জমিদার রামচন্দ্র সিংহ মহাশয় সেখানে সদলবলে সমুপস্থিত। শ্রীকান্তের আকস্মিক অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী চকিত হইয়া উঠিল, তারপর শ্রীকান্ত সত্যই তাহাকে ভালবাসে কিনা তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহার মনে একটা প্রবল ঈর্ষার ভাব জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। ঈর্ষা তো ভালবাসার কষ্টি-প্রাথর। তাহার এই চেষ্টার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিল তাহার শঙ্কা, তাহার ভালবাসা, তাহার অনুনয়। সে যতই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল যে সে শ্রীকান্তকে সাধারণ অতিথি বই অন্য কিছুই মনে করে না, তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খেয়াল করে না, ততই তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার কথাবার্তায়, তাহার শত ক্ষুদ্র আচরণে তাহার নিজের হৃদয়ের গোপন কথাই বাহির হইয়া পড়িল। তাহার ঔদাসীন্যের আড়ালে ছিল করুণ আগ্রহ, তাহার আঘাতের অন্তরালে ছিল একান্ত দীন প্রেমভিক্ষা। মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে শ্রীকান্ত তাহাকে লইয়া প্রয়াগে যাইতে রাজি নয় দেখিয়া রাজলক্ষ্মী রোষে ও অভিমানে প্রতিশোধ লইবার জন্য সেইদিন জুড়ীগাড়ী করিয়া বাহির হইয়া গেল। শ্রীকান্তকে সে দেখাইতে চাহে যে একটা ঐশ্বর্যময় জীবন সে শ্রীকান্তের জন্যই ত্যাগ করিয়াছিল, এবং ইচ্ছা করিলেই সে আবার তাহা আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু এই রোষদৃপ্ত অভিমানের মধ্য দিয়া তাহার একান্ত দুর্বলতাই অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল। সে কাহারও কেনা দাসী নয় একথা শ্রীকান্তের কাছে সাহঙ্কারে ঘোষণা করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকান্তের সামান্য উষ্মার কাছে তাহার সমস্ত অভিমান, সমস্ত দর্প নিঃশেষে মিলাইয়া গেল।

এই সব চিত্রে শরৎচন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্যের চরম বিকাশ হইয়াছে—যেখানে অর্ধচেতন প্রেমবেদনা সচেতন সংস্কার ও অনুভূতির বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রাজলক্ষ্মীর চরিত্রের আর একটা বিশেষত্বের কথা এখানে উল্লেখ

করিতে হইবে। তাহার মধ্যে একটা অসাধারণ শক্তি ও একটা অপরিসীম দুর্বলতার অতি অপরূপ সমাবেশ হইয়াছে। তাহার শক্তির অন্ত নাই, আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। অনেক বিত্ত সে উপার্জন করিয়াছে, অনেক কিছু সে হেলায় ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীকান্তকে পাইবার জন্য সে সব সম্পদ্ ত্যাগ করিয়াছে, এবং এই অশেষশক্তিশালিনী রমণী তাহার অধিকারলিপ্সাকেও একেবারে বিসর্জন দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই যেদিন ইহলোকের সমস্ত পাওয়া তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল সেই দিন শ্রীকান্তকে পরিত্যাগ করিতে চাহিল। গভীর নৈরাশ্যে শ্রীকান্ত নিজেই বলিয়াছে, "রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবধি নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে সে যেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে। একদিন এই খেলায় আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার সেই একাগ্র বাসনার প্রচণ্ড আকর্ষণ প্রতিহত করিবার সাধ্য আমার ছিল না, হেঁট হইয়া আসিয়াছিলাম।......আজ তাহার চিত্ত ইহলোকের সমস্ত পাওয়া তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। অতএব অন্যান্য আবর্জনার মত আমাকেও যে এখন পথের এক ধারে অনাদরে পড়িয়া থাকিতে হইবে তাহা যত বেদনাই দিক, অস্বীকার করিবার পথ নাই।"

চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল কমললতার। এই কমললতার কাহিনী চমকপ্রদ, তাহার মাধুর্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমলের চরিত্র কলঙ্কলিপ্ত হইলেও তাহার মধ্যে ঔদার্য, মহত্ত্ব ও ত্যাগশীলতার অভাব নাই। কিন্তু তবু এ চিত্র শরৎচন্দ্রের শিল্পকলার খাঁটি নিদর্শন নহে, কারণ এই রমণীতে শরৎচন্দ্রের নায়িকার বিশিষ্ট ছাপটি নাই। কমললতা বিধবা, বাড়ীর সরকারের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে সে হইল সন্তানের জননী। এই কলঙ্ককে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য সে বৈষ্ণবী হইল, কিন্তু দেখিতে পাই যে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সন্তানকে জন্ম দিয়া সে আর তাহার পূর্ব প্রণয়ীকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, যদিও তাহার নূতন ধর্মকে মানিতে হইলে এই লোকটিই তাহার স্বামিপদবাচ্য। ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ স্পষ্ট হয় নাই। বোধ হয় এই লোকটির চরিত্রের বর্বরতাই কমললতাকে ইহার প্রতি বিরূপ করিয়াছে। কিন্তু প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের অন্যান্য নায়িকার বৈশিষ্ট্য, কমললতায় তাহার আভাস মাত্র নাই। গহর গোঁসাই এই রমণীর জন্য নিজেকে ব্যর্থ করিয়াছে। তাহার শেষ রোগশয্যায় কমললতা অমানুষিক সেবা করিয়াছে, কিন্তু এই সর্বত্যাগী প্রণয়ীকে কেন যে সে প্রত্যাখ্যান করিল,

তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীকান্তের প্রতি তাহার অনুরক্তি আছে, হয়ত এই অনুরক্তি প্রণয়ে রূপান্তরিত হইত, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে রাজলক্ষ্মী। কৈশোরে বৈধব্য হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারিকাদাস বাবাজির আশ্রম হইতে নির্বাসন পর্যন্ত কমললতা বহু অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহার চিত্ত নিপীড়িত হইয়াছে, উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তঃস্থলে যে রহস্য রহিয়াছে, গ্রন্থকার তাহাকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করেন নাই।

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাবিত্রীর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই বিধবা, উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে হিন্দু বিধবার আজন্মার্জিত সংস্কারের সঙ্গে নারী-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার। কিন্তু আর্টের দিক দিয়া সাবিত্রীর চিত্র অনেকটা নিকৃষ্ট হইয়াছে—ইহার মধ্যে সেই বেদনা, সেই তীব্রতা নাই। ইহার কারণ এই যে সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতার একটা সূত্র রহিয়াছে বাহিরে। সরোজিনী সতীশকে খুবই ভালবাসিত; সরোজিনীকে সতীশ ভালবাসিত না এমন নহে, কিন্তু তাহার প্রতি সতীশের মনে গভীর স্নেহ ছিল এমন প্রমাণও নাই। সাবিত্রী যদি ইচ্ছা কবিত তবে সতীশের সঙ্গে তাহার মিলন বোধ হয় সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারিত। সাবিত্রীকে পাওয়া সম্ভব হইল না বলিয়া সতীশ সরোজিনীর প্রেমের প্রতিদান দিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইল। অপরের প্রেমাস্পদকে ভালবাসার মধ্যে একটা গভীর ব্যর্থতা আছে। সে হিসাবে সরোজিনীর জীবন একটা ট্র্যাজেডিতে পরিসমাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু কবির দৃষ্টি সেদিকে গেল না। অপেক্ষাকৃত অগভীর প্রেম সফলতায় মণ্ডিত হইল আর সাবিত্রীর সীমাহীন ভালবাসা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। যে গৌরব পার্বতী ও রাজলক্ষ্মী পাইয়াছিল সে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল; অথচ এই ব্যর্থতার জন্য তাহার মাত্র আংশিক দায়িত্ব ছিল। তাহার মত সব দিক দিয়া এমনি নিঃস্ব আর কে হইয়াছে? শেষের দিকে উপেন্দ্র কথার জাল বুনিয়া তাহার জীবনের শূন্যতা ভরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত ব্যর্থতা স্নেহের স্তোকবাক্যে ভরিবে কেন?

অচলার সমস্যা হইতেছে সর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাহার প্রশ্ন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে নয়; সে হিন্দু সমাজের মেয়েই নয়। সে ব্রাহ্ম—মৃণাল যে ধর্মনিষ্ঠার বড়াই করিতে পারিত সে তাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত নয়। সে যে প্রশ্ন তুলিয়াছে তাহা কোন বিশেষ ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, তাহা গোল বাধাইয়া দেয় মানব সভ্যতার গোড়ার কথা লইয়া। পূর্বে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ

প্রচলিত ছিল, এখনও তাহা একেবারে উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু বর্তমান যুগের সভ্যতার ও নীতির গোড়ার কথা হইতেছে এই যে নারী হইবে একচারিণী। দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর ঘর করিয়া সতী নাম পাইয়াছিল, এখন এরকম কথা কল্পনা করাও বীভৎস। কিন্তু সমাজের সাধারণ বিধি-নিষেধ দিয়া সকল নারীর মন বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। তাই বার্ণার্ডশ'র এক নাটকে জনৈকা রমণী প্রশ্ন করিয়াছে, "Oh how silly the law is! Why can't I marry them both······Well, I love them both." অচলার জীবনের ব্যর্থতার মূলও রহিয়াছে এইখানে। সে যাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই, আর যাহাকে কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই অলক্ষিতে তাহারই প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। যে দুই বন্ধু তাহার জীবন-নাট্যে এতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহারা ছিল একেবারে বিপরীত প্রকৃতির; একজন ছিল পর্বতের মত নীরব, নিশ্চল ও আবেগহীন, আর একজনের প্রবৃত্তি ছিল জলোচ্ছ্বাসের মত দুর্বার। একজনের মনের কথা সে কখনও জানিতে পারিত না, আর একজন প্রতি কথায় নিজেকে নিঃশেষ করিয়া নিবেদন করিত। অচলার সচেতন বুদ্ধি যাহা বুঝাইয়াছে তাহার গুহাহিত আত্মা অজ্ঞাতসারে ঠিক তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি জাগাইয়াছে। সুরেশের নীচতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া মহিমকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া সে তাহার শ্বশুরবাড়ী স্বামীর ঘর করিতে গেল। সেখানে সে যখন মহিমের প্রতি ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিল তখন যে স্নেহ অলক্ষিতে সুরেশের প্রতি তাহার মনে জমিয়া উঠিতেছিল তাহাই বাহির হইয়া পড়িল। যে সুরেশকে সে ঘৃণা করিত তাহাকেই সে ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না, সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আমাদের অসময়ে বন্ধু কেহ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে বলো, এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেছে, কোথাও যেতে দিবে না। আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে তার ঘর করার জন্যে আমাকে তোমরা রেখে যেয়ো না।" কিন্তু লজ্জায় অনুতাপে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। স্বামীকে ছাড়িয়াই সে বুঝিল স্বামীর প্রতি টান তাহার কত গভীর। ইহার পর স্ত্রীর ন্যায্য আসন সে ফিরিয়া পাইল সেবার মধ্য দিয়া।

কিন্তু স্বামীকে সে যত নিবিড়, যত গভীর করিয়াই পা'ক তাহার প্রণয়ভিক্ষু সুরেশের প্রতিও তাহার মন আকৃষ্ট হইল। একদিন শীতের রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সুরেশ নিঃশব্দে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিজের

গাত্রাবাসখানি দিয়া তাহার ঘুমন্ত দেহ সস্নেহে সযত্নে আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছিল। "সে চোখ বুজিয়া সেই আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।……এই কদাচারে তাহার লজ্জার পরিসীমা রহিল না এবং ইহাকে কুৎসিত বলিয়া গর্হিত বলিয়া সহস্র প্রকারে অবমানিত করিতে লাগিল এবং অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর এই চৌর্যবৃত্তিকে সে কোনদিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু তথাপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কিছুতেই সায় দিতেছে না ইহাও তাহার অগোচর রহিল না……।" এই দ্বৈধতাই তো অচলার জীবনের ট্র্যাজেডি। সে যখন মহিমকে পাইয়াছে তখন সুরেশের জন্য তাহার হৃদয়ে অলক্ষ্যে একটা আসন প্রস্তুত রহিয়াছে, আর সুরেশকে যখন তাহার দেহ দান করিয়াছে তখন তাহার মন মহিমের জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। সে যখন মহিমকে লইয়া চেঞ্জে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন সুরেশের জন্য তাহার মন একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সুরেশকে দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং সে তাহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিল। তারপর সুরেশ তাহাকে স্বামীছাড়া করিলেও সে সুরেশকে ছাড়িতে পারে নাই। সেই বিশ্বাসঘাতক, পরস্ত্রীলুব্ধ, নাস্তিক কাপুরুষকেই সে সেবা করিয়া বাঁচাইয়া তুলিল আর তাহার স্ত্রী হইবার মিথ্যা গৌরবকে আশ্রয় করিয়াই সে নূতন করিয়া জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিল। একটা মিথ্যা নামের গৌরবকে অবলম্বন করিয়া সে এমনি করিয়া তিলে তিলে নিজেকে দগ্ধ করিতে পারিত না যদি তাহার অন্তরালে সুরেশের জন্য একটা প্রকৃত মমতা তাহার মনে না থাকিত। সৌদামিনীকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ পলাইয়াছিল, কিন্তু সৌদামিনী তাহার সঙ্গে থাকিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে স্বামীর প্রতি আসক্তি তো ছিলই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা বেশী ছিল নরেন্দ্রনাথের প্রতি খাঁটি আসক্তির অভাব। অচলার সমস্যা ইহার অপেক্ষা গুরুতর; কারণ অজ্ঞাতসারে সুরেশের জন্য তাহার মনে একটা মমতার সৃষ্টি হইযাছিল। নিজের মনের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে সে নিজে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই—ইহাই হইল তাহার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। সে নিজের কাছে এই বলিযা ক্ষোভ করিযাছে, "যাহাকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই, সে-ই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই জানিয়া রাখিল…।" কোনদিন ভালবাসে নাই!—কিন্তু এই সুরেশের মৃত্যু কল্পনা করিয়াই সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। সুরেশ তাহাকে আর ভালবাসে না এ কথা শোনার পর নিজের জীবনটা তাহার কাছে একেবারে ফাঁকা বলিয়া মনে হইয়াছে। 'সুরেশ

নাই—সে একা। এই একাকিত্ব যে কত বৃহৎ, কিরূপ অকূল তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। সে নিরুদ্ধ কণ্ঠ প্রাণপণে পরিষ্কার করিয়া কহিল, "আর কি তুমি আমাকে ভালোবাসো না……এক সময়ে তোমাকে আমি ভালবাসতুম।" অচলার জীবনে ছিল একটা মূলীভূত অসঙ্গতি। সুরেশের ভালবাসা ছিল তাহার বিড়ম্বনা, তাহার সম্পদ, তাহার সম্বল। ইহাতে অগৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে মিথ্যার ফাঁকি নাই। নারীহৃদয়ের এই যে বিরোধ ও অসঙ্গতি ইহার বিশ্লেষণেই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব।/

'দেনাপাওনা'র ষোড়শীর মধ্যেও সেই দ্বন্দ্ব, সেই বিরোধ ও সেই একই ব্যর্থতা। একশ' টাকার লোভে অলকাকে বিবাহ করিয়া জীবানন্দ নব-পরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বিবাহরাত্রেই পলায়ন করিয়াছিল। তারপরে বীজগাঁয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া সে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিল। প্রজার উৎপীড়ন, অবিরত মদ্যপান, রমণীর সতীত্বনাশ—ইহাই হইল তাহার কাজ। সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে তাহারই এলাকায় চণ্ডীগড় গ্রামের ৺চণ্ডীর ভৈরবী হইল সেই অলকা যাহাকে একদিন সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। ভৈরবী হওয়ার পর অলকার নাম হইল ষোড়শী। জীবানন্দ ষোড়শীর পিতাকে উৎপীড়ন করিয়া টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য ষোড়শী গেল জীবানন্দের কাছে। সেইখানে জীবানন্দ তাহার কাছে প্রথম চাহিল টাকা, তারপর চাহিল তাহার দেহের উপর অধিকার। সেই রাত্রিতে জীবানন্দ খুব অসুস্থ হইয়া পড়িল; কাজেই ষোড়শীকে সে একটা নির্জন ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার হুকুম দিল—পরদিন তাহার সতীপনার বোঝাপড়া হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে ঘটিল এক অদ্ভুত ব্যাপার। ষোড়শীর পিতার কথায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ষোড়শীকে বলপূর্বক আনিয়া আটক করিবার অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য সেইখানে উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেই ষোড়শী এই নৃশংস পশুর উপরে প্রতিহিংসা লইতে পারিত, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু বলিল যে সে স্বেচ্ছায় জীবানন্দের গৃহে আসিয়াছে এবং স্বেচ্ছায় রাত্রি যাপন করিয়াছে।

তাহার এই ব্যবহার যেমনি আকস্মিক তেমনি অদ্ভুত। যে পাষণ্ড তাহাকে বিবাহ করিয়া ত্যাগ করিয়াছে, নারীর চোখের জলে যাহার করুণা হয় না, স্বামী-পুত্রবতীর সতীধর্মকে হত্যা করিতে যাহার বাধে না, যে তাহাকে আটক রাখিয়াছিল নারীর চরম লাঞ্ছনার জন্য, তাহাকে বাঁচাইবার স্পৃহা তাহার মনে জাগিল কেন? আর শুধু কি তাই? ইহা তো শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকার

নয়। এই মিথ্যা স্বীকারোক্তি—ইহা যে তন্মুহূর্তেই তাহাকে দুর্নামের গভীরতম পঙ্কে ডুবাইয়া দিবে, সবাই জানিবে ৺চণ্ডীর এই ভৈরবী কুলটা, ধর্মত্যাগিনী! কিন্তু ষোড়শীর পক্ষে ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই ছিল না, বহু দিনের নিদ্রিত অলকা সেইদিন জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে সন্ন্যাসিনী, কিন্তু সে নারী। তাহার নিপীড়িত জীবনের রুক্ষতা, তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শূন্যতা ও শুষ্কতার অন্তরালে এই রমণীহৃদয় নিভৃতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। ধীরে ধীরে আদান প্রদানের মধ্য দিয়া তাহার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কারণ সে সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। সমস্ত সম্ভোগ হইতে সে জোর করিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়াছে। তাই তাহার হৃদয়বৃত্তি জাগিয়া উঠিল পুরান স্মৃতির আকস্মিক মন্থনে। সে হিন্দুরমণী—আর ভৈরবী হওয়ার একটা সর্ত হইতেছে এই যে সে হইবে সধবা। কাজেই সন্ন্যাসিনী হইলেও অলক্ষিতে স্বামীর প্রতি তাহার একটা টান থাকিবেই এবং এই অর্ধলুপ্তসম্পর্কের আহ্বানেই সেই দিন তাহার নিজের ক্ষতি করিয়া সে তাহার স্বামীকে রক্ষা করিল। সন্ন্যাসিনীর জীবনে প্রেমের অবকাশ না থাকিতে পারে, কিন্তু সধবা ভৈরবীর মন হইতে স্বামীর স্মৃতি বিদূরিত হইবে কি করিয়া?

তাহার এই মিথ্যা ভাষণের অন্তরালে রহিয়াছে এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি। সে হিন্দু রমণী—তাই স্বামীর অমঙ্গল সে কখনও কামনা করিতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, যে স্বামীর সঙ্গলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, যে বাসর রাত্রিতে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার উচ্ছৃঙ্খল অসংযত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই স্বামীর প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা হওয়াই স্বাভাবিক। সেই লম্পটের উপকার করিবার ইচ্ছা হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু মানবমনের গতি বিচিত্র। মনুষ্যচরিত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে যৌন আকর্ষণ নিতান্ত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (impersonal)। ইহা ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, হিংসা প্রভৃতি সকল বৃত্তির সঙ্গেই মিশিয়া থাকিতে পারে। প্রত্যেকের জীবনের গতি একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই জন্য কল্পলোকের চিত্রও পার্থিব জগতের অনুরূপ হয়। অলকা, অন্নদাদিদি—ইহারা হিন্দুরমণী। স্বামীর সঙ্গে যে সম্বন্ধ হইয়াছে তাহাকে ইহারা ভগবানের বন্ধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই ইহাদের প্রেমাকাঙ্ক্ষা স্বামীকেই জড়াইয়া ধরিবে—তা' সে স্বামী যতই ঘৃণ্য, দুশ্চরিত্র হউক। তারপর ষোড়শী সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী —কাজেই ত্যাগ করিবার, ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তিকে সে ধর্মের মত অনুশীলন

করিয়াছে। অবমানিত, উপদ্রুত, ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয়ের একটা চরম বৈরাগ্য আছে যাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি 'গৃহদাহ'-এর উপসংহারে অচলার মধ্যে। এই বৈরাগ্য ছিল সন্ন্যাসিনী ষোড়শীর হৃদযে। জীবানন্দকে সে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার ভৈরবী জীবনেবও সেই সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। নির্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ বহিয়া সে জীবানন্দের কথা ভাবিল, তাহার নিজের কথা, পিতা তারাদাসের কথা—সবই সে আলোচনা করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন কূলকিনারা পাইল না। যেদিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার চোখে পড়িল শুধু নিদারুণ আঁধার—যাহার রূপ নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই। পরদিন সেই একান্ত নিরাশ্বাসেব মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তখন তাহার প্রতিহিংসা নেওয়ার প্রবৃত্তি নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সেই দুরপনেয় অন্ধকাব ভেদ করিয়া প্রতিহিংসা কোন্ আলোর সন্ধান আনিবে? এই চরম বৈরাগ্যের দিনে সে লাভ লোকসান মিলাইযা দেখিল না, সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিল আর জীবানন্দকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিল। সে নিজেই জীবানন্দকে বলিযাছিল, "আমার যিনি গুরু তিনি হাতে রেখে কিছু দান করেন না, তাই আজ তাঁরই পায়ে নিজেকে এমন কোবে বলি দিতেও আমার বাধল না।"

এই যে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি—যাহা সম্মিলিত হইযা তাহাকে এই চরম বৈবাগ্যের পথে ঠেলিযাছিল তাহাদের দ্বন্দ্ব চলিল তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপিযা। ইহার পর তাহাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হইল হৈম ও তাহার স্বামী নির্মলের। সে তাহাদেব শান্ত, সুনির্মল জীবনযাত্রার ছবি দেখিতে পাইল, যে নারী তাহার মধ্যে এতদিন গভীর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল আজ হঠাৎ সাড়া পাইয়া সে জাগিয়া উঠিল এবং তাহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল সংসারের সুখদুঃখময সাধারণ পথে। "এতদিন জীবনটাকে সে যে ভাবে পাইযাছে, সেই ভাবেই গ্রহণ করিযাছে—ভাগ্যনির্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্য দিয়াই ষোডশীর জীবনের কুড়িটি বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহাকে ভৈরবীব জীবন বলিযাই সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে, একটা দিনের তরেও আপনার জীবন বলিয়া ভাবে নাই। চণ্ডীর সেবাইত বলিয়া সে নিকটে ও দূরের বহু গ্রাম ও জনপদের গণনাতীত নরনারীর সহিত সুপরিচিত। কত সংখ্যাতীত রমণী—কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহ বা সমবয়সী—তাহাদের কত প্রকারের সুখদুঃখ, কত প্রকারের আশাভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশকুসুমের সে নির্বাক, নির্বিকাব সাক্ষী হইয়া আছে—দেবীর অনুগ্রহ লাভের জন্য কতকাল ধরিয়া কত কথাই না ইহারা গোপনে মৃদুকণ্ঠে

তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, দুঃখী জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি অকপটে তাহার চক্ষের উপর মেলিয়া ধরিয়া প্রসাদ ভিক্ষা চাহিয়াছে—এই সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণী হৃদয়ের কোন্ অন্তঃস্থল ভেদিয়া এই সকল সকরুণ অভাব ও অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া তাহার কানে পশিয়াছে।·····নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সেই মনের মাঝখানে গৃহিণীপনার সমস্ত দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কার্য তাহারই মত করিতে পারে, এই কথাই তাহার মনে হইল।" তাহার স্বামীকে সে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার সন্ন্যাসিজীবনের অবসানও সেই সঙ্গেই হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বামী তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিত্যাগ করিয়া তাহার কাছে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছে, জীবানন্দের মুখে 'অলকা' ডাক তাহার সমস্ত অতীত জীবন বিমথিত করিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে। জীবানন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল; তাই সে ষোড়শীকে বলিয়াছিল, "তোমার জোর আমি জানি; পুলিশের দল থেকে মায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি পর্যন্ত একদিন তাহার নমুনা জেনে গেছেন। তোমার মা যে একদিন আমার হাতে তোমায় সঁপে দিয়ে গেছেন এ অস্বীকার করার মত সাধ্যি তোমার নেই।" হৈম ও নির্মলের মধুর দাম্পত্যজীবনের উল্লেখ করিয়া সে নিজেই বলিয়াছে, "এই যে চণ্ডীগড়ের পদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়াছিঁড়ির অভাব নাই, যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছাইয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্ছি সে শিক্ষা কোথায় পেয়েছি জানেন? সে ওইখানে। মেয়েমানুষের কাছে এযে কত বড় ফাঁকি সে ওদের দেখেই বুঝতে পেরেছি।" জীবানন্দের বিরুদ্ধে সে কৃষকদের উত্তেজিত করিয়াছে, কিন্তু জীবানন্দের ক্ষতি হইতে পারে এই কথা মনে পড়িলে তাহার সমস্ত মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এত করিয়াও জীবানন্দের স্ত্রী হইয়া সে সংসারে প্রবেশ করিতে পারে নাই, কারণ সে সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। যে প্রয়োজন অলকার ছিল, সে প্রয়োজন ষোড়শীর নাই, যে প্রবৃত্তি একবার উৎসাদিত হইয়াছে তাহা আর সঞ্জীবিত হইতে পারিবে না, যে যৌবন নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাকে ফিরাইবে কে? জীবানন্দ ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিয়াছিল, "সন্ন্যাসিনীর কি

সুখ দুঃখ নেই ? সে খুসী হয় পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই ?" ষোড়শী উত্তর করিল, "কিন্তু সে তো আপনাব হাতের মধ্যে নয়।" চণ্ডীগড় হইতে বিদায় লইবার সময়ও সে পুনবায় জীবানন্দকে বলিয়াছে, "আমি সন্ন্যাসিনী—পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব নেই—কিন্তু এর মধ্যে আমাকে তুমি জড়াতে চাইছ কেন ?" পরস্পববিবোধী দুই শক্তির দ্বন্দ্ব এমনি কবিযা ষোড়শীর জীবনটাকে ভরিযা বাখিযাছে। বাহিবেব ঘটনাব দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা একান্তভাবে ষোড়শীর হৃদয়ের জিনিষ। বাহির হইতে ইহার মীমাংসা কবার চেষ্টা যে কত ভ্রান্ত তাহাও শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন। ষোড়শীর মনেব কথা না বুঝিয়া নির্মল তাহাকে সাহায্য কবিতে আসিয়াছিল এবং সে চেষ্টা আপনা হইতেই ধূলিসাৎ হইযা গেল। ব্যাবিষ্টার সাহেবের এই অর্থহীন অনাবশ্যক চেষ্টা এই কাহিনীব একমাত্র কমেডি। জনার্দন রায়, শিরোমণি-মহাশয প্রভৃতি অনেক চেষ্টা কবিলেন তাহাকে তাড়াইবাব জন্য। হৈ চৈ হইল খুব, কিন্তু ষোড়শীর প্রকৃত পরাজয় হইল তাহার নিজের কাছে। তাহাদেব সমস্ত চেষ্টা শুধু একটা বিবাট তামাসায় পরিণত হইয়া গেল। ষোড়শীর জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা আসিল তাহার নিজের হৃদয় হইতে, যেখানে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল সংসাবোন্মুখ রমণীর আকাজ্ক্ষা ও সন্ন্যাসিনীর বৈরাগ্যের মধ্যে। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি একত্র সম্মিলিত হইযা জীবানন্দকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল, আব এই দুই শক্তিই পুনরায সম্মিলিত হইলে জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধবিযা নূতন অভিযানে অগ্রসব হইল।/

শবৎচন্দ্রের অধিকাংশ প্রণয়-কাহিনীব মূলে রহিযাছে একটা ব্যর্থতা, প্রেমেব অপবিতৃপ্তি। সৌদামিনী তাহাব স্বামীব পাযে আশ্রয় পাইয়াছিল, কুসুম বৃন্দাবনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, ষোড়শীর হাত ধবিয়া জীবানন্দ তাহাব নূতন জীবন আরম্ভ কবিয়াছিল, কিন্তু এই সব মিলনে পরিপূর্ণ আনন্দ নাই। যাহাকে happy ending বা সুখের মিলন বলা হয় তাহা দেখিতে পাই শুধু 'দত্তা', 'চন্দ্রনাথ', 'নববিধান' ও 'পরিণীতা'র উপসংহাবে। এই উপন্যাসগুলি তাঁহার অন্যান্য রচনা অপেক্ষা একটু পৃথক্। 'পরিণীতা'র কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইবাব 'দত্তা'র আলোচনা কবিতে হইবে। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু 'দত্তা'র উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রায সবই একমত। ইহা আনন্দ দিয়াছে প্রায় সর্বশ্রেণীব পাঠককে। 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি উপন্যাসের আখ্যায়িকার সঙ্গে ইহার গল্পাংশের সাদৃশ্য নাই, কিন্তু ইহার নায়িকার মনেও সেই একই প্রকারের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, যদিও এখানকার

দ্বন্দ্বে সামাজিক নীতির প্রশ্ন নাই। বিজয়া নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসে এবং সেই ভালবাসা দিয়া নরেন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া ফেলিতে চাহে। কিন্তু নানা কারণে কিছুতেই সে ইহা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে পারে না। মাঝখানে রহিয়াছে বহু বাধা। একে তো বিশ্বভোলা নরেন্দ্রনাথ কিছু বুঝে না। তারপর আরও অনেক গোলযোগ আসিয়াছে বাহির হইতে। রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর নীচ চরিত্রকে সে নিরতিশয় ঘৃণা করে। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে বাসবিহারী হইয়াছে তাহার অভিভাবক আর বিলাসবিহারী হইবে তাহার স্বামী। ইহাদের কথায় পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে নরেন্দ্রনাথকে গৃহহীন করিয়াছে। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিছক বাহিরের শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে দ্বন্দ্ব—ইহার চিত্র শরৎচন্দ্র কোথাও আঁকেন নাই। তাঁহার উপন্যাসে বাহিরের শক্তি রূপ লইয়াছে মানবমনে। তাই 'দত্তা'য় বাহিরের শক্তির তাড়না খুব গৌণ, মুখ্য জিনিষ হইতেছে বিজয়াব মনের দ্বন্দ্ব। সে নরেন্দ্রনাথকে বুঝাইতে চাহে সে, সে যে দেনার দায়ে সম্পত্তি গ্রহণ করিযাছে তাহা অন্য এক দাযে পড়িয়া। সে মাইক্রস্কোপ কিনিতে চাহিযাছে, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া এই কথাই সে বলিতে চাহিয়াছে যে যদিও মাইক্রস্কোপেব প্রযোজন তাহার নাই, সে ইহা মারফতে নরেন্দ্রনাথেব কাজে আসিয়া নিজেকে সার্থক করিযা লইতে চাহে। সে যে নিজে না খাইযা নবেন্দ্রকে খাওযাইতে ভালবাসে ইহা ভদ্রতাও নয়, সাধাবণ মেয়েমানুষের আচবণও নয়, নরেন্দ্রনাথের পরিতৃপ্ত আহাবের মধ্যেই তাহার জীবনের চরম চরিতার্থতা। একবার সে পরের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথকে চিনিতে পাবে নাই, নরেন্দ্রনাথ এই অবহেলার কারণ বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু সে এই কথাই বলিতে চাহিযাছে যে ইহা অবজ্ঞা নহে, ইহা অবহেলা নহে, বরং নরেন্দ্র তাহাকে অবহেলা করিয়া অন্য রমণীতে আসক্ত হইতেছে, ইহা শুধু তাহারই বিরুদ্ধে দর্পিতা অনাদৃতার অভিযোগ। নরেন্দ্রনাথ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিল, "সত্যিই যদি এই অসঙ্গত খেয়াল তোমার হয়েছিল, শুধু একবার হুকুম করনি কেন?"—কিন্তু ইহাই তো নারী জীবনের চরম প্রশ্ন ও শ্রেষ্ঠ মাধুর্য। হৃদয়ের গোপন প্রদেশে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তাহাকে সে কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারে না, পৃথিবীর সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত লজ্জা তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। বিজয়ার হৃদয়াকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব চলিযাছে তাহার ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে নয়, তাহার নারীজনোচিত সরম, সঙ্কোচ ও দর্পের সঙ্গে। ইহাতে শক্তির অপচয় নাই—বাহিরের ও অন্তরের সমস্ত বাধা পরাজিত করিয়াছে বলিয়াই এই মিলন অপূর্ব মাধুর্যরসে ভরিয়া উঠিয়াছে।

'চন্দ্রনাথ', 'দত্তা' ও 'পরিণীতা' হইতে অনেকাংশে পৃথক্। প্রথমতঃ এখানে চন্দ্রনাথ ও সরযূর মধ্যে মিলনের যে বাধা তাহা সম্পূর্ণভাবে বাহিরেরই বাধা; তাহার সঙ্গে ইহাদের হৃদয়ের প্রবৃত্তি জড়াইয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে সরযূর মাতা সত্যসত্যই কুলত্যাগিনী, কোন মিথ্যা অপবাদের দ্বারা লাঞ্ছিতা নহে। মা কুলত্যাগিনী হইলেও কন্যা নিষ্পাপ, সে জারজ সন্তানও নহে। তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা এই প্রশ্ন স্বতঃই উঠিতে পাবে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন নাই; তাহার যথাযথ বর্ণনাও দেন নাই। দেখা গেল যে চন্দ্রনাথ ও তাহার খুল্লতাত মণিশঙ্কর ইচ্ছা করিলেই সমাজকে নিযন্ত্রিত করিতে পারেন।

'চন্দ্রনাথ' সুখপাঠ্য গল্প, কিন্তু ইহার মূল কাহিনীতে শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ নাই। ইহার প্রধান ত্রুটি চন্দ্রনাথের চরিত্র। চন্দ্রনাথ কোথাও স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। একদিন সমাজের ভয়ে সরযূকে পরিত্যাগ করিল আবার আর একদিন সরযূর দুরাকর্ষণ মোহমন্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া কাশীতে যাইয়া তাহাকে গ্রহণ করিল। সাহিত্যের নায়ককে সব সময়ই বলিষ্ঠচরিত্রসম্পন্ন হইতে হইবে এমন কথা বলা যায় না, দুর্বলস্বভাব মানুষের চরিত্রও সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার দুর্বলতাকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতে হইবে। 'চন্দ্রনাথ' গল্পে শরৎচন্দ্র যেন কাহিনীর সূত্রযোজনা করিতেই ব্যস্ত ছিলেন কাজেই অধিকাংশ চরিত্রই অর্ধস্ফুট হইয়াছে। এমন কি হরকালীও সমগোত্রীয় অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় নিষ্প্রভ। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আখ্যায়িকা-প্রধান উপন্যাসে চরিত্রের আপেক্ষিক নিষ্প্রভতা দোষাবহ নহে। কিন্তু এই আখ্যায়িকা সুখপাঠ্য হইলেও ইহার মধ্যে তেমন বৈশিষ্ট্য নাই। চন্দ্রনাথের বিবাহ ও সরযূর প্রতি অনতিক্রম্য আকর্ষণ—ইহার কোনটিই সাধারণ ব্যাপার নয়, কিন্তু কোনটির মধ্যেই অসাধারণত্বের ছাপও নাই।

এই গ্রন্থকে উপাদেয় করিয়াছে—কৈলাস খুড়ো ও সরযূ। কৈলাস খুড়ো বাতিকগ্রস্তলোক কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততাও অনন্যসাধারণ। প্রিয়নাথ ডাক্তারের হোমিওপ্যাথিতে যে বৈচিত্র্য আছে কৈলাস খুড়োর দাবাপ্রীতিতে তাহা নাই, কিন্তু তবু স্বল্পপরিসরের মধ্যে তাঁহার চরিত্রে ও জীবনে মধুর, করুণ ও হাস্যরসের অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে। সরযূর চরিত্রের পরিণতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যখন সে সৌভাগ্যের শিখরে সমাসীন, তখন সব সময়ই নিজেকে অপরাধী মনে করিয়াছে, কখনও কিছু দাবী করে নাই, সে ভাল করিয়া স্বামীর সঙ্গে কথা বলিতে বা তাহার দিকে তাকাইতেও পারে নাই, নিজের সংসারে

দাসীর অধিক অধিকার প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু যে দিন তাহার মাতার কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হইয়া গেল, যেদিন মিথ্যার আররণ অপসারিত হইয়া গেল, এবং তাসের ঘরের মত তাহার সৌভাগ্য-সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সেই দিন সত্যের উন্মুক্ত আলোতে তাহার সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত ভীরুতা কাটিয়া গেল। তাহার চরিত্রের এই পরিণতি ও পরিবর্তন তাহার প্রত্যেক কথা ও কাজে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং সাহিত্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার ভাগ্য-পরিবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য।

'নব-বিধান' মিলনের কাহিনী, প্রেমের নয়। শরৎচন্দ্র বহু উপন্যাসে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা, ইহার প্রীতিহীনতা ও ক্ষমাহীনতার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও ধর্মনিষ্ঠা যে তেজ ও মানসিক শক্তি সঞ্চার করে তাহার চিত্রও আঁকিয়াছেন—এই দিক্ দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বিপ্রদাস' ও 'নব-বিধান'। অবশ্য ধর্মনিষ্ঠার মাহাত্ম্য প্রচার করা এই উপন্যাস দুইখানির উদ্দেশ্য নয়। হয়তো পরিবেশের বৈচিত্র্য রচনা করার জন্যই তিনি এই ধরণের কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন। 'নব-বিধান'-উপন্যাসে খানিকটা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা আছে, কিন্তু এই কাহিনী রসোত্তীর্ণ হয় নাই। শৈলেশের পিতা উষাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, পুত্রকে আর একবার বিবাহ দিয়াছিলেন, শৈলেশ নিজে উষার কোন খোঁজখবর করে নাই। অবশেষে দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর শৈলেশ তাহাকে আনিল বটে, কিন্তু খুব তুচ্ছ কারণে সে আবার চলিয়া গেল। শৈলেশ তাহাকে ফিরাইতে চাহে নাই, বরং কটূক্তিই করিয়াছে, শৈলেশের ভগিনী বিভা তাহাব সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, বিভার স্বামী ক্ষেত্রমোহন তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্, কিন্তু সেও তাহাকে ধরিষা রাখিতে চেষ্টা করে নাই, বরং শৈলেশের পুনরায দারপরিগ্রহের বন্দোবস্ত করিয়াছে। উষা এই সকল দুর্বলচিত্ত ও সঙ্কীর্ণমনা মানুষদের অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক উর্দ্ধে। ইহাবা তাহাকে যখনই আঘাত করিযাছে তখনই ছোট হইযা গিযাছে, সে অতি সহজে সর্বত্র আপন ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্বের ছাপ অঙ্কিত করিয়াছে; যখন প্রতিকূল অবস্থা আযত্তাধীনে আসিয়াছে তখন অনায়াসে অতি নগণ্য কারণে সব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবাব সঙ্কট মুহূর্তে সংসারের হাল ধরিতে অবতীর্ণ হইযাছে। এই জাতীয কাহিনী খানিকটা চমক লাগায়, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে ইহারা সার্থকতা লাভ কবিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ গল্প বা নাটক আপনার জগৎ রচনা করিবে এবং সেইখানে প্রত্যেক চরিত্র আপন পরিণতির দিকে অনিবার্য বেগে অগ্রসর হইবে। উষার জীবনে যে সব নরনারীর অভ্যাগম

হইয়াছে তাহাদেব কোন ব্যক্তিত্ব নাই , তাহাবা উষাব শক্তি ও নৈপুণ্য প্রকাশ কবিবাব উপায় মাত্র। উষাও যেন ঐন্দ্রজালিক , তাহার ক্ষোভ নাই, কামনা নাই, মায়া নাই, শুধু সে যে কত উর্ধ্বে বিচবণ কবিতেছে, কত সহজে সকল গোলমাল, সকল অভাব অভিযোগ মিটাইতে পাবে তাহা দেখাইয়াই শান্ত। যে কাবণে সে স্বামি-গৃহ ত্যাগ কবিয়া গিযাছিল তাহা অন্য নাবীতে সম্ভব কিনা সেই প্রশ্ন হযতো অবাস্তব। হয়তো প্রত্যেক মনুষ্য চবিত্রই অনন্য। কিন্তু যাহাব বিচাববুদ্ধি এত প্রখব, যাহাব দৃষ্টি এত সুদূবপ্রসাবী, যাহাব স্থৈয এত অমেয সে কেমন কবিয়া শৈলেশেব মুখেব কথাকেই চবম বলিযা গ্রহণ কবিল, তাহার অন্তবেব কথা বুঝিতে পাবিল না ? সে কি শৈলেশেব চবম দুর্গতিব প্রতীক্ষায়ই পিত্রালয়ে গিয়াছিল যাহাতে ফিবিযা আসিযা আবাব স্বীয় প্রাধান্যেব পবিচয় দিয়া সবাইকে (এবাব বিভাকে পযন্ত) অভিভূত কবিতে পাবে ? এই সমস্ত প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইবে, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে ইহাদেব সদুত্তবেব সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শরৎ-সাহিত্যে নারী

জননীর স্নেহ

শবৎচন্দ্র অনেক প্রণযেব কাহিনী লিপিবদ্ধ কবিযাছেন। সেই সব চিত্রেব কথা পূর্বে উল্লেখ কবা হইযাছে, কিন্তু ইহা ছাডা পাবিবাবিক জীবনেব সুখ দুঃখেব কথাও তিনি লিখিযাছেন। যে সব ক্রূব, কৌশলী ধর্মধ্বজী ব্যক্তিবা সামাজিক ও পাবিবাবিক জীবন বিষে ভবিয়া দেয তাহাদেব চিত্র তিনি নিপুণভাবে আঁকিযাছেন। বেণী ঘোষাল, বাসবিহাবী, জনার্দন বায, স্বর্ণমঞ্জবী, দিগম্ববী, নযনতাবা—এমনি কত নিষ্ঠুব, কপট, নির্মম চবিত্র তিনি সৃষ্টি কবিযাছেন। কিন্তু ইহাবই পাশে তিনি আব এক শ্রেণীব নবনাবীব সৃষ্টি কবিযাছেন যাহাদেব স্নেহ-মমতাব কল্যাণবশ্মিসম্পাতে সংসাব উজ্জ্বল হইযা উঠিযাছে। দিগম্ববী নীচমনা, স্বার্থানুসন্ধিৎসু, তাহাব মধ্যে স্নেহ-মমতাব লেশ মাত্র নাই, কিন্তু তাহাব কন্যা নাবায়ণীব হৃদয়ে অফুবন্ত স্নেহ। জনার্দন বায় বিষয়ী জমিদাব, শিবোমণি মহাশয় ততোধিক বিষযী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইহাদেব সঙ্গে চণ্ডীগডে আব একটি লোক বাস কবিতেন যিনি জনার্দনেব মত অর্থ-গৌবব কবিতে পারেন না

আবার শিরোমণির মত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও নহেন। তিনি একজন মুসলমান ফকির। তাঁহার মন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, স্নেহ ও করুণায় ভরপুর। রাসবিহারী কপট কূটবুদ্ধির প্রতিমূর্তি, দয়ালের তত বুদ্ধি নাই কিন্তু হৃদয় আছে। পল্লী-সমাজের সমস্ত আবর্জনার কেন্দ্র হইতেছে বেণী ঘোষাল, আবার তাহার সমস্ত মাধুর্যের সুধাপাত্র হাতে করিয়া আছেন তাহার জননী বিশ্বেশ্বরী।

শরৎচন্দ্র রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়াছেন, কিন্তু ইহার সঙ্গে তিনি নারীহৃদয়ের বাৎসল্যের বহু চিত্র আঁকিয়াছেন; সেইখানেও তাঁহার বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বাৎসল্যরসের সহজ সাধারণ চিত্র বেশী আঁকেন নাই, জননীর যে স্নেহ বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উৎসারিত হইয়াছে তিনি তাহাকেই ভাষা দিয়াছেন। একটা জিনিষ প্রায়ই দেখা যায়; তাহা হইতেছে এই যে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ চিত্রে মাতৃস্নেহ ক্ষরিত হইয়াছে স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের জন্য ততটা নয় যতটা ঈষৎ দূরসম্পর্কিত সন্তানস্থানীয় আত্মীয়ের জন্য। নারায়ণী তাহার পুত্র গোবিন্দকে ভালবাসিত না এমন নহে, কিন্তু তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে তাহার কাছে গোবিন্দ ও রামের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বেণী, রমেশ ও রমার মধ্যে দলাদলির অভাব ছিল না, কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর হৃদয়ে তাহারা সবাই নির্বিরোধে স্থান পাইয়াছিল। কুসুম চরণের মা, কিন্তু জননী নহে। বিন্দু ছিল অমূল্যের ছোট মা বা কাকীমা। গোকুল ভবানীর সপত্নীপুত্র, কিন্তু বিমাতা ও সপত্নীপুত্রের মধ্যে স্নেহবন্ধন ছিল এমনি সুদৃঢ় যে নিমাই রায়ের সুবুদ্ধি ও গোকুলের দুর্বুদ্ধি মিলিয়াও তাহাকে শিথিল করিতে পারে নাই। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর মাতৃস্নেহ বর্ষিত হইয়াছে তাহার নিষ্ঠুর বড়জায়ের হতভাগ্য ভ্রাতা কেষ্টর উপরে।

প্রণয়চিত্রের মত এখানে শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে সেই চিত্রেই যেখানে বাধা আসিয়াছে অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি হইতে। যেখানে বাহিরের শক্তি মাতৃস্নেহকে বাধা দিয়াছে সেইখানে মিথ্যাসংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে একটা মিথ্যা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে। অমূল্যধনকে বিন্দুও যেমন ভালবাসিত অন্নপূর্ণাও তেমনি ভালবাসিতেন। বিন্দু জানিত তাহার ভাসুর দেবতুল্য লোক আর বড় গিন্নীর সঙ্গে সে যতই ঝগড়া করুক না কেন তাঁহার উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। ইহাদের আর্থিক অবস্থা পূর্বে যাহাই থাক, আখ্যায়িকা যে সময়ে আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতে অসচ্ছলতার কোন চিহ্ন দেখা যায়না। কাজেই প্রকৃত কলহ, মনোমালিন্যের কোন অবকাশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। একটা মিথ্যা সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল অমূল্যধনের শিক্ষা লইয়া, সে ভবিষ্যতে

কিরূপে দশজনের একজন হইবে ইহার বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে। অমূল্যধনের শিক্ষা ব্যাপারে অন্নপূর্ণা উদাসীন হইতে পারেন না। অথচ তিনি ছেলের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছেন এই অদ্ভুত অভিযোগ লইয়া বিন্দু এক ভীষণ ঝগড়া বাধাইয়া দিল। বিন্দু অতিশয় অভিমানিনী, কাজেই ক্রুদ্ধ হইলে তাহার আচরণ যে স্বাভাবিকের সীমা ছাড়াইয়া যাইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যে সামান্য কারণ লইয়া বিন্দু ও অন্নপূর্ণার বিচ্ছেদ ঘটিল তাহা এতই অকিঞ্চিৎকর যে ইহা বিন্দুর পক্ষেও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আর যাহাই হউক, বিন্দু বোকা ছিল না, কাজেই অমূল্যধনের মা ও তাহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভাসুরকে সে অপমান করিবে ইহা একেবারেই অসম্ভব। এই আখ্যায়িকায় প্রকৃত কলহবিচ্ছেদের অবকাশ নাই—তাই বিন্দুর মাতৃস্নেহ যে বাধা অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা একেবারে অলীক ও ভিত্তিহীন।

জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরী রমা ও রমেশের প্রতি যে স্নেহ পোষণ করিতেন তাহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বেণী ছিল তাহার একমাত্র পুত্র, আর তাহার জন্য তাঁহার চিত্ত থাকিত সর্বদা শঙ্কিত। রমেশ পাছে বেণীকে অসম্মান করিয়া নিমন্ত্রণ না করে, সমাজপতি হিসাবে তাহার যোগ্য আসন না দেয়, এই ভয় করিয়া তিনি রমেশকে অনুরোধ করিলেন বেণী প্রভৃতিকে বলিয়া পিতৃ-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে। রমেশ ইহাতে অসম্মতি জানাইলে তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু এটাও ত তোমার জানা উচিত ছিল রমেশ, যে আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না।" রমার মাসী তাহার বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে অজস্র কটূক্তি করিয়া গেল, তিনি তাহার প্রতি উত্তর করিলেন না, পাছে এই স্ত্রীলোকটির মুখ দিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার নিজের ছেলের কলঙ্কের কথাই বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার অফুরন্ত স্নেহ ছিল রমা ও রমেশের জন্য। রমেশের সঙ্গে বেণীর ছিল চিরন্তন শত্রুতা আর রমার সঙ্গেও তাহার প্রকৃত সৌহার্দ্য ছিল না। কাজেই বেণীর মা হিসাবে বিশ্বেশ্বরীর রমা ও রমেশের সঙ্গে স্বার্থের সংস্রব তো ছিলই না বরং বিরুদ্ধতা ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন পল্লী সমাজের সমস্ত হীনতা ও সঙ্কীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে। তাই রমেশকে তিনি সাহায্য করিতে পারিবেন না বলিয়াও রমেশের সমস্ত কায তিনি নিজে করাইয়াছেন, রমার তিনি শুধু মায়ের মতো ছিলেন না, তিনিই ছিলেন তাহার যথার্থ মা। রমেশের উচ্চ আদর্শের মর্যাদা তিনি বুঝিতেন, রমার হৃদয়ের বেদনাও তিনি উপলব্ধি করিতেন। কিন্তু এই চিত্রের একটি প্রধান দোষ আছে,—বিশ্বেশ্বরীর মধ্যে

মনুষ্যজনোচিত দুর্বলতা নাই। একবার মাত্র তিনি রমেশকে স্মরণ করাইয়াছিলেন যে তিনি বেণীর মাতা এবং সন্তানের বিরুদ্ধাচরণ তিনি করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার কোন আচরণের মধ্যে সাংসারিক সঙ্কীর্ণতার লেশ মাত্র পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার মনের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছে এমন আভাসও কোথাও নাই। আদর্শ রমণীর পক্ষে যাহা সকল দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় তাহা যেন তিনি অতি স্বচ্ছন্দে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অশরীরী দেবতা বলিয়া মনে হয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের দুর্বলতার তিনি অতীত। শরৎচন্দ্র প্রায় কখনও আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করেন না—কোন শ্রেষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকই করেন না। কারণ মানুষের জীবনের ধর্মই হইতেছে ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি; ইহাকে বাদ দিয়া কোন শ্রেষ্ঠ বাস্তব চিত্রই আঁকা যায় না। শরৎচন্দ্রের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি রমণীহৃদয়ের দুর্বলতাকে অফুরন্ত সহানুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শুধু বিশ্বেশ্বরীর চিত্তে কোন দুর্বলতার আভাসমাত্র নাই। তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের প্রতিমূর্তি, তাঁহার কাছে আমরা শ্রদ্ধায় নতশির হই, কিন্তু তেমন মমতা বোধ করি না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয় যে ইনি পৃথিবীর অনেক ঊর্ধ্বে, কোন কল্পলোকের অধিবাসিনী, ধরণীর ধূলি ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

'অরক্ষণীয়া'য় জ্ঞানদার খুড়িমা মানুষটি ছিল খুব সাধারণ রকমের। বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না—সে কাজ করিতে ভালবাসিত না, নভেল পড়িয়া, গল্প করিয়া তাহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। তাহারই সম্মুখে তাহার হতভাগ্য জা ও তাহার মেয়ের উপরে যে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা ও অপমান প্রতিদিন বর্ষিত হইত তাহার বিরুদ্ধে সে একটুও আপত্তি জানায় নাই, তাহাদের সুখ-সুবিধার জন্য সে বিন্দুমাত্র ক্লেশ স্বীকার করে নাই। তাহার চরিত্রে মহত্ত্বের লেশ মাত্র নাই। কিন্তু এই কর্মকুণ্ঠ, স্বার্থত্যাগে অক্ষম, অলস রমণী একেবারে হৃদয়হীন ছিল না। তাহার ভাবী জামাতা অতুল নিঃসহায় জ্ঞানদা ও তাহার মার উপর যে নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল সে-ই। জ্ঞানদার করুণ প্রেমভিক্ষাকে ব্যঙ্গ করিয়া অতুল বলিয়া উঠিল, "শুনলেন ছোটমাসীমা কাণ্ডটা? কি ভয়ানক লজ্জা?" স্বর্ণমঞ্জরী খন্ খন্ করিয়া বলিলেন, "এক ফোঁটা মেয়ে। এ যে ঘোর কলি।" এই দুই পাষণ্ডের নির্লজ্জ পরিহাসকে বিদ্রূপ করিয়া ছোট বৌ কহিল, "ঘোর কলি বলেই বাঁচোয়া দিদি। নইলে আর কোন কাল হলে মা বসুন্ধরা এতক্ষণ লজ্জায় দু'ফাঁক হয়ে যেতেন, অতুল।" স্বর্ণমঞ্জরী হতভাগ্য অনূঢ়া জ্ঞানদাকে লজ্জিত

অপমানিত করিলে জোর করিয়া মুখোমুখি প্রতিবাদ করিবার মত সৎসাহস তাহার ছিল না, কিন্তু গোপনে সে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে।

জ্ঞানদার মামী পোড়া কাঠের চেহারা বিকট আবার ততোধিক বিকট তাহার মুখের হাসি। কোনরূপ শিক্ষা ও সভ্যতার বালাই তাহার নাই। কলহ-যুদ্ধে তাহার নৈপুণ্য অসাধারণ—কোন রূঢ় কথা তাহার মুখে বাধে না। কিন্তু তাহার বিকট দেহেব অন্তরালে স্নেহের ফল্গুধারা সতত প্রবাহিত হইত। তাহার কপট, নীচাশয় স্বামীর আচরণের সে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে, অসহায় বিধবা ও তাহার ততোধিক অসহায় কন্যাকে সে লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইবাব চেষ্টা করিয়াছে। সে জ্ঞানদার বাবুগিরির তিরস্কার করিয়াছে, কিন্তু তাহাব একমাত্র অলঙ্কার বাঁধা দিয়াছে ঐ উপায়হীন মেয়েটির চিকিৎসার জন্য। তাহার হাসি বিকট, কিন্তু তাহার অন্তরালে দুই এক ফোঁটা অশ্রুও জমান ছিল যাহা শুভ্র, মধুর ও পবিত্র।

বিশ্বেশ্বরীকে সংগ্রাম করিতে হইত তাঁহার পুত্র বেণী ঘোষালের নীচতার সঙ্গে। কিন্তু তিনি ছিলেন এম্‌নি মহৎ যে বেণীর ঘৃণিত স্বভাব তাঁহার পক্ষে বিশেষ কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। নারায়ণীর সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। তাহার নিজের মা তাহাকে স্বার্থসিদ্ধির পথে অনুক্ষণ ঠেলিতেছিল; তাহার পর, তাহার স্বামী শ্যামলালও বুদ্ধিমান বিষয়ী লোক। বৈমাত্র ভাইযের প্রতি অবিচাব না করুন, গাযে পড়িয়া অতিরিক্ত সুবিচার করিবার ইচ্ছা আদৌ তাঁহার ছিল না। এদিকে রাম নিজে এমনি লক্ষ্মীছাড়া ছেলে যে সর্বতোভাবে তাহাব পক্ষ গ্রহণ করাও মুস্কিল। কিন্তু নারায়ণীর স্নেহ এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উপচিয়া পড়িত। রামের সমস্ত দুষ্কৃতিকে সে স্নেহের আববণ দিয়া ঘিরিয়া বাখিয়াছিল, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়া সে বারংবার অনুশোচনা করিয়াছে, তাহার নিজের জননীর নির্মমতা হইতে সে তাহার শিশু দেবরকে বাঁচাইয়া রাখিযাছে। কিন্তু অবশেষে রাম তাহাকেই আঘাত করিযা শয্যাশায়ী কবিয়া রাখিলে, অবকাশ পাইয়া শ্যামলাল ও দিগম্বরী রামকে পৃথক করিয়া দিল। রামের আহার হয নাই জানিযা রোগশয্যায় নারায়ণী তাহার নিজের পথ্য মুখে দিতে পারে নাই এবং শেষে নিজে রান্না করিয়া রামকে খাওয়াইয়া সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ মিটাইযা লইয়াছে।

বিশ্বেশ্বরী, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতির সমস্ত বাধাই আসিয়াছিল বাহির হইতে। শ্যামলাল ও দিগম্বরীর স্বার্থবুদ্ধি ছিল প্রচুর, নারায়ণীকে তাহার ফলভোগও করিতে হইয়াছে, কিন্তু নারায়ণীর মনে তাহার স্পর্শ লাগে নাই।

বেণীর চরিত্রের নীচতা হইতে বিশ্বেশ্বরী ছিলেন একেবারে মুক্ত। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর পক্ষে সে কথা খাটে না। যদিও তাঁহার স্বার্থান্বেষণের প্রেরণা আসিয়াছিল বাহির হইতে—নয়নতারার মন্ত্রণা হইতে—তবু তাঁহার নিজের মনও সন্দেহে বিচলিত হইয়াছিল। "সিদ্ধেশ্বরীর স্বভাবে একটা মারাত্মক দোষ ছিল—তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। আজকার দৃঢ় নির্ভরতা কাল সামান্য কারণেই হয়ত শিথিল হইতে পারিত।" যে শৈলরে তিনি মানুষ করিয়াছেন, যাহার বুদ্ধি, বিচার ও সততার উপরে তিনি সমস্ত জীবন নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ সন্দেহ হইল সেই শৈলই টাকা পয়সা আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে ঠকাইয়াছে। তাই শৈলকে তিনি কটুকথা বলিতে লাগিলেন, আর শৈলও অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরীর মেরুদণ্ড ছিল না বটে, কিন্তু হৃদয় ছিল। স্বার্থবুদ্ধির অন্তরাল ভেদ করিয়া মাতৃস্নেহের নির্ঝর উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। কানাই, পটল, তাহাদের মা শৈল—ইহাদের সবারই জন্য তাঁহার অখণ্ড মমতা ছিল এবং সেই মমতা নিজের ক্ষণিক দুর্বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া উৎসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্বে যাহাদের কথা আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী বর্ষীয়সী জ্যাঠাইমা, বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী, "পোড়াকাঠ" ইহারা সবাই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বৌ, সংসারের সাধারণ পথের যাত্রী। কুসুম আর রাজলক্ষ্মীর কথা ভিন্ন—ইহাদের জীবনযাত্রার গতি অনন্যসাধারণ। আর ইহাদের বাৎসল্যবৃত্তি বিচিত্র উপায়ে ইহাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কুসুম তাহার স্বামী বৃন্দাবনের সংস্রব হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়াছে, বৃন্দাবন সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়াও তাহাকে হাত করিতে পারে নাই। এমনি সময় বৃন্দাবন একদিন চরণকে লইয়া উপস্থিত হইল আর কুসুমের মনে এক বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বহিয়া গেল। যে সন্তান তাহার জন্মে নাই তাহার জন্য তাহার জননীহৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। "এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহার হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এত বড় অধিকার সংসারে কাহার আছে? চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল, ততই তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার নিজের ধন জোর করিয়া অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।" সে রমণীসুলভ প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু জননীর সন্তানতৃষাকে রোধ করিবে কি করিয়া? আবার এই উভয় আকাঙ্ক্ষার

লক্ষ্য এক দিকেই। অজাত সন্তানের জন্য যে স্নেহ তাহাকে অসহ্য পীড়া দিতেছিল তাহাই দুর্বার বেগে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল সেই স্বামীর কাছে, যাহাকে সে এতদিন অতিকষ্টে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। কোন কোন দার্শনিক সন্তানলিপ্সা ও যৌনপ্রবৃত্তি বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র মৌলিক বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মনুষ্যহৃদয়ে বিশেষতঃ রমণীহৃদয়ে এই দুইটি বৃত্তি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। প্রেমের পরিণতি সন্তানকামনায়, আর সন্তানকামনার মূল হইতেছে যৌনমিলনে। কুসুমের মনে এই দুই বৃত্তি একত্র জাগিয়া উঠিয়া তাহার শিক্ষা ও অভিমানের গায়ে আঘাত করিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ইহাদের সম্মিলন ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের গোড়ার কথা। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের প্রেমের পরিণতি হইয়াছিল সর্বদমনের জন্মে, প্রত্যাখ্যানের ব্যর্থতা এই পরিপূর্ণতার কাছে গৌণ। মদনভস্ম আর পার্বতীর কঠোর তপস্যা--ইহার লক্ষ্য ছিল কুমারসম্ভব।

রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের প্রেমের মধ্যে একটা প্রধান অন্তরায় ছিল এই যে তাহাতে কুমারসম্ভবের সম্ভাবনা ছিল না। রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ে একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা ছিল জননী হইবার জন্য। সেই অপরিতৃপ্তির দৈন্যের কাছে তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য অর্থহীন, তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ। সে নিজেই বলিয়াছিল, যে, বঙ্কুর বাবার সঙ্গে বিবাহের ফলে যদি সে সন্তানের জননী হইত, তাহা হইলে সে তাহাদের ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইত, তবু তাহা বাইউলি হওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল হইত। হৈমর দাম্পত্যজীবন দেখিয়া ষোড়শী বুঝিয়াছিল যে ভৈরবী জীবনের ত্যাগ নারীর পক্ষে কত মিথ্যা। রাজলক্ষ্মী অভয়ার পরিপূর্ণ প্রেমের কথা শুনিয়া তাহার নিজের ঐশ্বর্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং সংযমের দৈন্য উপলব্ধি করিয়াছে। সে প্রথম মনে করিয়াছিল যে শ্রীকান্তের সেবা করিয়া, তাহার সঙ্গলাভ করিয়াই তাহার জীবন সার্থক হইবে। ক্রমে সে দেখিতে পাইল যে শ্রীকান্তের জন্য তাহার যে প্রেম তাহাকে সন্তানলিপ্সা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। শ্রীকান্ত তাহার জন্য সব ত্যাগ করিলেও সম্ভ্রম ছাড়িতে পারিবে না আর তাহাকেও বাধা দিবে তাহার সম্ভ্রম, সংস্কার ও ধর্মবুদ্ধি। এ-প্রেম মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি নাই, পরিণতি নাই। অথচ আকাঙ্ক্ষার তো নিবৃত্তি নাই; তাই সমস্যারও নিরাকরণ হইতে পারে না। শ্রীকান্তের মন এ-কথা চিন্তা করিয়া কণ্টকিত হইয়াছে, "আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার

বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এখন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন পাটনায় তাহার যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মাতৃরূপ স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলই মনে হইতে লাগিল, ততবড় আগুন ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বঙ্কুই তাহার কাছে পর্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখদুঃখই তাহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছে।" ইহার অপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন নাই, ইহাব চেযে বড় ট্র্যাজেডিও নাই। পরিপূর্ণ সম্ভোগের উপাদান হাতের কাছে আছে, কিন্তু তাহা উপভোগ করিবার সামর্থ্য নাই; জননীর ক্ষুধা আছে, কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তির আশা নাই। শকুন্তলা ও পার্বতীর জীবন যেমন সফল প্রেমের চবম আদর্শ, রাজলক্ষ্মীও তেমনি রমণীজীবনের ব্যর্থতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

এই পর্যন্ত মাতৃস্নেহেব যে সমস্ত আখ্যানের কথা আলোচিত হইল তাহাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রায়শঃ মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত হইয়াছে নিঃসন্তান রমণীর মধ্যে অথবা যাহার জন্য এই স্নেহরস ক্ষরিত হইয়াছে সে সন্তানস্থানীয় হইলেও সন্তান নহে। মাতার নিজের সন্তানের জন্য স্নেহের যে-সব চিত্র আছে তন্মধ্যে দুর্গামণি-জ্ঞানদার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়িবে। নানারূপ উৎপীড়নে মাতৃস্নেহ কিরূপ বিষাক্ত হইযা পড়ে, এই আখ্যায়িকায় তাহার তীব্র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞানদা ছিল দুর্গামণির একমাত্র সম্বল, দুঃখের সংসারে আশা ও আনন্দেব উৎস। কিন্তু হিন্দুসমাজে অনূঢ়া কন্যা অসহায় মাতার উপর এমন নিদারুণ বোঝা যে অপত্যস্নেহের সমস্ত মাধুর্য বিনষ্ট হইয়া যায়। দুর্গামণিব দারিদ্র্য, সমাজের কলঙ্কভীতি, পরলোকে শাস্তিব আকাঙ্ক্ষা— সমস্তই জ্ঞানদার সঙ্গে তাঁহাব সম্পর্ককে তিক্ত করিয়া দিযাছে। তিনি সমস্ত জায়গায় বিফল হইয়া শুধু পরলোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একমাত্র কন্যাকে বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং তাহাকে দুঃসহ অপমান পর্যন্ত করিয়াছেন। সমাজ ও সংস্কারের উৎপীড়ন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করিয়া ফেলে—এই চিত্র তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। গ্রন্থকার এই আখ্যানকে কোথাও লঘু বা কোমল করেন নাই—ইহার সমস্ত বিষ তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়াছেন; অনুভূতির তীব্রতায়, অভিব্যক্তির অকুণ্ঠিত

বাস্তবতাব এই চিত্র অনন্যসাধাবণ। এই সম্পর্কে ডক্টব শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েব মত উল্লেখযোগ্য: " 'অবক্ষণীযা'তে জ্ঞানদাব অপমান অসহনীযতার চবম সীমায় পৌছায তখনই, যখন তাহাব স্নেহশীলা মাতা পর্যন্ত ভ্রান্ত সংস্কাবেব নিকট নিজ স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ বিসর্জন দিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎপীডনেব কেন্দ্রস্থলে গিয়া দণ্ডাযমান হন। সমাজেব ক্রুবতম নিযাতন সেইখানে যেখানে তাহাব বিষাক্ত প্রভাবে মাতৃস্নেহ পযন্ত নিষ্ঠুব জিঘাংসাতে ৰূপান্তবিত হয়। স্বর্ণমঞ্জবীব নিষ্ঠুব লাঞ্ছনা গঞ্জনা কোনও বকমে সহ্য হইতে পাবিত, কিন্তু নবকভযভীত দুর্গামণিব কঠিন অনুযোগ ও কঠিনতব পদাঘাত ধৈযেব বন্ধনকে নিঃশেষে ছিন্ন কবে।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শরৎ-সাহিত্যে পুরুষ

/ শবৎচন্দ্র যে সমস্ত নাবী চবিত্র আঁকিযাছেন তাহাদেব প্রধান লক্ষণ এই যে প্রচলিত আদর্শ দিয়া বিচাব কবিতে গেলে তাহাদেব অনেকবেই সতী আখ্যা দেওযা যায না। বাজলক্ষ্মী, অভযা, সাবিত্রী, বমা, পার্বতী, মাধবী—ইহাদেব প্রেম সমাজেব পক্ষে অবৈধ, ইহাবা নিজেবাও এই বিষযে সচেতন। অভযা ও কমল সমাজবে অগ্রাহ্য কবিযাছে, কিন্তু অন্য সবাই অনুভব কবিযাছে যে তাহাদেব দুর্বল প্রণযাকাঙ্ক্ষা শুধু যে সামাজিক বিচাবে হেয় তাহাই নহে, তাহা ধর্মবিরুদ্ধ-ও বটে। অন্নদাদিদি সতীকুলচূডামণি—স্বামীব জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকেও সবাই জানিল কুলটা বলিয়া, গৃহত্যাগিনী বলিযা। প্রীতিহীন ধর্ম ও ক্ষমাহীন সমাজেব বিচাবে যে সকল বমণী কুলটা, তাহাদেব হৃদযে যে দুবাব প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগিযা উঠে তাহাব বিশুদ্ধতাব চিত্র শবৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন। পাপপুণ্যেব যে মাপকাঠি সমাজ মানিযা লইযাছে, তাহাব সঙ্কীর্ণতা, বিচাবমূঢতা প্রতিপন্ন কবা শবৎ-সাহিত্যেব অন্যতম উদ্দেশ্য।

শবৎ-সাহিত্যে নাবীব প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহাব প্রধান অবদান এই যে তিনি বমণীকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে নাবীব শ্রেষ্ঠ পবিচয় ইহা নহে যে সে সাধ্বী স্ত্রী। তাহাব আসল পবিচয় এই যে সে নাবী, তাহাব ধর্মবোধ প্রবুদ্ধ, তাহাব লোক-

নিন্দাভীতি তীক্ষ্ণ, সমাজের অনুশাসন দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সবাইকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার দুর্বল হৃদয়। শরৎ-সাহিত্যে পুরুষের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ। অধিকাংশ উপন্যাসে পুরুষচরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে নারীচরিত্রবিকাশের সহায়ক হিসাবে। এই সকল পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এমন নহে। তবু মনে হয় যে তাহাদের কাহিনী স্বতন্ত্রভাবে স্রষ্টার প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিতে পারিত না; তাহাদের প্রত্যেকেই যে একটি প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী রমণীর চিত্ত উদ্বেলিত করিয়াছে ইহাই তাহাদের জীবনের সব চেয়ে বড় কথা। অবশ্য শরৎচন্দ্রের পুরুষ-চরিত্রের মধ্যেও তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে। সংসারের বিচারে ইহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে নাই, সম্মান লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহাদের অগৌরবের অন্তরালে যে ব্যক্তিত্ব রহিযাছে তাহা শ্রদ্ধেয, যে হৃদয় রহিয়াছে তাহা সহজেই অপরকে আকৃষ্ট করে। সাংসারিক বুদ্ধিতে নীলাম্বর তাহার ভাই পীতাম্বর অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট; অধিকন্তু সে গাঁজা খাইত, এবং কোন প্রকার লাভজনক কাজ করিত না। অথচ, তাহাব চরিত্রে যে মহত্ত্ব ছিল, তাহা তথাকথিত ভাল লোকদেব মধ্যে পাওয়া যায না। গোকুল ও প্রিয়নাথ ডাক্তাবকে বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লোক বলা যায না, কিন্তু তাহাদের নির্বুদ্ধিতার অন্তরালে ঔদাযের ও সৎসাহসের যে ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইত, তাহার তুলনা কোথায়? শরৎ-সাহিত্যে এই এক শ্রেণীর নায়ক আছে; ইহারা সবাই সরল প্রকৃতির লোক, এবং বৈষয়িক লাভালাভ সম্বন্ধে তেমন সচেতন নহে। কিন্তু শরৎচন্দ্র আরও কয়েকজন নায়কের চিত্র আঁকিয়াছেন; তাহারা শুধু যে নিষ্কর্মা তাহাই নহে, তাহাদের চরিত্র কলঙ্কলিপ্ত। প্রথমেই মনে হইবে দেবদাসের কথা। প্রতাপের সঙ্গে দেবদাসেব অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে, উভয়েই বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাত দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছে। কিন্তু প্রতাপের কাহিনী চিত্তজযের কাহিনী, তাহাব মৃত্যুর মধ্যে সংযমের বিজয ঘোষিত হইয়াছে। দেবদাসের কাহিনী চিত্তদৌর্বল্যের কাহিনী, তাহার মধ্যে রহিয়াছে অসংযমেব কলঙ্ক, পরাজয়ের গ্লানি, কিন্তু তবু গ্রন্থকার তাহাকেই নায়ক করিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে গ্রন্থকার এই বিষয়ে আরও সাহসী হইয়াছেন। তিনি গ্রন্থের নামকরণ করিযাছেন সতীশকে লক্ষ্য করিয়া। সাধু সমাজে সতীশকে যে আখ্যা দেওয়া হইবে, তিনিও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রচলিত নীতির উপরে অপ্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রহিয়াছে; দেবদাসের জন্য তিনি কৃপা

ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সতীশের সম্পর্কে তাঁহার সেই সসঙ্কোচ ভাব নাই। বরং তিনি যেন জোর করিয়া বলিতে চাহেন যে প্রচলিত নীতি যাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া ঘৃণা করিবে, মতের উদারতায়, মনের গভীরতায়, অনুভূতির ব্যাপকতায় সে অনন্যসাধারণ. এমন কি উপেন্দ্রের মত চরিত্রবান্ ও মহৎ লোকও তাহার কাছে নিষ্প্রভ।

প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে শরৎ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তথায় রমণীহৃদয়ে অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে গভীর, আজন্মার্জিত সংস্কার ও উচ্ছ্বসিত, দুরতিক্রম্য হৃদয়াবেগের মধ্যে। যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া এই সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও এই সংঘর্ষের পরিপুষ্টি সাধনই করিয়াছে, তাহাকে পরিসমাপ্তির পথে অগ্রসর করে নাই। শরৎ-সাহিত্যে যে সকল প্রেমের কাহিনী আছে, তাহাদের নায়কগণ অনুভূতিশীল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই অন্যমনস্ক বা উদাসীন। তাহারা নায়িকাদের মনের কথা বুঝে না, অথবা বুঝিলেও সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে চাহে না। দেবদাস পার্বতীর মনের কথা জানিত, পার্বতীও সমস্ত সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া তাহার কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু দেবদাস তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল। অবশ্য এই উপেক্ষার মূলে ছিল ভয়—অন্যমনস্কতা বা ঔদাসীন্য নহে। অন্যমনস্কতা চরমে পঁহুছিয়াছিল 'বড়দিদি' র সুরেন্দ্রনাথে, যদিও সুরেন্দ্রনাথ ঠিক উদাসীন নহে। সে বড়দিদির স্নেহাকাঙ্ক্ষী, শুধু বড়দিদির হৃদয়ের খবর সে রাখে নাই। আর এক জনের অন্যমনস্কতা নানা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল, সে নরেন্দ্রনাথ। বিজয়ার হৃদয়ে সংঘর্ষ হইয়াছিল প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ও নারীজনসুলভ সঙ্কোচের মধ্যে, ইহা দীর্ঘায়ত হইয়াছে নরেন্দ্রনাথের অন্যমনস্কতার জন্য। কিন্তু এই সংঘর্ষ অনতিক্রমণীয় নহে, তাই ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে বিবাহের আনন্দমিলনে।

শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে সাবিত্রী সর্বাপেক্ষা ত্যাগশালিনী, সেই জন্যই সতীশকে কবি অন্যমনস্ক বা উদাসীন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সতীশ সর্বতোভাবে সাবিত্রীকে কামনা করে, তবুও তাহাকে পায় না। শ্রীকান্তের পক্ষে সেই কথা খাটে না। শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী পাইতে চাহে তাহার সম্পূর্ণ মন ও প্রাণ দিয়া, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ও মাতৃত্বের গৌরব শ্রীকান্তকে দূরে সরাইয়া দেয়। শ্রীকান্তকেও শরৎচন্দ্র দিয়াছেন অতিশয় অনুভূতিশীল হৃদয়, অতি তীক্ষ্ণ সম্ভ্রমবোধ ও একটি ভবঘুরে মন, সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে সে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। প্রথম পর্বে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বিদায় দিয়াছিল তাহার মাতৃত্বের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রথমেই

দেখি রাজলক্ষ্মীর সমস্ত ঐশ্বর্য পায়ে ঠেলিয়া শ্রীকান্ত বর্মায় চলিয়া গেল। বর্মা হইতে ফিরিয়া আসিলে পর তাহাদের মিলন হইল বটে, কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া প্রয়াগ যাইতে অস্বীকার করায় রাজলক্ষ্মী যে কাণ্ড করিয়া বসিল তাহাতে শ্রীকান্ত বুঝিল তাহাদের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় অসম্মানের বীজ নিহিত রহিয়াছে। তাই সে তাহাকে অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। গঙ্গামাটিতে রাজলক্ষ্মী সরিয়া গিয়াছে সুনন্দার নিকট, শ্রীকান্তের মন উধাও হইয়াছে বর্মায় অভয়ার উদ্দেশ্যে, সে ভাবিয়াছে অফিসের কাজে ফিরিয়া যাওয়ার কথা। রাজলক্ষ্মী বাহির হইয়াছে তীর্থদর্শনে, শ্রীকান্ত চলিয়া গিয়াছে সতীশ ভরদ্বাজের সদ্গতি করিতে। চতুর্থ পর্বের প্রারম্ভে এই ঔদাসীন্য এত চরমে উঠিয়াছে যে শ্রীকান্ত পুঁটুকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। তারপর সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। শ্রীকান্তের বর্মা অভিযান স্থগিত রহিল, রাজলক্ষ্মীর উৎকট ধর্মচর্চা প্রশমিত হইল। এই অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ ইহাদের মধ্যে ব্যবধান অন্তর্হিত হইল, অথচ ইহাদের প্রেম ফুলে ফলে সার্থক হইল না। রাজলক্ষ্মীর কাজের সহায় বজ্রানন্দ, তাহার অবসর সময়ে শ্রীকান্তকে অসুস্থ কল্পনা করিয়া সে আদর যত্নের আতিশয্য করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীকান্তও যেন তাহার ব্যক্তিত্ব হারাইয়াছে, সে যেন রাজলক্ষ্মীর অবসর-বিনোদনের ক্রীড়নক মাত্র। সেই ব্যক্তিত্ব, সেই বৈরাগ্য, সেই ভবঘুরে প্রবৃত্তি—সবই যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

/ গভীর অনুভূতিশীলতার অন্তরালে বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন থাকিলে যে কি অপরূপ চরিত্রের সৃষ্টি হয় তাহা দেখিতে পাই 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। সুরেশের হৃদয় শুধু যে আবেগে পরিপূর্ণ তাহাই নহে, সে ভোগলোলুপ। ভোগ বলিতে সে নিছক দৈহিক সম্ভোগই বুঝে—সে আত্মা মানে না, ভগবানে বিশ্বাস করে না, পাপ-পুণ্যের ফাঁকা আওয়াজ করে না। অচলাকে সে যে চাহিয়াছিল তাহার মধ্যে হৃদয়-বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল; কিন্তু তাহার কাছে তদপেক্ষাও বেশী কাম্য ছিল অচলার দেহ। আর, এই রমণীকে পাইবার জন্য সে যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল। প্রথমেই সে বন্ধুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহার পর অচলার কাছে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার প্রবৃত্তি যেরূপ উদ্দাম, আত্মসমর্পণও তেমনি একাগ্র, অকুণ্ঠিত। ইহার পরে সে রুগ্ণ বন্ধুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিল তাহার স্ত্রীকে চুরি করিয়া। ডিহ্‌রীতে যাইয়া অচলাকে পাইয়া সে বুঝিল যে এই প্রাপ্তি সত্যিকার পাওয়া হইতে কত দূরে। কিন্তু তাহার উচ্ছ্বসিত প্রণয়নিবেদন, পরস্ত্রীলুব্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্তরালে

প্রচ্ছন্ন রহিয়াছিল একটি বিরাগী মন যে সমস্ত সম্ভোগ-লালসাকে স্বচ্ছন্দে ফেলিয়া যাইতে পারে, যে চরম পাপের পঙ্কে ডুবিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে। ছাত্রাবস্থায় দুইবার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সে মহিমকে বাঁচাইয়াছিল, আবার অচলার কাছে প্রত্যাখ্যান পাইয়া সে দূরে চলিয়া গিয়াছিল প্লেগের চিকিৎসা করিতে এবং সেইখানে অপরের প্রাণ রক্ষা করিতে যাইয়া নিজেকে বিপন্ন করিয়াছিল। ইহা শুধু ব্যর্থপ্রণয়ীর আত্মহত্যার নিষ্ফল প্রচেষ্টা নহে, ইহার মধ্যে যে সাহস ও পরোপচিকীর্ষা ছিল তাহা শুধু সে-ই দেখাইতে পারে যাহার চিত্ত পার্থিব সকল কামনা ও সুখের উর্ধ্বে বিচরণ করে। ডিহ্‌রী ষ্টেশনে নামিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে অচলাকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে ছিনাইয়া আনার চেষ্টা বৃথা; ইহাতে মহিম প্রবঞ্চিত হইতে পারে, কিন্তু সে লাভবান হইবে না। তাই অচলাকে সে তখনই ছুটি দিয়াছে, কঠিন অসুস্থতার মধ্যেও সে অচলাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে নাই। বোধ হয় এই কঠোর বৈরাগ্যই অচলার হৃদয়কে ক্ষণেকের জন্য আকৃষ্ট করিল এবং তাহারা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে রামবাবুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিল। সেইখানে সুরেশ নানা উপায়ে তাহার হৃদয়ের একান্ত কাতর প্রার্থনা অচলাকে জানাইতে লাগিল এবং ইহাদের কলুষিত মিলন চরমে পঁহুছিল এক ঝড় জল দুর্যোগের রাত্রিতে যেদিন সে অচলাকে সীমাহীন অন্ধকারের পথে অগ্রসর করিয়া দিল। কিন্তু তাহার পরই সুরেশ বুঝিতে পারিল, এই মিলন বিচ্ছেদ হইতেও ভয়ঙ্কর। ইহা আকাঙ্ক্ষিতকে কাছে না আনিয়া বরং দূরে সরাইয়া দেয়। এই উপলব্ধির ফলে তাহার বিরাগী মন আবার সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। এতদিন সে চেষ্টা করিয়াছিল কেমন করিয়া অচলাকে পাইবে, এখন তাহার চেষ্টা হইল কেমন করিয়া অচলাকে ছাড়িবে। পীড়িতের সেবায় সে পুনরায় আত্মনিয়োগ করিল এবং তাহারই মারফতে মৃত্যু আসিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইল। এই মৃত্যুকে সে আহ্বান করে নাই; সে তো ভীরু, কাপুরুষ নহে। কিন্তু সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে অকুণ্ঠিতচিত্তে; কারণ সে কামুক, পরস্ত্রীলুব্ধ হইলেও তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে রহিয়াছে এক চরম বৈরাগ্য যেখানে ভোগলোলুপতা পঁহুছিতেই পারে না। তাহার মৃত্যু আত্মহত্যা নহে, আত্মত্যাগ। মামুদপুর গ্রামে যখন অচলা তাহাকে রুগ্‌ণ শয্যায় দেখিতে পাইল, তখন সে নিঃসঙ্গ, একাকী। এই একাকিত্ব শুধু বাহিরের নহে, ইহা বিশেষভাবে অন্তরের নিঃসঙ্গতা। পৃথিবীর সকল কাম্য ও কামনা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, তাহার ধর্মে আস্থাহীনতাও এই

নিরালম্বতারই অঙ্গ। ধর্ম ও পরকালে বিশ্বাস সকলেরই অবলম্বন, নিঃসম্বলের ইহাই চরম সম্বল। কিন্তু এই আশ্রয়কেও সে গ্রহণ করে নাই; অবিমিশ্র বৈরাগ্যের সহিত, একান্ত নিঃসঙ্গভাবে সে সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল যাহার জন্য সে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করে নাই।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের অন্যতম নায়ক মহিম ভিন্নজাতীয় লোক। সুরেশ বাহিরে অসংযত, উচ্ছ্বসিত প্রবৃত্তির দাস, কিন্তু তাহার উদ্দাম ভোগলোলুপতার অন্তরালে রহিযাছে চরম বৈরাগ্য। মহিমের চরিত্রের বাহিরের আবরণটা নির্বিকার ঔদাসীন্যে ভরা, কিন্তু কঠোর সংযমের পশ্চাতে রহিয়াছে অনমনীয় কর্তব্যপরায়ণতা। সে অচলাকে ভালবাসে ও তাহার ভালবাসা পাইয়াছে, কিন্তু এই ভালবাসার জন্য সে কর্তব্যপথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইতে প্রস্তুত নহে। শুধু তাহাই নহে। অন্তরে বাহিরে সে একান্তভাবে একাকী; কাহাকেও সে তাহার চিন্তার, কল্পনার সঙ্গী করিতে পারে না। জীবনকে সে ভোগ করিতে চাহে না, সহ্য করিতে চায়; তাহার সম্বল উদ্বেলিত প্রবৃত্তি নহে, অবিচলিত ধৈর্য। এক জাতীয় লোককে সহজেই শ্রদ্ধা করা যায়, ভালবাসাও যায়, কিন্তু সেই ভালবাসা রক্ষা করা দুরূহ, কাবণ ভালবাসা আদান-প্রদানের রসে সঞ্জীবিত থাকে। যে নির্বিকার সংযম কখনও চঞ্চল হয় না, যে গোপনতা কখনও প্রশ্ন করে না, কখনও প্রশ্নের উত্তর দেয না, তাহা শুধু যে সামাজিক জীবনে অচল তাহাই নহে, তাহা পীড়াও দেয়। মৃণালের সহজ প্রগল্‌ভতার ও চঞ্চলতার মধ্যে একটি বিদ্রোহের সুর প্রচ্ছন্ন আছে; যে সেজ্‌দাকে সে ভালবাসা দিয়াছে তাহার নিকট হইতে সে স্নেহ পাইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরে সে প্রবেশ করিতে পাবে নাই। বিবাহের পরে অচলা স্বামীর বিরুদ্ধে যে কেন বিরূপ হইতেছে মহিম তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে নাই, বুঝিলেও তাহার কোন প্রতিকার করিতে চেষ্টা কবে নাই। অথচ এই প্রতিকার করা তাহার পক্ষে কত সহজ ছিল। সুরেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ও পরে সে যে ব্যবহার করিয়াছে তাহার মধ্যেও এই শান্ত নিষ্করুণতা পরিস্ফুট হইয়াছে। সে অচলার মনের কথা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে নাই, তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই আচরণের কঠোরতা একবার তাহার মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু অমনি সে এই চিন্তাকে দূরে সবাইয়া দিয়াছে। মহিম সহ্য করিতে পারে, সামঞ্জস্য করিতে পারে না, গ্রহণ কবিতে পারে, দান করিতে পারে না।

কুসুমের স্বামী বৃন্দাবন ও সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যাম—ইহাদের মধ্যেও কিন্তু তীব্র নির্বিকার সহনশীলতার আকার ধারণ করিয়াছে। উপন্যাস হিসাবে

'গৃহদাহ' অপেক্ষা 'পণ্ডিতমশাই' ও 'স্বামী' অনেক নিকৃষ্ট। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নরনারীর হৃদয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা আছে তাহা কুসুম বা সৌদামিনীর কাহিনীতে নাই। বৃন্দাবনের চরিত্রের প্রধান গুণ তাহার প্রশান্ত সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতা। তাহার জীবনে যে দুঃখ আসিয়াছে তজ্জন্য তাহার নিজের দায়িত্ব খুব কম; অবস্থাবৈগুণ্যে ও কুসুমের অনমনীয় তেজস্বিতার জন্য তাহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রশান্ত গাম্ভীর্য প্রায় কখনও বিচলিত হয় নাই, সে নিজের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। অবশ্য, সে কখনও জোব করিয়া কুসুমকে লইযা যায় নাই, কারণ তাহার মনেও সেই বৈরাগ্য ছিল যাহা শরৎচন্দ্রের নায়কদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কুসুম আসিলে সে খুসী হইত, কিন্তু আসে নাই বলিয়া সে কোন ক্ষোভ কবে নাই। চরণের মৃত্যুশয্যায় কুসুম যখন উপস্থিত হইল, তখন ক্ষণেকের জন্য তাহার মনে বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু আবার অতি সহজেই সেই ভাব বিদূরিত হইল। বৃন্দাবনের মনে একটা বিরাট ক্ষমাশীলতা ও ঔদার্য ছিল, তাই চরণের মৃত্যুর পর কুসুমের সঙ্গে তাহার পরিপূর্ণ মিলন হইল; 'গৃহদাহ' উপন্যাসে এই মিলনের ক্ষীণ আভাসমাত্র আছে। সৌদামিনীর স্বামী ছিল পবম বৈষ্ণব; সে নিজেকে বৃক্ষের সহিত তুলনা কবিত, যে বৃক্ষ ঝড় জলের উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করে। তাহার দুঃসহ সহনশীলতা সৌদামিনীর ক্ষণিক পতনের অন্যতম কারণ, আবার পরে তাহার অসীম ক্ষমাশীলতাই সৌদামিনীকে চরম অধঃপাত হইতে বক্ষা কবিল। তাহার কাহিনীর সঙ্গে মহিমের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে, কিন্তু গ্রন্থকার তাহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অপূর্ণাঙ্গ। মহিম তাহার অপেক্ষা কম ক্ষমাশীল, কিন্তু মহিমের চবিত্র নানাদিক দিয়া বিচিত্র উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে; কাজেই তাহা সত্যতর।

প্রণয়কাহিনীর নায়কদের মধ্যে যে নির্বিকাব ঔদাসীন্য দেখা যায় তাহা অন্যান্য অনেক পুরুষ চরিত্রেব মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ ডাক্তার, গোকুল, নীলাম্বব—ইহাদের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'নিষ্কৃতি'ব গিরিশ অতিশয় আপনভোলা লোক এবং অবিমিশ্র কৌতুকের প্রস্রবণ। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ হইতেছে সাংসাবিক লাভালাভে ঔদাসীন্য। তিনি টাকা উপার্জন করিতেন, কিন্তু তাহা ব্যয় করিত অন্যে। তাই নিজের ও পরেব মধ্যে ব্যবধান তাঁহার অপরিজ্ঞাত রহিয়া গেল; যাহার সঙ্গে মোকদ্দমা তাহার স্ত্রীর নামেই তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলেন। এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তিনি বহুলোকের গালমন্দ

খাইলেন, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী তাঁহার নির্লোভ, আত্মপরজ্ঞানশূন্য বৈরাগ্যকে ঠিক চিনিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীকান্তের বাল্য-বন্ধু গহরের প্রণয়ের কথা আভাসে উল্লিখিত ও বর্ণিত হইয়াছে। গহর প্রধানতঃ কবি। কিন্তু তাহার বিশেষ কিছু কবিপ্রতিভা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং ইহাকে একটা নেশা-মাত্র বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকান্ত তাহাকে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। গহরের চরিত্রে যে গুণটি প্রধান ও সর্বাপেক্ষা মহনীয় তাহা হইতেছে সাংসারিক সৌভাগ্যের প্রতি একান্ত ঔদাসীন্য। তাহার বাবা তাহার জন্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার পিতামহ ছিলেন ফকির। সে এই ফকিরের চরিত্রই পাইয়াছিল। সে জমিদার, কবি, প্রণয়ী, পরোপকারী কিন্তু সর্বোপরি সে ফকির। তাহার প্রণয়নিবেদনের মধ্যেও ফকিরের নির্লিপ্ততা ছিল বলিয়া মনে হয়। সে দ্বারিকাদাস বাবাজির আশ্রমে যাতায়াত করিত, বোধ হয় কমললতার সাহচর্য পাইবার জন্যই। কিন্তু কমললতাকে পাইবার জন্য তাহার নির্বন্ধাতিশয্য নাই, জবরদস্তি নাই। মৃত্যুশয্যায় কমললতা তাহার অসাধারণ সেবা করিয়াছিল, কিন্তু সে কমলের নিজের আগ্রহে; গহর কোন দিন তাহাব প্রতি কোন জোর খাটায় নাই। তাহার শেষ ইচ্ছার মধ্যেও এই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কমললতাকে টাকা দিতে চাহিয়াছে, যদি সে নেয়, যদি তাহার কাজে লাগে। এইখানেও জবরদস্তি নাই, পীড়াপীড়ি নাই।

নির্বিকার নির্লিপ্ততার মধুরতম পরিচয় পাই স্বামী বজ্রানন্দে। বজ্রানন্দ শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি। সে ধনীর ছেলে ছিল, কিন্তু সংসারের কোন আকর্ষণই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। যৌবনের প্রারম্ভে—মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষা যখন সর্বাপেক্ষা উগ্র থাকে—সে অতি সহজে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেশের ও দশের কাজে অনিশ্চিতের আহ্বানে বাহির হইয়া আসিল। অথচ সংসারের প্রতি তাহার কোন বিরূপতা নাই; ভোজনের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি। রাজলক্ষ্মীর একান্ত নিভৃত ঘরকন্নার মধ্যে সে নিজেকে অতি সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। রাজলক্ষ্মীর আতিথেয়তার সদ্ব্যবহার সে খুব বেশি করিয়া করে। শ্রীকান্তের জন্য রাজলক্ষ্মীর অতিরিক্ত চিন্তা, শ্রীকান্তের অভিমান —ইহা লইয়া বুঝিয়া না বুঝিয়া সে হাস্য পরিহাস করে। ইহা সত্ত্বেও কাহারও জন্য তাহার বন্ধন নাই, সকলের জন্য মমতা আছে, বিশেষ কাহারও জন্য মায়া নাই; সে যেমন অনায়াসে আসে তেমনি অনায়াসে সরিয়া যায়। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে, বাঙলাদেশের ভাইবোনদের জন্য তাহার দরদী চিত্ত স্নেহে ভরপুর, কিন্তু কোন একটি বিশেষ বোনের কোন বিশেষ দাবী নাই।

বীরভূমের পল্লীতে যাইয়া ইস্কুল করিয়া, চিকিৎসা করিয়া, নানা উপায়ে দেশের উন্নতি করিতে সে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, কিন্তু সেইখানেও সেই নির্লিপ্ততা। যেদিন কাজ শেষ হইল, অমনি চলিয়া আসিল; সকলের সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা একদিনের জন্যও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সবাইকে ভালবাসে বলিয়াই কোন বিশেষ লোককে লইয়া সে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; সংসারকে ছাড়িয়াই সে সংসারকে নিবিড় ভাবে পাইয়াছে। তাহার মধ্যে অতিথির ক্ষণিকতা, গৃহীর আসক্তি ও সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততার সমন্বয় হইয়াছে। 'অতিথি' তারাপদের বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিযাছেন, "সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশতঃ যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না।" যদি এমন কোন শুভ্রপক্ষ পক্ষীর কল্পনা করা যাইতে পাবে যে কৌতূহলবশতঃ নহে, গভীর টানে জলের অন্তরতম প্রদেশে ডুব দিয়া তাহার পঙ্কিলতার মধ্যে আপনার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা দান করে, যে শুধু জলের পুরোদেশে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় না, অন্তঃস্থলেও সঞ্চরণ করে, তবেই তাহার সঙ্গে বজ্রানন্দের তুলনা হইতে পারে।

শরৎচন্দ্র পুরুষচরিত্রের সস্নেহ অনুভূতিশীলতার চিত্র আঁকিয়াছেন, আবার তিনি তাহার নির্মম নিষ্ঠুরতার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 'অরক্ষণীয়া'র অতুল, অভয়ার স্বামী ও যে যুবক রংপুরে তামাক কিনিবার ছলে একান্ত অনুগত ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গেল—ইহাদের কথা স্বতঃই মনে আসিবে। 'শ্রীকান্ত'-উপন্যাসে বর্ণিত উপরি-উল্লিখিত চিত্র দুইটি সম্পূর্ণ নহে; কিন্তু তবু এই সব চিত্র অতিশয় নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। অতুলের চরিত্র সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানদার মধ্যে লজ্জায় নম্র, সেবায় স্নিগ্ধ কুমারীর যে মূর্তি সে দেখিতে পাইল তাহাতে সে মুগ্ধ হইল এবং অকপট-চিত্তে তাহাকে প্রেম জ্ঞাপন করিল। তারপর রূপের মোহে, বাহিরের চাকচিক্যে তাহার তরুণ চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইল; অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক যুবক চরম নিষ্ঠুরতার সহিত পূর্ব প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিয়া, যে কিশোরী একাগ্রচিত্তে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল তাহাকেই লাঞ্ছিত করিল। জ্ঞানদার মার মৃত্যুর পর শ্মশানে নূতন করিয়া সে জ্ঞানদার যে পরিচয় পাইল তাহাতে তাহার পূর্ব প্রণয় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল এবং জ্ঞানদাও তাহাকে গ্রহণ করিল। অতুলের হৃদয়ের যে পরিবর্তন ও পুনরাবর্তন হইল তাহা আকস্মিক; কেমন করিয়া দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত হয় নাই। তাই তাহার চরিত্র অনেকাংশে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

বাঙলার পল্লীসমাজের অনুদার স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্রপরায়ণতা ও প্রীতিহীন, উপলব্ধিহীন ধর্মনিষ্ঠা—শরৎচন্দ্র ইহার বহু চিত্র আঁকিযাছেন। স্বর্ণমঞ্জরী, রাসী বাম্‌নী প্রভৃতির চরিত্র আঁকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের কলঙ্ক পুরুষচরিত্রেই বিশেষ করিয়া আরোপ করিয়াছেন। 'বামুনের মেয়ে'র গোলোক চাটুজ্যে পল্লীসমাজের নেতৃস্থানীয়, বাহিরের আচার ব্যবহারে সে ধর্মনিষ্ঠও বটে; কিন্তু প্রকৃত ধর্মবোধ তাহার একেবারেই নাই। অনাথা বিধবার গর্হিততম সর্বনাশ করিয়া সে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বোধ করে নাই। এই পাষণ্ডের জীবহত্যায় সঙ্কোচ নাই, রমণীর সর্বনাশ করিতে দ্বিধা নাই, যাহাকে পাপের গভীরতম পঙ্কে ডুবাইয়াছে তাহার প্রতিও অণুমাত্র করুণা নাই। (যে ধর্ম শুধু বাহিরেব আচারকেই আশ্রয় করিতে শিখিয়াছে তাহার পরিণতি এই ধর্মহীন নিষ্ঠুরতায়।) 'পণ্ডিতমশাই'এর তারিণী চাটুজ্যে, 'বৈকুণ্ঠের উইল'এব জয়লাল বাঁড়ুয্যে—ইহারা গোলোকের মত হীন কর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু ইহারা অতিশয় নিষ্ঠুব এবং স্বার্থান্বেষী। তারিণীব চবিত্রে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্কীর্ণতা, অন্ধ দাম্ভিকতা ও নির্মমতা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিযাছে। যে সমাজে আচারের মরুবালুবাশি বিচারের স্রোতঃপথকে গ্রাস করিযা ফেলিযাছে, সেইখানে যে তাবিণীব ষড়যন্ত্রে বৃন্দাবনের পুত্র অচিকিৎসায মারা যাইবে ইহাতে বিস্ময়েব কি আছে?) চন্দ্রনাথের খুল্লতাত মণিশঙ্কর অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি চন্দ্রনাথকে বলিযাছিলেন, "যাহার অর্থ আছে সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করিলে তোমার জাত মাবিতে পারি।" আর এই সমাজের নিরীহ ভালমানুষ হইতেছে চন্দ্রনাথের দল—অনুভূতি আছে, নিষ্ঠা নাই; সদ্‌বুদ্ধি আছে, কিন্তু সৎসাহস নাই। ইহারা স্রোতের ফুলের মত—ভাসিযা যাওয়াই ইহাদের একমাত্র সার্থকতা।

পল্লীসমাজের নীচতাব একাধিক চিত্র আঁকা হইয়াছে 'পল্লীসমাজ' গ্রন্থে এবং এই সম্পর্কে বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর নাম সর্বাগ্রে মনে আসিবে। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্মই তাহাদের বাকি নাই—চুরি, জুয়াচুরি, জাল, ঘরে আগুন দেওয়া, মিথ্যা কুৎসা বটনা করা, বমণীর ধর্মনাশ করা। পল্লীসমাজ এই সব পাপাচারীদেব দুষ্কর্মে ভারাক্রান্ত; শরৎচন্দ্র ইহাদের পাপের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা যেমন স্পষ্ট তেমনি তীব্র। কিন্তু তবু মনে হয় এই দুইটি পুরুষের চিত্র সম্পূর্ণ সজীব হইতে পারে নাই। ইহারা যেন অন্যায় কাজ কবিবার কলমাত্র। যন্ত্রের মত গতিশীল, কিন্তু যন্ত্রের মতই প্রাণহীন। মনে হয় কাবণে, অকারণে শুধু পরের অমঙ্গল সাধনের জন্যই ইহাদের সৃষ্টি—মনে দ্বিধা নাই, সুদূর কোন উদ্দেশ্য নাই; অবস্থাব পরিবর্তনের সঙ্গে মনে নূতন

ভাবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নাই, ব্যবহারেও বৈচিত্র্য নাই। ইয়াগো চরিত্রে শেক্সপিয়র নিছক উদ্দেশ্যহীন পাপপ্রবৃত্তির চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু ইয়াগোর মনেও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়াছে, শেষের দিকে একটু সঙ্কোচের ভাবও আসিয়াছে। এই দুর্বলতা মানবোচিত; ইহা না থাকিলে, সে হইত কলের দানব। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে রক্তমাংসে গড়া অনুভূতিশীল মানুষ বলিয়া মনে হয় না। 'দত্তা'র রাসবিহারীর কর্মক্ষেত্র ইহাদের কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা সঙ্কীর্ণপরিসর, কিন্তু সে ইহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী জীবন্ত। সে মিথ্যাবাদী, কপট ষড়যন্ত্রকারী, কিন্তু তাহার সকল মিথ্যাচরণের পশ্চাতে রহিয়াছে বিজয়ার জমিদারি হস্তগত করিবার প্রচেষ্টা। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়া সে এক বিরাট্ জাল বিস্তার করিয়াছে। স্বীয় জাতিগত নীচতা সম্পর্কে সে সচেতন, নিজের অবস্থা যে তেমন সচ্ছল নয় ইহাও সে জানে। নিজের মনে কোন সুকুমাব প্রবৃত্তি নাই; কিন্তু সে পরেব সেন্টিমেন্টে কৌশলে আঘাত করিতে পারে। অথচ নিজের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়াছে বলিয়াই অন্য কাহারও হৃদয়ের আবেগের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তাকে সে স্বীকার করে না। সে জানে কোন রকমে বিজয়াকে বিলাস-বিহারীর সঙ্গে বিবাহ দিয়া তাহাব সম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিলে আর কোন গোল থাকিবে না। বুদ্ধির উপর ভর করিয়া সে অনেকটা কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছে, সুতরাং নিজের কৌশল ও বিচক্ষণতার উপর তাহার আস্থা অসীম। কিন্তু উপন্যাসে এই বুদ্ধিজীবী পরিপূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। এই উপন্যাস নরেন্দ্র-বিজয়ার প্রণয়ের রোমান্স, কিন্তু ইহা রাসবিহারীর পরাজয়ের ট্র্যাজেডি।

মানবচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার বৈচিত্র্য, তাহার মধ্যে নানা প্রবৃত্তির সমাবেশ। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সর্বপ্রধান পুরুষচরিত্র জীবানন্দ। জীবানন্দ চৌধুরী জমিদার, মাতাল, লম্পট, ধর্মজ্ঞানশূন্য; প্রজাপীড়ন, স্বামিপুত্রবতীর সতীত্বনাশ তাহার দৈনন্দিন কাজ। অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাহার সর্বদা অর্থের প্রয়োজন; এই অর্থ জোর করিয়া, অত্যাচার করিয়া আদায় করিতে তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই, রমণীর সতীত্বকে সে পণ্য বলিয়া মনে করিত, যে রমণীর সতীত্ববোধ অসুবিধার সৃষ্টি করিত, তাহাকে সে পাইকদের ঘরে পাঠাইয়া দিত। তাহার সমস্ত পাপাচারের মধ্যে কোথাও সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই, লুকাইবার ইচ্ছা নাই। নিজের কৃতকর্মের সে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক; কারণ তাহার ধর্মাধর্মবোধ নাই। সাধারণতঃ পাপাচারীদের খানিকটা লজ্জাবোধ থাকে। নিজেদের অন্যায়ের

ভীষণতায় তাহারা অভিভূত হয়, তাহারা শুধু পরকে ঠকায় না, নিজেদেরও ঠকাইতে চেষ্টা করে, ধর্মবিশ্বাস না থাকিলেও ধর্মভীরুতা তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলে। কিন্তু জীবানন্দের ধর্মভীরুতার বালাই নাই, তাই পাপ তাহার কাছে সহজ হইয়া গিয়াছে। সে ইহাকে অতি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিতে পারে বলিয়াই তাহার নির্লজ্জতা ঘৃণার উদ্রেক করে না, প্রফুল্লের মত রসিক জনকে ইহা আকৃষ্ট করে; শিরোমণি, জনার্দন রায় প্রভৃতি কপট, হৃদয়হীন লোক ইহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই স্বচ্ছদৃষ্টি, সঙ্কোচহীন পাপাচারী যে পরের প্রতি অত্যাচার করে তাহাই নহে, নিজের সম্পর্কেও ইহার অণুমাত্র মমতা নাই। সে জানে যে, যে-পথে সে বিচরণ করিতেছে তাহা মরণের পথ—ইহাতে শান্তি নাই; সম্ভোগ আছে, সন্তোষ নাই। অথচ তাহার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নাই। পরকে উৎপীড়ন করিতে সে যেমন নিঃসঙ্কোচ, নিজের উপর অত্যাচার করিতেও সে তেম্নি দ্বিধাহীন।

এই কারণেই জীবানন্দের মধ্যে এমন একটি লক্ষণ দেখা যায় যাহা অধিকাংশ পাপাচারীর মধ্যে পাওয়া যায় না। ইহা তাহার সুতীক্ষ্ণ হাস্যরসবোধ। হাস্যরসের নানারূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। একটি লক্ষণ বহু দার্শনিক লক্ষ্য করিয়াছেন; হাস্যবসেব মূলে রহিয়াছে হাস্যরসিকের শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ। যে পা পিছ্লাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে লইয়া সে-ই পরিহাস করিতে পারে যে নিজে পড়িয়া যায় নাই। দুই পক্ষের মারামারি লইয়া সে-ই কৌতুক অনুভব করিতে পারে যে মারামারি হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সাধারণতঃ, পাপীর মধ্যে এই লক্ষণ থাকে না। তাহার বিবেক তাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করাইয়া দেয় যে সে সবার নীচে, প্রলোভনের কাছে প্রতিদিন পরাজিত হওয়ায় তাহার সম্ভ্রমবোধ বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে পারে না বলিয়া সে নিরন্তর ইহা অনুভব করিয়াই পীড়িত হয় যে সে পাপের গভীরতম পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতেছে। জীবানন্দের কথা স্বতন্ত্র। সে পাপের শেষ সীমায় পঁহুছিয়াছে, কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠত্ববোধ বিলুপ্ত হয় নাই, কারণ সে জানে অধিকাংশ লোকই অন্যায় আচরণ করে; জনার্দন রায়ের সঙ্গে তাহার তফাৎ এই যে, সে তথা-কথিত সাধুলোকের মত কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। পাপাচরণের মধ্যেও তাহার কাঙালপনা নাই। যে রমণীকে সে আয়ত্তে আনিতে পারে না, সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে তাহাকে সে পাইকদের ঘরে পাঠাইয়া দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে সে পলায়ন করিতে পারিলে করিত, কিন্তু নিষ্ফল কাতরোক্তি

করিবার স্পৃহা তাহার নাই। তাই, সে শুধু পরকে লইয়া ব্যঙ্গ করে না, নিজের প্রতিও তাহার কৌতুকের অন্ত নাই। মনে হয়, তাহার মধ্যে দুইটি সত্তা পাশাপাশি বসবাস করিত। একটি পাপে ডুবিতেছিল, আর একটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিত। একটি 'কে' সাহেবের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার পথ খুঁজিয়াছে, আর একটি সাহেবের বহুদিন পোষিত আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার কল্পনায় কৌতুক অনুভব করিয়াছে। একটি ষোড়শীর চরম লাঞ্ছনার নিষ্ঠুর প্রস্তাব নিঃসঙ্কোচে করিয়াছে, আর একটি তেম্‌নি নিঃসঙ্কোচে ষোড়শীর হাত হইতে বিষ গ্রহণ করিয়াছে।

এই কারণেই জীবানন্দের পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত হইলেও অসমঞ্জস নহে। নিছক লালসাপূর্তির মধ্যে একটা দৈন্য আছে। একটি আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয; সেইটি নিবৃত্ত হইলে পর আরও একটি, এমনি করিয়া আকাঙ্ক্ষার অফুরন্ত চক্র রচিত হইতে থাকে। একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ নাই, কোন একটি সুখের স্থায়িত্ব নাই। তাই যে শুধু কামনার ইন্ধনই জোগাইয়াছে সে নিজের জীবনে একটা বিরাট ফাঁকও দেখিতে পাইবে। ষোড়শীর কাছে আহার চাহিলে, ষোড়শী যখন বলিযা উঠিয়াছিল, "আপনি সারাদিন খান্‌নি, আর বাড়ীতে আপনার খাবাব ব্যবস্থা নেই, একি কখনও হতে পারে?" তখন জীবানন্দ উত্তর করিল, "আমি খাইনি বলে আর একজন উপোষ করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে বসে থাকবে, এ ব্যবস্থা তো করে রাখিনি।" এই জবাব খুব শান্ত, কিন্তু ইহার মধ্যে একটি গভীর বেদনা প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। তাহার জীবনেব দৈন্য সে ষোড়শীর সংস্পর্শে আসিয়াই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। সে এতকাল জানিয়াছে যে রমণীর সতীত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্কোচের আবরণ মাত্র, তাই ব্যঙ্গ করিয়া সে ইহাকে বলিয়াছে 'সতীপনা'। যে সব রমণীতে সে ইহার অপেক্ষা গভীর অনুভূতি দেখিয়াছে, তাহারা স্বামি-পুত্রবতী—জীবানন্দের কাছে তাহাদের সতীত্বও একটা প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের (vested interest-ব) নামান্তর মাত্র। কিন্তু ষোড়শীব সংস্পর্শে আসিয়া সে জানিল যে রমণীর সতীত্ব অত্যাজ্য ধর্ম; ইহার সঙ্গে সঙ্কোচের বা স্বামিপুত্র-স্নেহের সম্পর্ক গৌণ। তাহার স্বচ্ছদৃষ্টি স্বচ্ছতর হইল, তাহার কাছে জগতের রূপ বদ্‌লাইয়া গেল। অথচ এই ষোড়শী তাহারই স্ত্রী অলকা, সে তাহাকে এমন কিছু দিতে পারিত, যাহা অন্য কোন রমণী দিতে পারে নাই। যে আজ অপ্রাপণীয়া, একদিন তাহাকেই সে অবহেলায় ত্যাগ করিয়াছিল। ইহার পর সেই নির্লিপ্ততার স্থানে আসিল, কাতর অনুনয়। জনার্দন রায় প্রভৃতিকে লইয়া

সে পূর্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়াছে; নিজের হার্টফেল করিবার সম্ভাবনা লইয়া কৌতুক করিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিহাসের মধ্যে আর সেই সরলতা নাই। নির্মলের প্রতি তাহার ঈর্ষা হইয়াছে, ষোড়শীকে সে একান্তভাবে আপনার করিয়া পাইতে চাহিয়াছে। সম্পত্তি দান কবিবার সময় সে বলিয়াছে, "আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। সংসারে আর আমি কিছুই নষ্ট কর্‌তে পারব না। এখানে আমি বাঁচতে চাই—মানুষেব মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ী চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলেপুলে চাই,—আব মরণ যেদিন আট্‌কাতে পারব না, সেদিন তাদেব চোখেব উপব দিয়েই চলে যেতে চাই।" এই সেই জীবানন্দ! যে উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ ষোড়শীর নিকট হইতে বিষ গ্রহণ করিয়াছিল আর যে সংযমী, সর্বত্যাগী জমিদাব ষোড়শীর হাত ধরিযা সমস্ত সম্ভোগ হইতে দূরে সরিয়া গেল—ইহাদের মধ্যে কত প্রভেদ, অথচ উভয়েব মধ্যে রহিযাছে—বাঁচিবার জন্য অপ্রমেয় আকাঙ্ক্ষা, আবাব তেমনি সুগভীর নির্বিকার বৈরাগ্য।

(৩)

শরৎসাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সাধারণতঃ তাহার মধ্যে অতিমানব ও অতিমানবীর সৃষ্টি কবা হয় নাই। শরৎচন্দ্র সাধারণ নরনারীব ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে মহনীয় প্রবৃত্তি আছে, তবু তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, নানা দুর্বলতা আছে। কিন্তু তিনি কখনও কখনও দুই একটি চরিত্র আঁকিযাছেন যাহাবা সাধারণ মানুষের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অসামান্যের সীমানায় পঁহুছিয়াছে। তাহারা বীর, অপরের বরেণ্য আদর্শ। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে যে কয়েকটি খণ্ডচিত্র আছে তন্মধ্যে আকবর লাঠিয়াল, সাগর সর্দার ও ফকির সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী ভীরুর দেশ,—এই অখ্যাতি সর্বত্র শোনা যায়। কিন্তু এই নিন্দিত প্রদেশের অখ্যাত পল্লীতে যে কিরূপ শৌর্য ও বীরত্বের পবিচয পাওয়া যাইত তাহার নিদর্শন আকবর লাঠিয়াল। রাজার সৈন্যবাহিনীর যে নেতা তাহার ক্ষমতা আসে বাহির হইতে; সে নিজে যাহাই হউক, যতদিন সে কর্মচ্যুত না হয় ততদিন তাহাকে মানিতেই হইবে, কারণ তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে সমগ্র রাজশক্তি ও কঠিন সামরিক আইন। কিন্তু আকবব যে পাঁচখানা গ্রামের সর্দারি করে, তাহার মূলে রহিয়াছে কোন বহিঃশক্তির আদেশ নহে, নিজের চরিত্রবল। তাহার বাহুবল সামান্য নহে, প্রাণ দিতেও সে পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু সে বেইমানি করিতে প্রস্তুত নহে, কোন প্রলোভন বা ভযপ্রদর্শনেই নহে। বিজয়ী শত্রুর পরাক্রমকে স্বীকার করিবার মত ঔদার্য ও সৎসাহস তাহার আছে, রাজার আদালতকে সে অমান্য করে না,

কিন্তু সেইখানে যাইয়া নিজের পরাজয়ের চিহ্ন দেখাইয়া বিচার ভিক্ষা করিবার মত দৈন্য তাহার নাই। সে রমার আশ্রিত লোক, কিন্তু তাহার অনুরোধেও কোন নীচ কাজ করিতে, কোন অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সে প্রস্তুত নহে। 'ষোড়শী'র সাগর সর্দার আকবর সর্দারের অনুরূপ চরিত্রের লোক, কিন্তু তাহার চরিত্র তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সে ষোড়শীর অনুচর মাত্র; ষোড়শীর আশ্রয়ে সে মানুষ, ষোড়শীর ছায়ায় তাহার ব্যক্তিত্ব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফকির সাহেবের সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। তিনি ষোড়শীর অনুচর নহেন, তাহার গুরু, ষোড়শীর জীবনের সমস্ত কাজের প্রেরণা আসিয়াছে তাঁহার নিকট হইতে। কিন্তু ষোড়শীর নিকট হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। একদিন ষোড়শী তাঁহাকে সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনিও একটু সন্দিগ্ধ হইয়াই কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না। ইহার পরে তাঁহাদের যখন আবার সাক্ষাৎ হইল, তখন সন্দেহ ও বিরক্তি কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের গুরুশিষ্যার সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাকে আর স্বতন্ত্র ভাবে দেখা গেল না, তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিজস্ব, তাহা অস্পষ্টই রহিয়া গেল।

রমেশ ও বিপ্রদাস—এই দুইটি চরিত্রে শরৎচন্দ্র আদর্শ পুরুষের পরিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহাদের আচার-ব্যবহারে একটু পার্থক্য আছে। রমেশ আজকালকার যুবক; সে জাতি মানে না, প্রাচীন হিন্দুর অন্যান্য সংস্কারেও তাহার আস্থা দৃঢ় নহে। বিপ্রদাস প্রাচীনপন্থী, হিন্দুর সনাতন আচারে তাহার অকুণ্ঠিত বিশ্বাসই বন্দনাকে তাহার প্রতি বিরূপ করিয়াছে, আবার তাহার শান্ত, সংযত, অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠাই বন্দনাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। রমেশের চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। রমেশ একটা আদর্শের প্রতীক মাত্র, তাহাকে সজীব মানুষ বলিয়া মনে হয় না। সে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে, গ্রামে আসিয়া পল্লীসমাজের দৈন্য দূর করিতে চাহিয়াছে ও তাহার নীচতার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করিয়া সে কারাবরণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও সে নিরুৎসাহ হয় নাই, বরং জেলের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সে নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, এবং এ-আলো কখনও নিভিবে না বলিয়া রমা ও জ্যাঠাইমা তাহাকে আশ্বাস দিয়াছে। কিন্তু মানুষ তো শুধু ভাল করিবার কল মাত্র নহে, সে অন্যায় আচরণের যন্ত্রও নহে। পরের উপকার বা অপকার—ইহার মধ্যে মানুষের বাহিরের পরিচয়ই বিশেষভাবে পাওয়া যায়—তাহার প্রকৃত পরিচয়

দেয় তাহার অন্তর, যে বাহিরের সকল পদার্থকে আংশিকভাবে আপনার রঙে রঞ্জিত করে। জনৈক শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়াছেন যে মানব চরিত্রের গোড়ার কথা কোন চিন্তা বা আইডিয়া নহে—আইডিয়ার অন্তরালস্থিত সরল, স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি। আর এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিগুলি নিছক ভাল বা নিছক মন্দ নহে। রমেশের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আমরা প্রবেশ করিতে পারি না। তাহার যতটুকু পরিচয় পাই তাহাতে তাহাকে পরোপচিকীর্ষার প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের পরিপূর্ণতা ও বৈচিত্র্য তাহার মধ্যে নাই। নায়ক রমেশ ও প্রতিনায়ক বেণীকে শরৎচন্দ্র পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির প্রতীক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে উভয় চরিত্রই অপূর্ণাঙ্গ রহিয়া গিয়াছে।

সমাজ-সংস্কারকের অন্তরালে যে অনুভূতিশীল মানুষের হৃদয় থাকে তাহার ক্ষীণ আভাস পাই রমেশের প্রণয়কাহিনীতে। কিন্তু এই কাহিনীও সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। রমা কলঙ্ককে এত ভয় করে যে রমেশকে জেলে পাঠাইতেও সে বিরত হয় নাই, আর রমেশ তো রমার মনের কথা বুঝিতেই পারে না। শুধু তারকেশ্বরে সাক্ষাতের দিন সে রমার অন্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইয়াছিল এবং সে বিশ্বাস করিয়াছিল যে এই দিনটা তাহার জীবনের ধারাকে বদলাইয়া দিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কাহিনীতে এই ঘটনার কোন প্রভাব নাই। রমা নানা উপায়ে—এমন কি শত্রুতার মধ্য দিয়াও—নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু রমেশের মন রহিয়াছে ইস্কুল করিতে, রাস্তা বাঁধাইতে, জল নিকাশ করিতে, এই সকল গুরুতর কর্তব্যের চাপে তাহার মনের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কি ইহা লইয়া মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত'র প্রথম তিনপর্ব, 'দেনাপাওনা', 'চরিত্রহীন'—ইহাদের কথা মনে হইবে। কিন্তু 'বিপ্রদাস' যে শরৎচন্দ্রের নিকৃষ্টতম রচনা, এই বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ কম। প্রাচীন আচারপন্থীর নিষ্ঠা ও চরিত্রগৌরবের চিত্র আঁকা হইয়াছে বিপ্রদাসের মধ্যে। কিন্তু ইহার আর্ট অতি অপকৃষ্ট। উপন্যাসের প্রথম অংশে বিপ্রদাস ও দ্বিজদাসের মধ্যে সংঘর্ষের আভাস আছে। কিন্তু এই আভাস অর্থহীন, কারণ দ্বিজদাস তাহার দাদা ও বৌদিদির অন্ধ স্তাবক; যে অ্যারিস্টক্র্যাটদের উপাসক, সে হইবে প্রজাবিদ্রোহের নেতা, ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কি হইতে পারে? ইহার পর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল বন্দনা। ভগিনীগৃহে বন্দনা যে আপ্যায়ন পাইল তাহা খুব মুখরোচক নহে। ষ্টেশনে মাতাল সাহেবদের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ করিয়া বিপ্রদাস তরুণীর

প্রশংসা আকর্ষণ করিল, কিন্তু বাহুবল ও তজ্জনিত সাহস মনুষ্য-চরিত্রের গৌণ উপাদান। কলিকাতার বাড়ীতে যাইয়া বিপ্রদাস অতিথিদের সঙ্গে একত্রে আহার করিল না, হোটেল হইতে সাহেবী খানা আনাইয়া তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিল। ইহাকে উপযুক্ত অতিথিসৎকার বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে চরিত্রের ঔদার্য বলিয়া কল্পনা করার মত ভুল আর কি হইতে পারে? আচারের যৌক্তিকতা লইয়া বন্দনা দুই একবার প্রশ্ন তুলিয়াছে; বিপ্রদাস সেই সব প্রশ্ন স্মিতহাস্যে এড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহার মাতার দোহাই দিয়াছে। এই সব বিষয়ে দয়াময়ী যে ব্যবহার করিযাছেন তাহার মধ্যে যথেষ্ট রূঢ়তা আছে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিপ্রদাস বলিয়াছে তাহার মায়ের আচারনিষ্ঠার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা নাই। অন্ধবিশ্বাস যুক্তি নহে, তাহা মনের প্রসারেরও পরিচয় দেয় না। আব বন্দনা যে বিপ্রদাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা তাহার যুক্তির জন্য নহে, কার্য-কলাপের জন্যও ততটা নহে, যতটা তাহার ধ্যানরত মূর্তির প্রোজ্জ্বল মহিমা দেখিয়া। মনে হয় শরৎচন্দ্র নারীর সহজ বিশ্বাসপরায়ণতা লইয়া বিদ্রূপ কবিতেছেন। বিপ্রদাস প্রাচীন আচাবে নিষ্ঠাবান্, কিন্তু শিক্ষিতা, তরুণী কুমারীর প্রণয়নিবেদন শুনিতে তাহার রুচিতে বাধে না এবং নির্জন গৃহে সেই রমণীব সপ্রশংস সেবা গ্রহণ করিয়া সে অতি-আধুনিকতার পরিচয়ও দিয়াছে। বিপ্রদাস ও বন্দনার ব্যাপারটি অতিশয় কুৎসিত; ইহা শুধু নীতিবিরুদ্ধ নহে, রুচিবিগর্হিতও বটে।

বিপ্রদাসেব মাতৃভক্তি ও দয়াময়ীয় পুত্রস্নেহের যে চিত্র উপন্যাসের প্রথম অংশে দেওয়া হইয়াছে, তাহার আতিশয্য কৌতুকাবহ। অথচ এই দীর্ঘকাল-স্থায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল, যে দিন বিপ্রদাসের সঙ্গে তাহাব ভগিনীপতির কলহ হইল। শশাঙ্কমোহন বিপ্রদাসের সঙ্গে শঠতা করিয়াছিল। অর্থনাশের ফলে দেখা গেল যে, যে প্রশান্ত নির্লিপ্ততা বিপ্রদাসের চরিত্রেব প্রধান গুণ তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। বাহিরের স্মিতহাস্যের আবরণের অভ্যন্তরে যে মন রহিয়াছে তাহা অর্থদণ্ডে সহজেই বিচলিত হয, তাহা ক্ষমা করিতে জানে না, সামঞ্জস্য করিতে পারে না। এমন কি, উপন্যাসেব উপসংহারে সন্দেহ হয় যে, পূর্বাংশে যে অ্যারিস্টক্র্যাটের চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে, শেষের অংশ তাহাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই রচিত হইয়াছে। এই উপন্যাস প্রথম হইতেই হইয়াছে অন্তঃসারশূন্য। ইহাকে হঠাৎ জাঁকাল করিয়া শেষ করিবার জন্য শশাঙ্ককে আনা হইল; তাহার সঙ্গে বিপ্রদাসের বন্ধুত্ব,

কল্যাণীর সঙ্গে বিবাহ, অর্থগ্রহণ ও বিশ্বাসঘাতকতা সবই এক নিঃশ্বাসে বর্ণিত হইল। তারপর তাহাকে আশ্রয় করিয়া এক তুমুল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল যাহার পরিসমাপ্তি হইল মাতাপুত্রের বিচ্ছেদে, সতীর মৃত্যুতে ও মাতাপুত্রের পুনর্মিলনে। ইহাতে চমৎকার উৎপাদন হইল বটে, কিন্তু এই পরিণতি গল্পের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নহে, এবং উপন্যাসের পূর্বাংশে দয়াময়ী ও বিপ্রদাসের স্নেহের আদান-প্রদানের যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছিল ইহার পর তাহাকে নিছক অভিনয় বলিয়া মনে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শরৎ-সাহিত্যে শিশু—ইন্দ্রনাথ

শিশুহৃদয়ের নিভৃততম কথার অভিব্যক্তি বর্তমান যুগের সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। বাঙলা সাহিত্যেও এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শিশুচিত্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার 'ডাকঘর', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' প্রভৃতি এই প্রয়াসের নিদর্শন। শিশুমনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাকে শরৎচন্দ্র রূপ দিয়াছেন একাধিক গ্রন্থে। এই প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রেই পর্যবসিত হইয়া যায় নাই। ইঁহাদের পরে বাঙলা দেশে যে-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। 'পথের পাঁচালী'র অপু অপূর্ব সৃষ্টি।

শিশুচিত্তের নির্লিপ্ততা, সুদূরের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির ও রূপকথার সঙ্গে তাহার সংযোগ—রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া ইহারই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যেখানে শিশু খুব সাধারণ জিনিষ চাহিয়াছে, সেইখানেও দেখিতে পাই সামান্যের মধ্য দিয়া শিশুচিত্ত বিস্তীর্ণের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। 'পথের পাঁচালী'তে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার পল্লীর চিত্র আঁকিয়াছেন; এই চিত্র অপুকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিলেও, অপুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপু অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য অপুর প্রবর্ধমান মন, শিশুর কৌতূহল, তাহার বিস্ময়—ইহার চিত্রও মনোরম হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র শিশুমনের অন্তরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার বিচিত্র প্রবৃত্তিকে বিচিত্র রূপ দিয়াছেন। শিশুহৃদয়ের যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথমে তাঁহার

চোখে পড়িয়াছে, তাহা হইতেছে তাহার তন্ময়তা। শিশু তাহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের মধ্যে এমনভাবে নিমগ্ন আছে যে, বাহিরের কোন বিষয় তাহাকে আকৃষ্টই করিতে পারে না।) বিজয়ার মনের কথা ছিল অপ্রকাশ্য, বয়স্কদের কাছে কোন কথা বলিতে পারিত না বলিয়াই সে মাঝে মাঝে পরেশের সাহায্য লইত। প্রলোভন দেখাইয়া পরেশকে সে নিজের কাজে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পরেশের কাছে উপলক্ষ্যই মুখ্য হইয়া গিয়াছে। বিজয়া নরেন্দ্রনাথের সংবাদ লইতে তাহাকে পাঠাইয়াছিল দুই পয়সার বাতাসা কিনিবার অজুহাতে, কিন্তু এই বাতাসা কেনাই তাহার কাছে এত প্রধান হইয়া গেল, ইহার মধ্যে সে এমন তন্ময় হইয়া পড়িল যে, অপরদিকে বিজয়া যে কি লইয়া তন্ময় হইয়া রহিয়াছে তাহার কোন সংবাদই সে রাখিল না। আর একবার ইঞ্জিনের বেগে বাহিত হইয়া মাঠ বাহিয়া সে নরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু হংস নাটাই পাইবার লোভে। নাটাই পূর্বে পাইলে সে নিশ্চয়ই ঘুড়ি উড়াইতে যাইয়া নরেন্দ্রনাথের কথা ভুলিয়া যাইত। রামের প্রিয় দুই রোহিত মৎস্যের মধ্যে কোনটা কার্তিক, কোন্‌টা গণেশ, ইহা অন্য কেহই বলিতে পারিত না, এমন কি তাহার একান্ত অনুগত ভোলাও নহে। কিন্তু রাম ইহাদিগকে ঠিক চিনিত, কারণ ইহাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সে তন্ময় হইয়া থাকিত। যেমন করিয়া জ্যোতির্বিদ নিবিষ্টচিত্তে দুইটি নক্ষত্রের বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে, আপাতদৃষ্টিতে যে সব পদার্থ একজাতীয় বৈজ্ঞানিক যেমন করিয়া তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করে, রাম তেমনি করিয়া এই দুইটি মৎস্যের লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়াছে। আমাদের কাছে মৎস্য ভক্ষ্য বস্তু, দুইটি মৎস্যের প্রভেদ যদি কিছু থাকে তাহা স্বাদের বা মাপের। রামের নিকট কার্তিক ও গণেশ পরম আত্মীয় অথচ পরম বিস্ময়ের বস্তু, তাই তাহাদিগকে সে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছে।

এইখানে শিশুচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে। (শিশুর কার্যকলাপের সঙ্গে পরিণতবয়স্ক লোকের কারবারের পার্থক্য আছে, আবার মৌলিক সঙ্গতিও আছে। শিশুর চিন্তাধারা পরিণত লোকের চিন্তাধারার মত, কেবল তাহার পথ বিভিন্ন। শিশুর অনুভূতিগুলি বয়স্ক মানবের অনুভূতির মতই, শুধু তাহার বিষয়গুলি আমাদের কাছে তুচ্ছ।) পরেশকে যখন বিজয়া নরেন্দ্রনাথের সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছিল, তখন তাহারা উভয়েই তন্ময় হইয়াছিল, কিন্তু তন্ময়তার কারণ এক নহে। রমেশের স্ত্রী শৈল ও হরিশের স্ত্রী নয়নতারা কলহ করিত টাকাকড়ি লইয়া, সংসারের প্রভুত্ব লইয়া। বাড়ীর

ছেলেরাও ঝগড়া করিত, কিন্তু তাহাদের লক্ষ্য বড়মার বিছানায় শোওয়া। বীরত্বের প্রশংসা করা মানুষের ধর্ম; শ্রীকান্ত বড় হইয়া আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন প্রভৃতির শৌর্যের প্রশংসা করিয়া থাকিবে, কিন্তু শৈশবে তাহার চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছিল সেই বীরের শক্তিতে যে ষ্টেজের উপর শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে অপর পক্ষকে পরাস্তও করিয়াছিল। শিশু সব জিনিষকেই সরল অকপট চিত্তে দেখে, তাই সে ষ্টেজের বীরত্বের তুচ্ছতা, সারহীনতা বুঝিতে পারে না। শিশুর সম্ভ্রমবোধ ও আত্মাভিমান বয়স্কলোকদের অপেক্ষা ক্ষীণ নহে, যদিও তাহার অভিব্যক্তি হয় খুব নগণ্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া। পাঁজিতে যে লেখা আছে যে, মঙ্গলবার অশ্বত্থ গাছ পুঁতিতে নাই, এবং মঙ্গলবার দিন যে পাঁজি দেখিতে নাই একথা রাম কিছুতেই মানিতে চাহিল না; কিন্তু যখন শোনা গেল যে, ভোলাও ইহা জানে তখন ইহা লইয়া সে আর কোন বাগ্‌বিতণ্ডা করিল না, কারণ ভোলার কাছে তাহার অজ্ঞতা ধরা পড়িবে, ইহার সম্ভাবনা সে সহ্য করিতে পারে না। প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইলে, মানুষের মনে নানাপ্রকারের ভাবের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া হয়—আত্মাভিমান, অনুশোচনা, লজ্জা, ক্ষোভ, বিরক্তি, এম্‌নি কত কি। তখন প্রত্যেকেই মনে মনে বিগত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে এবং নানাদিক্ হইতে একটি ব্যাপারকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে; এই পর্যালোচনার মধ্যে অনেক মিথ্যা, অনেক স্তোকবাক্য, অনেক যুক্তিহীন তর্ক মিশিয়া যায়। বৌদিদিকে কাঁচা পিয়ারা দিয়া আঘাত করার পর তাহার যে ভীষণ পরিণতি হইল, তাহাতে রাম প্রথমটা অভিভূত হইয়া গেল। একটু পরেই এই ব্যাপারটা সে নানাভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিল। তাহার যুক্তি সবল, যে মিথ্যার দ্বারা সে নিজেকে ও পরকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট; তাহার অভিমানও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তবু তাহার মনে নানাভাবের সেই অভিনয়ই হইয়া গেল, যে অভিনয় পরিণত-বয়স্ক লোকের মনে অনুরূপ অবস্থায় হইয়া থাকে। শুধু শিশুর মনে ভাবের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় তাহা স্বচ্ছ ও ঋজু; এবং সেই সারল্যই শিশুজীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যে মহত্ত্বের আলোকসম্পাত করে।

রামের চরিত্রে শিশুর আর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার চঞ্চলতা। শিশু কোন জিনিষকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। তাহার উন্মুক্ত মন কোন কিছুরই দাসত্ব করে না; আবার যাহা একবার ধরে তাহার মধ্যেই ক্ষণেকের জন্য একেবারে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ক্ষণিকতা ও তন্ময়তার অপূর্ব সম্মিলন শিশুচরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। রাম কখনও পরের বাড়ীর শশা

কাটিতেছে, কখনও অশ্বত্থ গাছ পুঁতিতেছে আবার তন্মুহূর্তেই তাহার কথা ভুলিয়া কাঁচা পিয়ারা পাড়িতেছে। স্কুলে যাইয়া রক্ষাকালীর ও শ্মশানকালীর জিভের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা লইয়া মারামারি করিয়াছে, তৎপরই সে-কথা বিস্মৃত হইয়াছে। রামলালের জীবনের যে কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন সংস্রব নাই; বৌদিদির কাছে সে এক সময় যাহা অঙ্গীকার করিতেছে পরমুহূর্তে তাহারই বিরুদ্ধতা করিতেছে, বিরুদ্ধতা করিয়াই পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছে এবং অনতিকাল পরে তাহা ভাঙিতেছে। গল্পের শেষভাগে দেখি রাম অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছে যে, তাহার সুমতি হইয়াছে এবং সে আর গোল বাধাইবে না। আমার বিশ্বাস, এই প্রতিজ্ঞা অন্য প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। যতদিন রামের বালসুলভ চপলতা থাকিবে ততদিন সে শান্ত, সুবোধ হইতে পারিবে না।

শিশুর এই চিরচঞ্চলতার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে তাহার অবাধ উন্মুক্ততা। রামকে কড়া শাসনে শৃঙ্খলিত করিবার বহু চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বাধীনচারী মন সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া আপনার উন্মুক্ততা ঘোষণা করিয়াছে। মুক্তি যে শিশুর কাছে কত বড় জিনিষ তাহার খুব একটি ছোট অথচ অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই 'শ্রীকান্ত'র প্রথম পর্বে। মেজদা'র শাসন ও অত্যাচার হইতে মুক্তির সংবাদ পাইয়া ছোড়দা' ও যতীনদা' আনন্দের উল্লাসে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই স্বাধীনতা অর্জনে যতীনদা'র হাত থাকায় ছোড়দা' তাহাকে সেই কলের লাটিমটি অনায়াসে দান করিয়া ফেলিল, যাহা পূর্ব মুহূর্তে সে বিশ্বসংসারের পরিবর্তেও দিতে প্রস্তুত হইত না।

(২)

ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অপরূপ সৃষ্টি। তাহাকে ঠিক শিশু বলা যায় কিনা সন্দেহ। শ্রীকান্তের সঙ্গে তাহার যখন পরিচয় হইল তখন সে শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু তবু তাহার মধ্যে যে সকল বৃত্তি সমধিক বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেগুলি বিশেষভাবে শৈশবসুলভ; পরিণত বয়সের পরিপক্বতা তাহাদের মধ্যে নাই। শিশুহৃদয়ের সাহস, নির্লিপ্ততা, চঞ্চলতা, পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের যত চিত্র আছে তন্মধ্যে ইন্দ্রনাথ অতুলনীয় এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক ব্যারির পিটার প্যানের কথা এই সম্পর্কে মনে আসিতে পারে। কিন্তু পিটার প্যানের জন্য ব্যারি যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা রূপকথার ইন্দ্রজালে ঘেরা। তাহার ঐশ্বর্য অবিসংবাদিত; তাহার সাঙ্কেতিকতা কল্পনাকে দোলা দেয়। তবু বস্তুজগতের

সঙ্গে তাহার সংস্রব ক্ষীণ এবং তাহার রূপে আমরা মুগ্ধ হইলেও আঁমাদের সন্দেহপরায়ণ বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রূপকথার রাজ্যে বাস করে না, সে ইঙ্গিতের সাহায্যে আমাদিগকে চকিত করে না। তাহার কারবার কঠিন বাস্তবের সঙ্গে। অথচ ইন্দ্রনাথের কার্যকলাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের এমন একটা ছাপ আছে যাহা অতিমানবের আচরণে পাওয়া যায়; কোন সময়ই তাহাকে আপামর সাধারণের গণ্ডিভুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না। রোমান্সের ধর্ম এই যে যাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে; ইন্দ্রনাথের সব কিছুই বিস্ময়কর। তাহার কাহিনীতে বাস্তবের প্রত্যক্ষতা আছে; আবার রোমান্সের পরমাশ্চর্যময় সুদৃঢ়তাও আছে।

ইন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্যটি সর্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে এই যে, সে একজন সত্যিকার মহামানব। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সে পড়িয়াছে; খেলার মাঠে মারামারি, গঙ্গার উজান বাহিয়া মাছ চুরি, জেলেদের সতর্কতার মধ্য দিয়া মাছ লইয়া পলায়ন, সাপ, বুনো শূয়ার প্রভৃতি বন্যজন্তুসঙ্কুল পথে সঞ্চরণ—ইহা তাহার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অঙ্গ। সমস্ত বিপদের উপর দিয়া সে তাহার বিজয়কেতন উড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে; জীবন-সংগ্রামে উপদ্রুত, ক্ষতবিক্ষত, পরাজিত মানবের পক্ষে তাহার সহজ শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার অনির্বাণ পরোপচিকীর্ষা, তাহাব অম্লান তেজস্বিতা লোভেব বস্তু, স্বপ্নের সামগ্রী। ইন্দ্রনাথ কঠিন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিযাছে, কিন্তু সে এম্‌নি সহজে, এম্‌নি অনায়াসে বিপদের মধ্য দিয়া অক্ষত অবস্থায বাহির হইয়া গিয়াছে যে মনে হয় যাহা অপরের কাছে প্রতিকূল, তাহার কাছে তাহাই অনুকূল; যে পথকে অপরে কণ্টকাকীর্ণ মনে করিবে, সেই পথই তাহার পক্ষে কুসুমাস্তীর্ণ। মাছ চুরি করিয়া ফিরিবার সময় জেলেরা আক্রমণ কবিলে খরস্রোতা গঙ্গার বক্ষে আত্মরক্ষা করিবার সহজ উপায় তাহাব জানা ছিল এবং তাহাই অতি সরল, সহজ ভাবে শ্রীকান্তকে সে বুঝাইয়াছিল, "আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা। ত্যাখ্ শ্রীকান্ত, কিছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে—কিন্তু যদি দেখিস্ ঘিরে ফেল্‌লে ব'লে—আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ করে লাফিয়ে প'ড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হলো। এই অন্ধকাবে আর দেখ্‌বার জোটি নেই—তারপর সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস্।" শ্রীকান্ত এই প্রস্তাবে বিস্মিত, অভিভূত হইয়াছে, কিন্তু ইন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা পরম উপভোগ্য অভিযান।

ইন্দ্রনাথের চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ তাহার নিঃশঙ্ক সাহস। আর এই সাহসই

শিশুচরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষ ভয় করিতে সুরু করে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে শিখিয়া, লাভ ক্ষতির সম্ভাবনা পরিমাপ করিতে আরম্ভ করিয়া। শিশুর এই বালাই নাই, লাভলোকসান সম্পর্কে সে নির্লিপ্ত। সুতরাং বিপদকে সে বিপদ বলিয়া মনে করে না, অনিশ্চিতকে সন্দেহ করিয়া সে সাবধান হয় না, বরং অনিশ্চিত সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া সে তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে অগ্রসর হয়। বেকন বলিয়াছেন, মানুষের মৃত্যুভয় শিশুর অন্ধকারভীতির অনুরূপ। পরিণত বয়সে মৃত্যুভয় স্বাভাবিক কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু শিশুর অন্ধকারভীতি যে তাহার সহজাত বৃত্তি নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অজ্ঞানা অন্ধকারের মধ্যে কি আছে, ইহা জানিতে তাহার অদম্য কৌতূহল এবং এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করা হয় ভূতের গল্পের দ্বারা, জুজুর ভয় দেখাইয়া। জুজু কি সে জানে না, ভূত সে দেখে নাই, কিন্তু ইহাদের সম্পর্কে সে যে গল্প শুনিয়াছে তাহা হইতে এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, অন্ধকারে বাহির হওয়া নিরাপদ নহে, অজ্ঞাত রাজ্যে যাহারা বাস করে তাহারা মানুষের পক্ষে অনুকূল নহে। ইন্দ্রনাথের মন এই সংস্কার ও মিথ্যা শিক্ষার দ্বারা পঙ্গু হয় নাই। তাই সে কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করে না, কোন অবস্থাবিপর্যয়ে সে সঙ্কুচিত হয় না। শ্মশানের পাশ দিয়া গভীর রাত্রিতে অনায়াসে সে নৌকা চালাইয়া লইয়া যায়, জেলেরা সন্ধান পাইয়াছে মনে করিলে ভুট্টাগাছের মধ্যে লুকায়, সেইখান হইতে ঠেলিয়া নৌকা বাহির করিতে অবলীলাক্রমে নামিয়া পড়ে, কারণ অদূরে নিতান্ত নিরীহ বুনো শূয়ার-টুয়ার এবং অতি নিকটে কিছু না—সাপ। গঙ্গার জল আবর্ত রচিয়া ভীম বেগে চলিতেছে, বালুর পাড় ভাঙিয়া পড়িতেছে, যদি জেলেরা ধরিয়াই ফেলে তাহা হইলেও ভয়ের কোন কারণ নাই, ৬।৭ ক্রোশ ভাসিয়া গেলেই চলিবে। নতুনদা' যত অন্যায়ই করুক, যে বাঘ তাহাকে লইয়া গিয়াছে সেই বাঘকে আক্রমণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে নতুনদা'কে রক্ষা করিতে হইবে। ইহা অক্ষমের আস্ফালন নহে, ক্ষুব্ধের আকাশ-কুসুম নহে, ইহা বীরের সহজ, সবল সঙ্কল্প। অশান্ত প্রকৃতি ও হিংস্র জানোয়ারের সম্মুখীন হইতে যে অণুমাত্র বিচলিত হয় না, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার কাছে নগণ্য হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? উন্মত্ত শাহজী বর্শা দিয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছিল, ফুটবল ম্যাচের মাঝামাঝিতে বিপক্ষীয় ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলে সে সহজে নিষ্কৃতি পাইত না। ক্ষিপ্র-গতিতে সে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে সে প্রশান্ত, অবিচলিত, আত্মরক্ষা অপেক্ষা অপরের রক্ষার প্রতিই তাহার বেশী দৃষ্টি।

বড় বড় ব্যাপার অপেক্ষা তুচ্ছ ব্যাপারেই অনেক সময় মানুষের খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায়। খেলার মাঠে, শাহ্‌জীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে ও মাছ ধরিবার অভিযানে সাহসের প্রয়োজন ছিল; এই সব কার্যে সাহস না দেখাইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইত না অথবা বিপক্ষীয়ের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করা যাইত না। ছিদাম বহুরূপীর কাহিনীটি কৌতুকাবহ; কিন্তু ইহার মধ্যে ইন্দ্রনাথের সাহসের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথ রাত্রিতেও চলাফেরা করিত গোঁসাই বাগানের মধ্য দিয়া। এই জঙ্গল সর্পব্যাঘ্রসঙ্কুল, এই পথ দিয়া রাত্রিতে আসার প্রয়োজনও ছিল না; কিন্তু এইটে সোজা পথ; কাজেই সে এই পথেই যাতায়াত করিত যদিও সাপ বাঘের ভয়ে এই পথে অন্য কেহ বাহির হইতে সাহস পাইত না। একদিন রাত্রিতে শ্রীকান্তের বাড়ীতে এক হৈ হৈ ব্যাপার, উঠানের কোণে ডালিমতলায় এক বিরাট্ জানোয়ার—কেহ বলে বাঘ, কেহ বলে ভল্লুক, কেহ বলে দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ভয়ে সকলে অস্থির, ছেলে, বুড়ো, দরওয়ান, মনিব—সবাই আতঙ্কে চীৎকার করিতেছে, কেহ রক্ষা পাইবার পথ দেখিতেছে না। এমন সময় ইন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল; সমস্ত ব্যাপারটা শোনার পর তাহার মনে শুধু কৌতূহলের উদ্রেক হইল। সে পলাইল না, মেয়েদের আর্তনাদে বিচলিত হইল না, পুরুষদের চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে ধীর শান্তভাবে খোঁজ করিতে গেল ডালিমগাছের কোণে কি আছে এবং খুব শান্ত, সংযত ভাবে তাহার অনুমান ব্যক্ত করিল। 'ছিদাম বহুরূপী'কে আবিষ্কার করিবার পূর্বে যে ভয়ার্ত কলরব হইয়াছিল তাহার সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব ছিল না, পরে যে উল্লসিত কোলাহল উঠিল তাহাতেও সে যোগদান করিল না। সে যে শুধু নির্ভীক তাহাই নহে, সে নির্লিপ্ত। তাহার এই নির্লিপ্ত নির্ভীকতার মূলে ছিল তাহার সহজ, সরল জ্ঞান—মরিতে তো একদিন হইবেই। এই জ্ঞান সে দর্শনশাস্ত্র হইতে পায় নাই, ইহা তাহার অভিজ্ঞতার ও আন্তরিক অনুভূতির ফল। ইহা তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। বারংবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সে ইহাকে সহজ করিয়া লইয়াছে, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে সে ফাঁকি দিতে চাহে নাই। তাই তাহার বীরত্বের মধ্যে আস্ফালন নাই, আড়ম্বর নাই; ইহার মধ্যে রহিয়াছে শিশুসুলভ নিঃশঙ্কতা ও শিশুসুলভ সরলতা।

ইন্দ্রনাথের সাহস তাহার চরিত্রের প্রধান গুণ, কিন্তু সে শুধু সাহসের প্রতীক নহে। যদি সে একটিমাত্র গুণের আধারই হইত, তাহা হইলে তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ মানবতার অভাব হইত। শিশুর নির্ভীকতা, নির্লিপ্ততার সঙ্গে জড়াইয়া আছে তাহার সরল, সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা। ইন্দ্রনাথ ভয়হীন, কিন্তু

শিশুসুলভ বহু অন্ধবিশ্বাসও তাহার আছে। শাহ্‌জীর সমস্ত আজগুবি গল্পে সে বিশ্বাস করিত, সাপুড়ের মন্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার আগ্রহের সীমা নাই, যে বিষপাথরে তিনদিনের মরা বাচান যায় তাহা আয়ত্ত করিয়া লইবার জন্য শাহ্‌জী ও অন্নদাদিদিকে সে বহু অনুরোধ, উপরোধ করিয়াছে। তাহার ধারণা কালী প্রত্যক্ষ দেবতা, তাহাকে ভরাফুল দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সমস্ত বিপদ—গুরুজনের ভর্ৎসনা এমন কি শারীরিক অসুস্থতা—হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যে মহামানব নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কোন বিপদ্‌কেই তৃণাধিক জ্ঞান করে নাই, তাহার হৃদয়ে নিঃশব্দ আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে এই সহজ সরল বিশ্বাসের ধারা প্রবাহিত হইত। বহু কষ্টে, বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সে মাছ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, কোন পার্থিব বিপত্তি তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই, কিন্তু অপার্থিব ভূতপ্রেত সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তবে একটি ভরসা এই যে, যদিও তাহারা বহুরূপী তবু তাহারা নিজেরা মাছ তুলিয়া লইতে পারে না। অন্ধ বিশ্বাস মানুষের আত্মনির্ভরশীলতাকে দুর্বল করে, কিন্তু ইন্দ্রনাথের মন তাহার যুক্তিহীন বিশ্বাসের দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই। তিনবার রামনাম করিলে ভয় থাকে না—ইহা খুব সবল সংস্কার, কিন্তু ভয় করিয়া রামনাম করিলে রক্ষা হয় না, কারণ তাহারা টের পায়। এই সবল সংস্কার তাহার চিত্তকে দুর্বল তো করেই নাই বরং তাহার স্বাভাবিক শক্তিকে বিশ্বাসের অবলম্বন দিয়া সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ নির্ভীক, নির্লিপ্ত, কিন্তু সর্বোপরি সে পরোপচিকীর্ষু। পরোপচিকীর্ষায় তাহার চরিত্রের যে দৃঢ় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যে কোন লোকের পক্ষেই বিস্ময়কর। তরুণের চিত্তে পরের উপকার করিবার ক্ষণিক উত্তেজনা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে সতেজ ও সক্রিয় রাখিতে ইন্দ্রনাথ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা চপলমতি শিশুর নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। মৎস্য ধরিতে সে বিরাট অভিযান করিয়াছে, বিপদ্‌সঙ্কুল পথ বাহিয়া চৌর্যের পর্যন্ত আশ্রয় লইয়াছে। ইহাতে তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই, বিপদ্‌কে সে ভয় করে না, বিপদের সম্মুখীন হইতে সে বিচলিত হয় না, অথচ নিজের জন্য বিপদ্ বরণ করিতে সে কোন আগ্রহ দেখায় নাই। দারিদ্র্যনিপীড়িতা, শ্রদ্ধাস্পদ অন্নদাদিদিকে সাহায্য করিতে, ঘৃণিত-চরিত্র নতুনদা'কে রক্ষা করিতে, অসহায় বালককে অত্যাচারীর হাত হইতে ত্রাণ করিতে, প্রতিবেশীর বাড়ীর লোকদিগকে নেকড়েবাঘের উৎপাত হইতে মুক্ত করিতে—সে অম্লানবদনে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

তাহার কার্যকলাপ অবিমৃষ্যকারিতায় ভরা, কিন্তু দুঃসাহসিক অবিমৃষ্যকারিতার পশ্চাতে রহিয়াছে সুগভীর পরোপচিকীর্ষা, যাহা কিছু সে করিয়াছে তাহার সঙ্গেই পরের মঙ্গল জড়িত হইয়া আছে। সে সৈনিক নহে, দরিদ্রের সন্তান নহে। বিপদ বরণ করা, অর্থের জন্য কায়ক্লেশ সহ্য করা তাহার দৈনন্দিনের প্রয়োজন নহে। অথচ যেখানে পরের কষ্ট দেখিয়াছে, সেইখানেই তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া সে বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

ইন্দ্রনাথের পরোপচিকীর্ষা এত বিশ্বব্যাপী যে, ইহা শুধু জীবিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, অজানা শিশুর ভাসমান মৃতদেহও তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। সেই শিশুটিকে বন্য শৃগাল প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া সস্নেহে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছে আবার তেমনি সস্নেহে জলের উপর শোয়াইয়া দিয়াছে। সদ্যমৃত শিশুকে দেখিয়া তাহার বলিষ্ঠ হৃদয় স্নেহে, করুণায় দ্রবীভূত হইয়াছে, যে অভিযান হইতে সে সাপ, বুনো শুয়ার, ততোধিক হিংস্র জেলে প্রভৃতির ভয়ে নিরস্ত হয় নাই, তাহার প্রতিও ক্ষণেকের জন্য স্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। এইখানেও আবার শিশুসুলভ অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় পাই। ইন্দ্রের ধারণা ঐ মৃতদেহটিকে জলে শোয়াইয়া দেওয়ার সময় সে 'ভেইয়া' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার প্রেতাত্মা ঠিক পিছনেই বসিয়া ছিল। ইন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার মধ্যে মহামানবের বলিষ্ঠতা ও শিশুর চঞ্চলতা ও সারল্য একই সময়ে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। কালীর জবাফুলে আসক্তি, রামনামের মাহাত্ম্য, ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব—হিন্দুর সমস্ত সংস্কারেই তাহার অচল বিশ্বাস। অথচ যখন তাহার পরোপচিকীর্ষা জাগিয়া উঠে তখন সে অতি সহজে এই সব সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে। যে মৃতদেহ সে তুলিয়া লইল তাহা কোন ছোট জাতীয় লোকের হইতে পারে, এই বলিয়া শ্রীকান্ত আপত্তি তুলিয়াছিল, কিন্তু অমনি ইন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, "আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে? আমগাছ জামগাছ যে কাঠেরই তৈরী হোক—এখন ডিঙি ছাড়া আর কেউ বল্‌বে না আমগাছ জামগাছ—বুঝ্‌লি না? এও তেমনি।" তাহার যুক্তির মধ্যে শিশুর সরলতা, অকপটতা, ও তর্কশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার চিহ্ন আছে, কিন্তু তৎসঙ্গে সত্যের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবার যে অনায়াসলব্ধ শক্তির পরিচয় আছে তাহা শুধু মহামানবেরই সম্ভব। অন্নদাদিদির সঙ্গে সংস্রবের মধ্যেও শৈশবোচিত চঞ্চলতা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া উঠিয়াছে। সে অন্নদাদিদিকে গভীরভাবে ভালবাসে, তাহার জন্য যে

কোন কষ্ট করিতে প্রস্তুত আছে, অথচ সামান্য কারণে সে শিশুর মত রাগিয়া উঠে। অন্নদাদিদির গোপন ইতিহাস সম্পর্কে সে শিশুর মতই অজ্ঞ। তাহার দিদি মুসলমান, ইহা তাহার ভাল লাগে নাই, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ইহা লইয়া সে দিদিকে গালি দিয়াছে। অথচ কেমন করিয়া সে ইহাও অনুভব করিয়াছে যে যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে তাহাই একমাত্র সত্য নহে, ইহার অন্তরালে গভীরতর রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার অনুভূতির এই অস্পষ্টতাও একান্তভাবে শিশুসুলভ। অন্নদাদিদিকে সে যে কত ভালবাসিয়াছে তাহা সে জানিত না। তাই যখন তখন রাগিয়া উঠিয়া শাহ্‌জী ও দিদিকে সে গালাগালি দিয়াছে, সাপের মন্ত্র, শিকড় ও বিষপাথরের বিষয়ে সত্য কথা জানিতে পারায় তাহার বহুদিনের আশা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং এই আশাভঙ্গে সে শিশুর মত রাগিয়া উঠিয়াছে। দিদির স্বীকারোক্তির অন্তরালে যে কতখানি বেদনা, সত্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ ছিল তাহা না বুঝিয়া সে তাহাকে অজস্র কটূক্তি করিয়াছে, ক্ষণেক পরেই দিদির পক্ষ লইয়া শাহ্‌জীর সঙ্গে মারামারি করিয়াছে, কিন্তু শাহজীর প্রতি দিদির পক্ষপাতিত্ব সন্দেহ করিয়া আবার রাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার হৃদয়ের স্বচ্ছতা, সরলতা ও বলিষ্ঠতা, তাহার অভিজ্ঞতা অথচ সত্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার সহজ ক্ষমতা—তাহার সবল প্রবৃত্তিই অতিশয় বিস্ময়কর আবার একান্তভাবে শিশুসুলভ।

ইন্দ্রনাথের চরিত্রে বলিষ্ঠতা ও কোমলতা, দৃঢ়তা ও চঞ্চলতা, হৃদয়ের উদারতা ও বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতার যে সমাবেশ হইয়াছে তাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আর দুইটি আপাতবিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের যে সমন্বয় হইয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরের উপকার করিতে সে সদাজাগ্রত, তজ্জন্য যে কোন কষ্ট স্বীকার করিতে সদাপ্রস্তুত, অথচ নিজের সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেই যে হেডমাস্টারের পিঠের উপর অসম্ভ্রমসূচক কি একটা করিয়া ইস্কুল হইতে পলায়ন করিয়াছিল আর সেখানে যায় নাই। "এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে ইস্কুল হইতে রেলিং ডিঙাইয়া বাড়ী আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না।" কিন্তু সেইজন্য তাহার কোন আক্ষেপ নাই, সেইখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য আগ্রহ নাই। ("আর এমনি ভাবেই একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ী, বিষয়-আশয়, আত্মীয়স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গেল, আর আসিল না।") (এইখানেও আক্ষেপ নাই, বিজ্ঞাপন নাই, আড়ম্বর নাই। যে কয়দিন সে সমাজে, সংসারে ছিল, সেই কয়দিন বিজয়ী বীরের মত

সমস্ত প্রচলিত শিক্ষাসংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়াছে। যাহাদের সংস্রবে আসিয়াছে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে আবার তাহাদের প্রতি আকৃষ্টও হইয়াছে। কিন্তু যে দিন সে চলিয়া গেল, সেইদিন অতিথির মত নির্লিপ্তভাবে চলিয়া গেল, কোন বন্ধন, কোন প্রলোভন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমস্যার সন্ধানে

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ও 'শেষ প্রশ্ন' বাহির হওয়ার পর বহু তর্ক ও আলোচনা হইয়াছে। এই উপন্যাস দুইখানির সঙ্গে অপরাপর উপন্যাসের মৌলিক পার্থক্য আছে, কারণ ইহারা তর্কমূলক অর্থাৎ ইহাদের প্রধান বস্তু কোনও ঘটনা নহে; মনে হয় কতকগুলি মতের প্রচারই এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইব্‌সেনের আমল হইতে এই জাতীয় তর্কমূলক নাটক ও উপন্যাস ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে সাহিত্য হইতেছে রূপসৃষ্টি; মানুষের চরিত্র ও অনুভূতি লইয়াই তাহার কারবার; তর্ক ও আলোচনার প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতেছে দর্শন। আমাদের দেশে তর্কপ্রধান গল্প ও নাটক নাই বলিলেই চলে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতিতে আলোচনা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কবি নিজেই সেই আলোচনাকে মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহার বিশ্বাস প্রচার-মূলক সাহিত্য ক্ষণিক-সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, বর্তমানের অতীত নিত্যবস্তুর সন্ধান করে না।

শরৎচন্দ্র এই যুক্তি স্বীকার করেন নাই। প্রথমতঃ, তিনি মনে করেন যে প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যেই একটা নিহিত সমস্যা বা প্রব্লেম থাকেই। সে সমস্যা কাহিনীর সমস্যা, চরিত্রের সমস্যা এবং তাহার সঙ্গে থাকে অপর অনেক সমস্যা। সাহিত্যিকের কাজ হইতেছে সেই সব সমস্যাকে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করা এবং তাহাকে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দেওয়া। কখনও কখনও সাহিত্যিকেরা সমস্যাকে এড়াইয়া যান অথবা গোঁজামিল দিয়া তাহাকে চাপা দেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে লেডি ডাক্তারের অভ্যাগমে গল্পের সমস্যার অবসান হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ

শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে রামায়ণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সকল চিরস্মরণীয় রচনায় মতের প্রচার কোন না কোন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর তিনি ইহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে আর্টের একমাত্র কাজ চিত্তরঞ্জন করা তাহা হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে চিত্ত বস্তুটি পরিবর্তনশীল এবং একের চিত্ত অপরের চিত্তের অনুগামী নাও হইতে পারে। চিত্তের যে অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' রচনা করিয়াছিলেন সেই অবস্থায়ই তিনি 'আনন্দমঠ' বা 'দেবী চৌধুরাণী' রচনা করেন নাই। যে ব্যক্তির চিত্ত 'গোলেবকাওলি'তে অনুরক্ত তিনি বার্ণার্ড শ'র নাটকে পরিতৃপ্তি পাইবেন না।

তর্কমূলক বা সমস্যাপ্রধান উপন্যাস ও নাটক সাহিত্যের আসরে জায়গা জুড়িয়াছে ও জায়গা পাইয়াছে। তাই খাঁটি সাহিত্য কিনা ইহা লইয়া প্রশ্নের অবকাশ এখন আর তেমন নাই। এইখানে শুধু একটি কথা বলিলেই চলিবে। সাহিত্য স্রষ্টার মনের অভিব্যক্তি ; স্রষ্টার মন কখনও বিচারবুদ্ধিহীন হইতে পারে না। উদ্দেশ্যহীন অভিব্যক্তি উন্মত্তের প্রলাপ। শরৎচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন সাহিত্যে যাহা চিরস্মরণীয় হইয়াছে, যাহা শুধু রূপসৃষ্টির জন্যই রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহার অন্তরালেও মতবাদের আলোচনা প্রচ্ছন্ন থাকে। যে সমস্ত গল্প ও নাটক প্রচারমূলক তাহাদের মধ্যে তর্ক ও আলোচনা খুব প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠে—প্রচলিত সাহিত্যের সঙ্গে ইহাই তাহার একমাত্র প্রভেদ। তর্কমূলক সাহিত্যের একটি বিশেষ মাপকাঠি আছে তাহা এই : তর্ক ও আলোচনা রূপসৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না ; বরং তর্ক ও আলোচনার মধ্য দিয়াই বর্ণিত চরিত্রকে জীবন্ত হইয়া উঠিতে হইবে। 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্ন' এই দুই উপন্যাসের আলোচনা করিতে হইলে দেখিতে হইবে ইহারা তর্কমূলক সাহিত্যের এই অবশ্যস্বীকার্য শাসন মানিয়া চলিয়াছে কিনা।

(২)

'পথের দাবী'র একটি বৈশিষ্ট্যের উপরে প্রথমেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। শরৎচন্দ্র দার্শনিক ছিলেন না ; জীবনের চরম সত্য আবিষ্কার করা, বিশ্লেষণ করা, প্রমাণ করা, অপর পক্ষের যুক্তির বিচার করা তাঁহার কাজ নহে। তিনি সমস্যামূলক উপন্যাস লিখিলেও, সমস্যার সমাধান দিতে চেষ্টা করেন নাই। অথবা যদি চেষ্টা করিয়াই থাকেন তাহা হইলে সেই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনবেদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে কি না সন্দেহ। তিনি স্রষ্টা ; তিনি জীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন—কল্পনা ও অনুভূতির দ্বারা, তাহার মূল্য বিচার করেন নাই। কিন্তু কল্পনা ও অনুভূতি নীরেট পদার্থ নহে ; তাহারা

জীবনস্রোতেরই অঙ্গ; তাহারা বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নও নহে। সুতরাং কল্পনা ও অনুভূতি দিয়া যে চিত্র আঁকা যায় তাহার মধ্যে জীবনবেদের সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে এবং সেই সঙ্কেত হয়ত নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ হইতে সত্যতর। 'পথের দাবী' উপন্যাসে, বিশেষ করিয়া তাহার নামকরণে, শরৎচন্দ্রের জীবনবেদের সুস্পষ্টতম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ক্ষমাহীন, প্রীতিহীন সমাজ ও ধর্মের দ্বারা যে নারী লাঞ্ছিত ও উপদ্রুত হইয়াছে তাহার ভালবাসিবার অপরাজেয় অধিকারকে শরৎচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, এবং এই স্বীকৃতি চরমে পঁহুছিয়াছে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে, যেখানে একই নারীহৃদয়ে পরস্পরবিরোধী প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছে। নারীর এই অধিকারকে পথের দাবী বলিয়া অভিনন্দিত করা যাইতে পারে এবং এই পথের দাবীই শরৎসাহিত্যের গোড়ার কথা। 'পথের দাবী' রাজনৈতিক বিপ্লবের উপন্যাস, কিন্তু ইহার দ্যোতনা অতিশয় ব্যাপক। সমিতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে দেখি একটি রমণী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে চাহে; তাহার স্বামীর বন্ধু তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছে চিরাচরিত সতীত্বের দোহাই দিয়া। সমিতির সভানেত্রীর কাছে চিরাচরিত সতীত্বের কোন মূল্য নাই; সে নবতারার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পথের দাবীর স্রষ্টা সব্যসাচী বলিয়াছেন, "জীবনযাত্রায় মানুষের পথ চল্‌বার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র সেই সমস্ত সত্যটাই মানুষ যেন ভুলে গেছে। আপনারা অর্থাৎ দলের সভ্য যাঁরা তাঁরা নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান।" ভারতী বলিয়াছে, "আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চল্‌বার সর্বপ্রকার দাবী স্বীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙে-চুরে চল্‌বো। আমাদের পরে যারা আস্‌বে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে। তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ কর্‌তে পারে, এই আমাদের পণ।" এই যে পথ চলিবার অবাধ অধিকারের দাবী ইহাই শরৎচন্দ্র পার্বতী, রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; ইহাই রাজনৈতিক উপন্যাস ও সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে সংযোগ-সূত্র। 'পথের দাবী' রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের উপন্যাস, কিন্তু ইহার একটি তাৎপর্য আছে যাহা সামাজিক। অপূর্ব শুদ্ধাচারী বাঙালী ব্রাহ্মণ, ইহা তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি যাহা পথের দাবীর সভ্যরা অত্যন্ত সম্মান করিয়া চলে। কিন্তু এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের অতি নিষ্ঠাবান্ পাচকের জীবন-

রক্ষা হইয়াছে খ্রীষ্টান-ভারতীর হাতের জল খাইয়া। তারপর ভারতী অপূর্বকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে এবং ভারতীর প্রতিও অপূর্বর হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে। এই যে উভয়ের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ—ইহার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে অপূর্বর ধর্মবিশ্বাস। যদি প্রণয়ের পথের দাবীকে শিরোধার্য করিতে হয় তাহা হইলে অপূর্বর ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে সম্মান করা যায় না। অপূর্ব ও ভারতীর সমস্যার শেষ সমাধানের কোন চিত্র আঁকা হয় নাই, সামাজিক আচার ব্যক্তির পথকে কেমন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ করে শুধু তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই গ্রন্থকার উপন্যাসের যবনিকা টানিয়াছেন।

সামাজিক সমস্যার উল্লেখ থাকিলেও 'পথের দাবী' রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের উপন্যাস এবং সেইভাবেই ইহার বিচার করিতে হইবে। রাজনৈতিক বিপ্লবকে উপজীব্য করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বহু উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র নাম এই সম্পর্কে সর্বাগ্রে উদিত হইবে। আধুনিক ঔপন্যাসিকেরাও এই বিষয় লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের 'একদা'। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে 'চার-অধ্যায়' সর্বনিকৃষ্ট। বিভীষিকাপন্থায় মানুষের কিরূপ পতন হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার নায়কনায়িকারা এই পথে আসিয়াছে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় নহে; ব্যক্তিগত কারণে। কেহ কাকার সংসার হইতে পলাইতে চাহিয়াছে, কেহ ল্যাবরেটরীতে বিজ্ঞানচর্চা করিতে না পারিয়া ক্ষোভ মিটাইতে আসিয়াছে, কেহ প্রণয়ের আহ্বানে সাড়া দিতে যাইয়া গুপ্তসমিতিতে জড়াইয়া গিয়াছে। ইহারা কেহই খাঁটি দেশপ্রেমিক নহে। বিপ্লবীদের পন্থা যতই বিভীষিকাময় হউক তাহাদের প্রেরণা আসে স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা হইতে। রবীন্দ্রনাথ বিভীষিকাপন্থার স্বরূপ চিনিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার চিত্র হইয়াছে বিকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের দেশপ্রেমের জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু তিনি মহাপুরুষের মুখ দিয়া সত্যানন্দের সাধনার সঙ্কীর্ণতা প্রচার করিয়াছেন। মহাপুরুষ সত্যানন্দকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সঙ্কট মুহূর্তে তিনি কাহিনীতে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে তাঁহার সংযোগ নিবিড় নহে। গোপাল হালদারের অন্তর্দৃষ্টি অতিশয় গভীর; তিনি বিভীষিকাপন্থার অনিবার্য ব্যর্থতা ও অনতিক্রম্য আকর্ষণের চিত্র আঁকিয়াছেন একটি নায়ককে কেন্দ্র করিয়া। এই নায়ক সম্পূর্ণরূপে বিভীষিকাপন্থী নহে; অথচ ইহাকে

মূল্য দিতে সে জানে। তাহার অনুভূতিশীল হৃদয় ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিচারবুদ্ধির কাছে বিভীষিকাপন্থী বালক বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গরূপে প্রতিভাত হইযাছে।

শরৎচন্দ্র অন্য রীতি অবলম্বন কবিয়াছেন। বিভীষিকাপন্থার দুই দিক্ দেখাইবার জন্য তিনি দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনা করিযাছেন। এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র সব্যসাচী ভারতে ইংরেজ রাজত্বেব ও ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরোধী অনুভূতি ও মতও এই গ্রন্থেই সর্বাপেক্ষা জোরালো অভিব্যক্তি পাইয়াছে। সব্যসাচী অতিমানব বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন; তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার শক্তি কম, যে তাঁহার প্রবল প্রভাব অনুভব করিয়াছে, যে তাঁহাব প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মমতায় বিগলিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার হিংসার মন্ত্রকে শিরোধায করিতে পাবে নাই। সে ভারতী। এই গ্রন্থের নায়ক ডাক্তার, কিন্তু নাযিকা ভারতী। আব এই দুইটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা নাযক ও নাযিকার সম্বন্ধ নহে, নাযক ও প্রতি-নায়কের সম্পর্ক। ভাবতী 'পথেব দাবী'র সেক্রেটারী, কিন্তু ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া সে ইহার সংস্রব হইতে দূরে সরিযা গিয়াছে এবং বারংবার ডাক্তারকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, তাহার পথ পাপের পথ, ইহা কাহারও কোন কল্যাণ করিতে পারে না। ভারতী বলিযাছে, "তোমার পথের দাবীর ষড়যন্ত্রের বাষ্পে নিঃশ্বাস আমার রুদ্ধ হয়ে আসচে।" ডাক্তার যে কর্মধারা আবিষ্কার করিযাছেন তাহার সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার বিরুদ্ধে ভারতীর মন বিদ্রোহী হইয়াছে। সে অপ্রতিরোধনীয় কণ্ঠে দাবী করিয়াছে, "কিন্তু একথা আমি কিছুতেই মান্‌বোনা যে এ ছাড়া আব পথ নেই, মানুষের সমস্ত খোঁজাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজনেব মঙ্গলের জন্য আর একজনের অমঙ্গল করতেই হবে এ আমি কোন মতেই চরম সত্য বলে মনে নেবনা—তুমি বল্লেও না।" ভারতী দেখাইয়াছে যে নিছক যুক্তির দিক দিয়াও ডাক্তারেব মতবাদ অচল, ইহা ন্যায়শাস্ত্রের অনবস্থার সৃষ্টি করে। ডাক্তার বলিযাছেন যে হিংসা ছাড়া বিপ্লবের দ্বিতীয় পথ নাই। ভারতী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিযাছে, "রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তাহলে তারও ত জবাব রক্তপাত এবং তারও জবাবে এই একই রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলে না।" এম্‌নি করিযা অফুরন্ত বেগে হিংসার স্রোত বহিয়া যাইবে এবং শান্তি ও কল্যাণের পথ চিরকাল অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইবে।

(৩)

'পথের দাবী' বিপ্লবের উপন্যাস সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার উপজীব্য বিপ্লব-প্রচার নহে, দুইটি বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষের চিত্র। এই সংঘর্ষ শুধু বিরোধী মতের অভিব্যক্তিকে আশ্রয় করে নাই, ডাক্তার ও ভারতীর জীবনের মধ্য দিয়া জীবন্ত হইয়াছে। ডাক্তারের জীবনের অনেকখানি আমাদের নিকট হইতে গোপন রাখা হইয়াছে, কিন্তু যেটুকু পরিচয় আমরা পাই তাহার মধ্যে আদর্শের প্রতি অপ্রমেয় নিষ্ঠা দেদীপ্যমান হইয়াছে। তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার যে একটি মাত্র আলেখ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই ভারতী বুঝিতে পারিয়াছে যে কি সীমাহীন ক্লেশের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার এই ঋত্বিক দিন যাপন করে। ভাত কি ভাবে রাখা হইয়াছিল, একটা শিশু কি অপকর্ম করিয়া রাখিয়াছিল—ইহাদের সরল, স্পষ্ট, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তাহার দুঃসহ সহিষ্ণুতা ও সাধনার অনতিক্রম্য সংসক্তি তীক্ষ্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি শুধু যে দেহের উপরেই অবিশ্রাম নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তাহা নহে, হৃদয়ের প্রবৃত্তিকেও উৎসাদিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে পরমাশ্চর্যময়ী রমণী 'পথের দাবী'র সভানেত্রী সে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে। ডাক্তারের হৃদয়ে এই অপরিসীম ভালবাসা অপরূপ স্পন্দন জাগাইয়াছে, কিন্তু তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। যখনই এই সম্পর্কে ভারতী তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছে তিনি একটু বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার সদাচকিত দৃষ্টি একটু ঝাপ্‌সা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ক্ষণেকের বিভ্রম মাত্র। তিনি ভালবাসাকে চিনেন, তাহার মূল্য দিতেও জানেন, কিন্তু সব্যসাচীর প্রয়োজন ও ব্রজেন্দ্রের প্রয়োজন তো এক নয়। তাই সুমিত্রাকে শ্রদ্ধা করিলেও তাহার প্রণয়ের প্রতিদান তিনি দিতে পারেন নাই। যখন কাজের আহ্বান আসিয়াছে সুমিত্রাকে অবহেলা করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন, মুহূর্তের জন্য কর্তব্যের পথ হইতে স্খলিত হয়েন নাই। অপূর্বকে তিনি বলিয়াছেন, হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিতে দিলে এতবড় শত্রু আর মানুষের নাই। তাঁহার নিজের চৈতন্য কখনও আচ্ছন্ন হয় নাই, দৈহিক ক্লেশে তো নহেই, হৃদয়ের আলোড়নেও নহে। সুমিত্রা তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, কর্তব্যকঠোর, নিবিড় রহস্যময়ী। সব্যসাচীর সঙ্গিনী হওয়ার যোগ্যতা যদি কাহারও থাকে তো এই রমণীরই আছে। সে স্বল্পবাক্‌। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহার কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং হৃদয় ও মনের শক্তি আহৃত হইয়াছে। তাহার

বৈচিত্র্যময় জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়া সে সব্যসাচীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে, কিন্তু একটি দিনের তরেও তাহার আর্ত হৃদয়ের সম্মান দেওয়ার অবকাশ ডাক্তারের হয় নাই।

বিপ্লবীর ত্যাগ, নিষ্ঠা ও বিপদসঙ্কুল পথের অস্পষ্টতার চিত্র সর্বাপেক্ষা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে উপন্যাসের শেষ স্তবকে। ইহা কাহিনীকে শুধু সমাপ্তি দেয় নাই, ইহার নিহিত তাৎপর্যকে রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এই দৃশ্যের সাঙ্কেতিকতা অনন্যসাধারণ। বাহিরে উন্মত্ত প্রকৃতি প্রলয়ের সৃষ্টি করিতেছিল, ঘরের ভিতরে সুমিত্রা, ভারতী ও শশী ডাক্তারকে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছিল। কিন্তু সব্যসাচী কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; তিনি হীরা সিংকে লইয়া অবলীলাক্রমে গন্তব্যপথে বাহির হইয়া গিয়াছেন। অচেতন প্রকৃতি যেন বিপ্লবীর প্রচেষ্টার স্বরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ঝড়জলের বিরাম নাই, বিশ্রাম পর্যন্ত নাই; সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল, পথহীন পথের সেনাপতি ও সৈনিক বিদ্যুৎ শিখার আলোককে ধ্রুবতারা মনে করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। যে প্রলয় আকাশে বাতাসে গর্জিয়া ফিরিতেছিল তাহার মধ্যে সুমিত্রা তাহার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া থাকিবে এবং ডাক্তারও তাঁহার সমগ্র অভিযানের অপরূপ রূপক মূর্তি দেখিয়া থাকিবেন। সবাই তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, রহিয়াছে শুধু হীরা সিং—তাঁহার উপযুক্ত সৈনিক, যাহার গলায় ছুরি দিলে রক্ত ছুটিবে, কিন্তু বিনা হুকুমে কথা ফুটিবে না, যাহার খ্যাতি, নিন্দা বা শত্রুমিত্র নাই, আদর্শের আহ্বানে সব্যসাচীকে গুরুর পদে বরণ করিয়া জীবনের সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত সুখদুঃখ বিসর্জন দিয়া যে কঠোর সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

ভারতীর কথা স্বতন্ত্র। ডাক্তার ক্রীশ্চান সভ্যতার শত্রু, ভারতী ক্রীশ্চান; এই সভ্যতার মূলদেশে যে প্রেমের বাণী আছে তাহাকে সে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছে। ডাক্তার গৃহী নহে, কিন্তু ভারতী কায়মনোবাক্যে গৃহিণী হইতে চাহিয়াছে এবং ডাক্তারের দেশাত্মবোধকে কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। তাহার হৃদয়ের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা হইতেছে ডাক্তারকে কল্যাণের পথে, শান্তির পথে আনয়ন করা এবং নিজেকে গৃহিণী-পনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সে ডাক্তারকে বলিয়াছে, "এ পথ তুমি ছাড়··· বিপ্লবীদের এই নির্মম পথ।······তোমাকে মরতে দিতে আমি পারব না। সুমিত্রা পারে, কিন্তু আমি পারিনে।" তাহার নিজের হৃদয়ের গোপন কথা বহুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে; সর্বাপেক্ষা সহজ অভিব্যক্তি হইয়াছে তখন

যখন 'পথের দাবী'র সেক্রেটারী অপূর্বকে বলিয়াছে—"স্বভাব তো আমার যাবে না অপূর্ববাবু, কিছু একটা করা চাই। কিন্তু আপনার মতো আনাড়ির ওপরে মোড়লি করতে পাই ত আমি আর সমস্ত ছেড়ে দিতে পারি।" ভারতীর হৃদয়ের এই দাবীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই 'পথের দাবী'র বিপ্লবী স্রষ্টা অপূর্বকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

আর একটি দিক হইতেও সব্যসাচীর সাধনার স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছে। তিনি বিপ্লবী, কিন্তু জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজন ও আদর্শ সম্বন্ধে অচেতন নহেন। তিনি নিজেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 'ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানবজীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই, এমন ভুলও আমার কোনদিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা।" এই বৃহত্তর আদর্শের পরিচয় দেওয়াই শশী-উপাখ্যানের অন্যতম সার্থকতা। শশী মাতাল, অমিতব্যয়ী—কাহারও কাছে তাহার কোন মূল্য নাই এবং ভারতীর বিশ্বাস কোন মেয়ের পক্ষেই তাহাকে ভালবাসা সম্ভব নহে। তাহাকে সবাই গালি দিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার তাহার বহুদিনের সুহৃদ্ এবং কখনও কোন অবস্থায় তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। ডাক্তার শুধু যে তাহাকে স্নেহ করিয়াছেন তাহাই নহে, এই স্নেহের মূলে রহিয়াছে সুগভীর শ্রদ্ধা এবং ভারতীর বিরূপতাও ক্রমে প্রীতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। লোকে শশীর গ্লানি, কলঙ্ক ও পরাজয়টাই দেখিতে পাইয়াছে, সব্যসাচী চিনিয়াছেন তাহার কবিচিত্তকে, কলঙ্ক যাহাকে ছোট করিতে পারে নাই, চরম প্রবঞ্চনা যাহার দীপ্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই। শশীর শিশুসুলভ সরলতা ও কবিজনোচিত ঔদাসীন্যের চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে নবতারার প্রতি তাহার মনোভাবে এবং গুণীর সত্যকার পরিচয় পাইয়াছেন সব্যসাচী একা। তাই শশীকে ডাক্তারের একান্ত প্রয়োজন, তিনি জানেন যে, কর্মসূত্রে যদি কখনও তিনি ফিরিয়া আসেন, তবে শশীর কাছেই তিনি আশ্রয় ভিক্ষা করিবেন। আর সবাই তাহাকে ছাড়িলেও তিনি শশীকে ছাড়িবেন না। এই জন্যই বিপ্লবী নেতা কবিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী—রাজনীতির চেয়ে তুমি বড় এ কথা ভুলো না। তোমার পরিচয়ই তো জাতের সত্যকার পরিচয়। তোমায় ছাড়া এর ওজন হবে কি দিয়ে? একদিন এই স্বাধীনতা-পরাধীনতা সমস্যার মীমাংসা হবেই—এর দুঃখ দৈন্যের কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য পাবে না,

কিন্তু তোমার কাজের মূল্য নিরূপণ করবে কে? তুমিই ত দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবধারাকে মালার মত গেঁথে।" এই উচ্ছ্বসিত উক্তির মধ্যে কবির পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায় বিপ্লবী বক্তার।

'পথের দাবী'তে কল্পনা সমৃদ্ধি, গঠনকৌশল ও রচনানৈপুণ্যের পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহার কয়েকটি বিস্ময়কর চরিত্র অতি সুন্দব ভাবে অঙ্কিত হইযাছে, কিন্তু ইহাব মধ্যে অপরিণতির নিদর্শনও যথেষ্ট। সেই সকল অপরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পূর্বে শবৎচন্দ্রেব চিন্তাধারার একটি মৌলিক অসঙ্গতির নির্দেশ করা প্রযোজন। পূর্বেই বলা হইযাছে 'পথেব দাবী' নামকরণের মধ্যে শরৎচন্দ্রেব জীবনবেদেব সংক্ষিপ্ত সার রহিয়াছে। 'পথেব দাবী'র অর্থ এই যে প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্যেব অধিকারকে মানিযা লইতে হইবে, প্রাচীন আচার বা সামাজিক নিয়ম এই অধিকাবকে মানিয়া লইতে চাহে না বলিয়াই তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব প্রযোজন এবং এই বিদ্রোহেব বাণীই শবৎচন্দ্রেব নাবী চবিত্র পবিকল্পনাকে উদ্বোধিত করিযাছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, সবাই যদি স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তাহা হইলে সমাজ ব্যবস্থা অচল হইযা পড়ে। বার্নার্ড শ' যখন ইব্‌সেনেব নাটকেব সমালোচনাব মাবফতে তাঁহার মতবাদ প্রচাব করিতে আরম্ভ কবেন, তখন তিনি অবাধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেব জযগান করিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক আদর্শকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তিনিই এক প্রাণশক্তির পরিকল্পনা করিযাছেন যাহা নিরঙ্কুশ, যাহা অপ্রতিহতবেগে ব্যক্তিকে চালিত কবিয়া লইয়া যাইতেছে। এইভাবে বিদ্রোহেব পুরোহিত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইযাছেন। লাঞ্ছিত নারীর মধ্যে যে অম্লান শুভ্রতা আছে শবৎচন্দ্র তাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, কিন্তু নিরুদিদিব পদস্খলন বা অন্নদাদিদির গৃহত্যাগকে যদি সমাজ অভিনন্দিতও করে তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে, সকল রকম উচ্ছৃঙ্খলতাকেই কি সমাজ মানিযা লইবে? আর যদি তাহা মানিযা লইতে না পারে তাহা হইলে অনিযন্ত্রিত খেযাল ও সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার মধ্যে কোথায সে দাঁড়ি টানিবে? শরৎসাহিত্যে এই জিজ্ঞাসার সদুত্তরের কোন সূত্র পাওয়া যায় না। তিনি সমস্যার এই দিকটাব প্রতি দৃষ্টি দিযাছিলেন এইরূপ মনে হয় না। 'পথেব দাবী'তে এই অসঙ্গতি প্রকাশ পাইয়াছে অন্য ভাবে। ডাক্তার পথের দাবীর স্রষ্টা, তিনি ব্যক্তিব স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষেব পায়ে চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার সমিতিতে দেখিতে

পাই এই আদর্শ কোথাও চলে না। যাহারা সমিতির শত্রু তাহাদিগকে হত্যা করিবার অধিকারের প্রশ্ন না তুলিয়াও দেখিতে পাই যে সমিতির অভ্যন্তরেও কাহারও স্বাধীনতা নাই। নবতারা কাহাকে বিবাহ করিবে এই সম্পর্কে উদারতা অবলম্বন করা সহজ, কারণ তাহার সঙ্গে সব্যসাচীর কাজের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সমিতির কাজে তিনি কাহাকেও স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নহেন। সমিতির দুইটি আইন এই :—(১) ডাক্তারের আড়ালে ডাক্তারের কাজের আলোচনা চলিবে না। (২) ডাক্তারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ ; ইহার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। রাজশক্তির বিরুদ্ধে সহিংস বিদ্রোহের অধিকারকে ডাক্তার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা নিজের কাজের সমালোচনার অধিকারকে স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইয়াছেন। শুধু একবার অপূর্ব পথের দাবী পরিকল্পনার মৌলিক অযৌক্তিকতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছিল, কিন্তু ডাক্তার প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার একটি বিশিষ্ট সমিতির স্রষ্টা ও নেতা ; তাঁহার প্রয়োজনে এই জাতীয় নিয়ম রচনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু এখানে যে অসঙ্গতির পরিচয় পাই, ভাবধারার দিক দিয়া ইহাই শরৎ সাহিত্যের মৌলিক দুর্বলতা। নিয়মের শৃঙ্খল ও স্বাধীনতার পক্ষবিস্তার—কেমন করিয়া যে ইহাদের সমন্বয় হইতে পারে শরৎচন্দ্রের রচনায় তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

'পথের দাবী'র কাহিনী রচনায় যে সকল ত্রুটি আছে তাহাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সব্যসাচী বিস্ময়কর চরিত্র এবং তাঁহার ভাব ও চিন্তার চিত্র অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত আঁকা হইয়াছে, কিন্তু ঔপন্যাসিক তাঁহার জীবনের রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ, দেখিতে পাই যে তিনি কখনও তাঁহার কর্মধারা প্রকাশ করেন না। বর্মায় তিনি আসিয়াছিলেন কয়েকদিনের জন্য এবং সেইখানে সুমিত্রার সাহায্যে তিনি একটি সমিতি গঠন করিলেন। কিন্তু তাঁহার আসল কর্মপদ্ধতি কি জানিবার উপায় নাই। এক হীরা সিং এই কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু হীরা সিং শুধু সংবাদ দেয়, আসল তথ্য প্রকাশ করে না। পথের দাবীর সভ্যদের মধ্যে কৃষ্ণ আইয়ার ও সুমিত্রা ডাক্তারের পুরাতন বন্ধু, তাহারা কিছু কিছু সংবাদ রাখে, কিন্তু মনে হয় তাহাদের জ্ঞানও খুব ভাসা-ভাসা। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। ডাক্তার একবার বলিয়াছিলেন, "চলতি সম্প্রতি ভামোর পথে আরও কিছু উত্তরে। কিছু সাচ্চা জরির মাল আছে, সিপাইদের

কাছে বেশ দামে বিক্রী হবে।" তিনি নীলকান্ত যোশীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে পল্টনের সিপাইদের নাম বলিয়া দিলে তাহার ফাঁসি হইত না এবং সে তাহাদিগকে মিত্র করিতে গিয়াই প্রাণ দিয়াছিল, শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নহে। সৈন্যবল, বিরাট যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তিনি ভারতীকে আশ্বাস দিয়াছেন, "আজ যারা শত্রু, কাল তারা বন্ধুও হতে পারে।" অন্যত্র দেখিতে পাই তাঁহার শিষ্য মহাতপ ও সূর্যসিংহ রেজিমেণ্টে ছিল এবং সেখান হইতে সাংহাইয়ে যাইয়া ধরা পড়িয়াছে। এই সকল আভাস ইঙ্গিত হইতে মনে হয় যে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহবাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ষড়যন্ত্রভুক্ত করা সব্যসাচীর অভিযানের অংশ। কিন্তু এই কর্মজালের কোন চিত্র নাই ; যে সকল আভাস ও ইঙ্গিত আছে তাহাও অস্পষ্ট।

আর একটি অসঙ্গতিও লক্ষ্য করিতে হইবে। সব্যসাচী ১৯১১ সালে টোকিওতে বোমা নিক্ষেপে লিপ্ত ছিলেন ; তাঁহার ষড়যন্ত্রের জাল পিনাং, চায়না, সিঙ্গাপুরে বিস্তৃত হইয়াছে ; কর্মসূত্রে তিনি সেলিবিস, প্যাসিফিকের দ্বীপগুলি পরিদর্শন করেন এবং আমেরিকাতেও যাইতে পারেন। এই সকল জায়গায় গুপ্ত সমিতির সঙ্গে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অর্জনের সম্পর্ক কোথায় তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। ডাক্তারের জীবনের দুই একটি চমকপ্রদ ঘটনা আমরা শুনিতে পাই, তাহার সমগ্র স্বরূপটি আমরা পাই না। একবার উদ্দীপিত হইয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, "শুন্‌বে আমার সমস্ত ইতিহাস ? ক্যাণ্টনের একটা গুপ্ত সভার মধ্যে সুনিয়াৎ সেন আমাকে একবার বলেছিলেন—" এইখানেই সুমিত্রা প্রভৃতির আগমনে এই প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল আর ইহার উত্থাপনও হয় নাই। সুনিয়াৎ সেনের উল্লেখেব একটা অর্থ থাকিতে পাবে। সুনিয়াৎ সেন স্বদেশের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিযাছিলেন বিদেশে থাকিযা এবং সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। সুনিয়াৎ সেন এশিযাবাসী ; বোধ হয় তাঁহাব কথা স্মরণ করিয়াই শরৎচন্দ্র সব্যসাচীকে নির্বাসনে সংগ্রামসজ্জা রচনায় ব্যাপৃত করিয়াছেন। কিন্তু সুনিয়াৎ সেন লণ্ডনেই থাকুন আর যেখানেই থাকুন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন হযেন নাই, বরং সর্বদা তাহাব পুরোভাগেই রহিযাছেন। কিন্তু সিঙ্গাপুর বা সাংহাইর জ্যামেকো ক্লাবের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংযোগ কোথায় তাহা কোথাও বর্ণিত হয় নাই। কেনই বা সব্যসাচী বিদেশে গুপ্তসমিতির জাল বুনিতেছেন তাহাও বুঝা যায় না। একবার মাত্র তিনি নিজে এই অসঙ্গতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতী তাঁহাকে

প্রশ্ন করিয়াছিল, "তোমার নিজের জন্মভূমিতে কি তোমার কাজ নেই?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "তাঁরই কাজে আমি এদেশ ছেড়ে সহজে যাব না। মেয়েরা এদেশের স্বাধীন, স্বাধীনতার মর্ম তারা বুঝ্‌বে। তাদের আমার বড় প্রয়োজন। আগুন যদি কখনো এদেশে জ্বল্‌ছে দেখতে পাও, যেখানেই থাকো, ভারতী, একথাটা আমার তখন স্মরণ করো, এ আগুন মেয়েরাই জ্বেলেছে।" পূর্ব এশিয়ার রমণীরা স্বাধীন, সেইজন্য ভারতের বিপ্লবী বর্মা, চায়না, সুমাত্রা, সুরবায়ায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবেন এবং সহজে বর্মা ছাড়িয়া যাইবেন না, এই যুক্তি একেবারে অচল। কেহ কেহ বলিবেন কবির সৃষ্টি সব সময় যুক্তি মানিয়া চলে না, কিন্তু যে কল্পনা যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে তাহা ভাববিলাসীর স্বপ্নমাত্র, তাহা সৃষ্টি করিতে পারে না।

মনে হয় শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসকে যথাসম্ভব বিস্ময়কর করিতে চাহিয়াছেন। বিপ্লবীর জীবনে চমকপ্রদ ঘটনার অভাব নাই। যাঁহারা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের My Brother's Face পড়িয়াছেন তাঁহারা এমন সকল ঘটনার বর্ণনা পাইয়াছেন যাহাদের কাছে গিরিশ মহাপাত্রের বা ইরাবতীর মাঝির কাহিনী হার মানে। শরৎচন্দ্র যেন এই সকল পরমাশ্চর্য ঘটনার মোহে পড়িয়া নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই সন্দেহ দৃঢ় হইবে। সুমিত্রা পথের দাবীর প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তাহার সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ কোথায়? তাহার পিতা বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু মা ইহুদী। সে সরবরাহ করিত চোরা আফিম ও মদের; সে পৃথিবী ঘুরিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া ইহার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছে তাহার কোন পরিচয় নাই। ডাক্তার তাহাকে বাটাভিয়া ও সুরবায়ার পথে প্রথম দেখিতে পান এবং পরে সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া জাভায় ফিরিয়া গেল। তাহার চরিত্রের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা গ্রন্থকারের সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, কিন্তু মনে হয় পথের দাবীর ইতিহাসে তাহার অভ্যাগম একেবারে আকস্মিক এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাহার কোন আন্তরিক যোগ নাই। শুধু সুমিত্রার অভ্যাগম ও অন্তর্ধানই নহে। একাধিক আভাস আছে যে জাপান যখন কোরিয়া আত্মসাৎ করে তখন সব্যসাচীর দল খুব তৎপর হইয়াছিল। তিনি কোটুকুর কাগজের ইংলিশ সব এডিটর এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, দলের উত্তর চীনের সেক্রেটারি আহ্‌মেদ দুরানী মাঞ্চুরিয়ায় তখন ধরা পড়ে। কিন্তু এই সকল ব্যাপারের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সম্পর্ক কোথায়? মনে হয়, বাঙ্গালী বিপ্লবী, তাঁহার পাঠান সহচর,

জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া—ইহাদের সম্মিলন করাইয়া একটা চমকপ্রদ কাহিনী গড়িয়া তোলাই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য, কিন্তু চমকপ্রদ কাহিনীকেও সত্য, জীবন্ত হইতে হইবে। 'পথের দাবী'র অনেক অংশ আর্টের এই অবশ্যস্বীকার্য দাবী মিটাইতে পারে না। চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টার জন্য কাহিনী ও চরিত্র অসম্ভাব্য, অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

(২)

পথের দাবীর স্রষ্টা সব্যসাচী আদর্শ জীবনকে কল্পনা করিয়াছেন অব্যাহত গতি হিসাবে, মানুষেরা সবাই পথের পথিক। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন গতিশীল পদার্থ হিসাবে। এই কথাই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ভারতীকে। তিনি বিপ্লবী, যাহা স্থির হইয়া চাপিয়া বসিয়া আছে তিনি তাহার বিরোধী। শুধু যে তিনি রাষ্ট্রশক্তি বা প্রাচীন সংস্কারকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহেন তাহা নহে, সত্য সম্পর্কে তিনি নূতন পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছেন এবং সেই নূতন পরিকল্পনা তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টাকে উদ্বোধিত করিয়াছে। তিনি রাজার আইনকে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি রাজনৈতিক বিপ্লবী, তাঁহার পথ হিংসার পথ, অপরকে ধ্বংস করিয়া তিনি আদর্শে উপনীত হইতে চাহেন এবং এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি কোন কাজ করিতেই কুন্ঠিত নহেন। ইহার জন্য তিনি চিরাচরিত নীতিধর্মকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, কারণ তিনি মনে করেন যে আমরা আবহমানকাল হইতে যাহাকে নীতি বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছি তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি ভারতীকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য,—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।"

প্রশ্ন এই, সত্যের স্বরূপ কি রকমের? ইহার কি কোন চরম, পরম রূপ নাই; না, ইহা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নূতন করিয়া সৃষ্ট হইতেছে? ইহারও কি জন্ম, মৃত্যু আছে? গতিশীল জগতে কি এমন কিছু নাই যাহা গতির অতীত, যাহা অভ্রান্ত, অপৌরুষেয়? যদি তাই না থাকে, তবে মানুষ চলিয়াছে কিসের সন্ধানে? এই প্রশ্নই বিশেষ করিয়া অভিব্যক্তি পাইয়াছে 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে। এই

উপন্যাসের নায়িকা কমল। তাহার পিতা চা বাগানের সাহেব, মা চরিত্রহীনা বাঙ্গালী বিধবা। এক অসমীয়া ক্রীশ্চানের সঙ্গে কমলের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল, সেই স্বামীর মৃত্যুর পর পরিচয় হয় শিবনাথের সঙ্গে এবং তাহাদের বিবাহ হয় শৈবমতে। বিবাহ সভায় উপস্থিত যাহারা ছিল, তাহারা সবাই বলিল যে অনুষ্ঠান কিছুই হইল না, বিবাহে রহিয়া গেল মস্ত ফাঁকি। কমল কিন্তু এই ফাঁকিকে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মানিয়া লইল। কারণ শিবনাথের মনই যদি তাহার নিকট হইতে সরিয়া যায়, তাহা হইলে স্বামীকে সে কি ধরিয়া রাখিবে অনুষ্ঠানের ফাকা আওয়াজ করিয়া? এইখানে কমলের মতের গোড়ার কথা পাই। সে বলিতেছে, "উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর, আমি যাব তাই ঘাড়ে ধরে ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে বাঁধব ধরে?' কমলের মতে, সত্যের একমাত্র স্থান মানুষের মনে, অনুষ্ঠান প্রভৃতি মানুষের চিন্তাধারার বাহ্যপ্রকাশ মাত্র। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহাদের পরিবর্তন হওয়া উচিত। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ইহাদের কোনও মূল্য থাকে না। তাই কমলের সবচেয়ে বড়ো রাগ হইল সেই সকল জিনিষের বিরুদ্ধে যাহারা বাহির হইতে মানুষকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে—অতীতের স্মৃতি, প্রাচীন আদর্শ ও অনুষ্ঠানের শাসন। এই জন্যই কোনও কাজে পরিণতিকেই সে এক মাত্র লক্ষ্য করিতে পারে নাই, তাহার কাছে "সত্যি শুধু (জীবনের) চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই ত মানব জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাইতো বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ।" পরিণামের প্রতি লক্ষ্য নাই বলিয়াই কমলের কাছে মোহেরও মূল্য আছে, কারণ যতক্ষণ সে থাকে ততক্ষণ সে সত্য। তাই অজিতকে সে বলিয়াছে, "সূর্য রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি হোক্ মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বারবার ফিরে আসে।"

বাহিরের শাসনকে মানিতে কুণ্ঠিত বলিয়াই কমল অতিসংযমের বিরোধী। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি নিরন্তর অভিব্যক্তির পথ খুঁজিয়া বেড়ায় পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়া। সামাজিক অনুশাসন অভিব্যক্তির উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে সংহত করে, নিয়মিত করে। কমল এই অনুশাসনকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে নাই, এবং ইহা কখনই তাহার আদর্শের অঙ্গ হইতে পারে নাই।

তাহার আদর্শ আনন্দানুভূতি। তাই যেখানে সে দেখিয়াছে যে আনন্দের সুধাপাত্র আত্মোৎসর্গের শোষণে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই তাহার চিত্ত দুঃখে ও বিরক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। শিবনাথ তাহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কমলের কোনও নালিশ নাই। তাহার নালিশ হইল আশুবাবুর বিরুদ্ধে যিনি মৃতপত্নীর স্মৃতির কাছে তাঁহার সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়াছেন, তাহার নালিশ নীলিমার বিরুদ্ধে যে পরের গৃহের গৃহিণী ও পরের ছেলের জননী হইয়া নিজেকে পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে, এবং তাহার সবচেয়ে তীব্র বিদ্রোহ হইল আশ্রমের ব্রহ্মচর্যের আদর্শের বিরুদ্ধে, যে আদর্শ স্বাভাবিক নহে, সুন্দর নহে।

এই তো হইল কমলের মতবাদ। এই মতে সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে, ইহাকে সে নিজের জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার প্রথম পরীক্ষা হইল শিবনাথের প্রতারণায়। শিবনাথকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন পরই সে পরিচয় পাইল শিবনাথের অর্থলোলুপতার, এবং তাহার পর অজিতের মুখ হইতে সে জানিতে পারিল যে যদিও শিবনাথ তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল যে সে জয়পুর যাইবে, তবু সে আগ্রাতেই আছে এবং আশুবাবুর বাড়ীতে যাইয়া প্রতিদিন গানবাজনা করে। ইহার পরে সে শুনিল শিবনাথের অসুখের কথা। শিবনাথকে শুশ্রূষা করিতে সে প্রস্তুত হইল, কিন্তু আশুবাবুকে সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল যে সে শিবনাথের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হইতে চাহে না, তাহাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ হইয়াছে তাহা সাময়িক অভিমানের ফল নহে। আশুবাবুর সঙ্গে রোগীর ঘরে যাইয়া সে দেখিল যে মনোরমা শিবনাথের বুকের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার 'পরে পরস্পর-সম্বদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। ইহার পরে শিবনাথের বাড়ীতে তাহাকে শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কমল বুঝিতে পারিল, শিবনাথের কোনও অসুখ হয় নাই, আশুবাবুর স্নেহ ও মনোরমার সান্নিধ্য পাইবার জন্য সে অসুখের ভান করিয়াছিল মাত্র।

তাজমহলের কাছে যেদিন কমল তাহার শৈববিবাহের কাহিনী সস্নেহে, সকৌতুকে ও একান্ত নির্ভয়ে বর্ণনা করিয়াছিল, এবং যেদিন অজিতের নিকট হইতে সে জানিতে পারিল যে শিবনাথ জয়পুর যাইবার কথা বলিয়া আগ্রাতেই আছে, ইহার মধ্যে ব্যবধান মাত্র পনের দিনের। কাজেই যে নীড় সে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল নিতান্ত অতর্কিতভাবে, ইহা যেমন আকস্মিক তেমনি অসহনীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাই

কমলের মতবাদের চরম পরীক্ষা হইল এইখানে। যাহা অন্য স্ত্রীর কাছে কঠোরতম দুর্ভাগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত কমল তাহাকে গ্রহণ করিল অতি সহজ, শান্তভাবে। জীবনের চরম সঙ্কটের মুহূর্তে সে বিন্দুমাত্র টলিল না। শিবনাথের নিকট হইতে তাহার যাহা পাওয়ার ছিল তাহা সে পাইয়াছে, যখন শিবনাথের মনই তাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে, তখন সে অনুষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিল না, আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিল না, নীতির দোহাই দিল না। শিবনাথের ভালবাসাকে যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার প্রতারণাকেও তেমনি অম্লানবদনে শিরোধার্য করিল। এমন কি, যেদিন শিবনাথকে সে একা পাইল, সেদিন সমস্ত ছলনা ধরা পড়িবার পরও সেই পাষণ্ড তাহার কাছে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিল, সেইদিনও সে নালিশ করিয়া একটি কথা বলিল না, প্রতারককে প্রবঞ্চনা ধরাইয়া দিবার লোভ পর্যন্ত সংবরণ করিল।

শিবনাথের সঙ্গে কমলের বিচ্ছেদ উপন্যাসের প্রধান ঘটনা, ইহার মধ্য দিয়া কমলের ফিলজফি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কমল শুধু তর্ক করে নাই, ঘটনাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া তাহার বিশ্বাস ও যুক্তি সবল ও সজীব হইয়াছে। এই বিচ্ছেদকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ কমলের নিকট অজিত জানিতে পারিল যে শিবনাথ তাহার সঙ্গে থাকে না এবং ইহাও প্রকাশ পাইল যে সে জয়পুর না যাইয়া আগ্রায়ই আছে এবং প্রায় প্রত্যহই আশুবাবুর বাড়ীতে গানবাজনা করে। তারপর অজিত অধিক রাত্রিতে বাড়া ফিরিয়া দেখিতে পাইল যে মনোরমা তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া নাই, পরন্তু ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলে শিবনাথের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে ব্যাপৃত। এই বিচ্ছেদ দ্বিতীয় ও চরম স্তরে পৌঁছিল সেইদিন যেদিন আশুবাবু, কমল ও অজিত মনোরমাকে শিবনাথের বুকের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রিত থাকিতে দেখিল। শিবনাথের বাসায় যাইয়া কমল এই অসুস্থতার স্বরূপ আবিষ্কার করিল এবং তাহাদের আলাপে প্রমাণিত হইল যে ইহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কাহিনীর তৃতীয় স্তরে দেখিতে পাই শিবনাথের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ হইতেছে এবং সেই বিবাহে কমল অকুণ্ঠিত সম্মতি দিয়াছে। সমালোচকচূড়ামণি মনীষী অ্যারিষ্টটল্ বলিয়াছেন, নাটকে (তথা উপন্যাসে) বর্ণিত কাহিনীতে তিনটি বিভাগ থাকিবে—আদি, মধ্যম ও অন্ত। এই কাহিনীর মধ্যে এই বিভাগ তিনটি অতিশয় সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত। ইহাদের মধ্য দিয়া কমলের যুক্তি ও তর্ক রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন 'শেষপ্রশ্ন' শুধু কথার সমষ্টি ; ইহার মধ্যে গল্পাংশের অভাব আছে। এইরূপ মত একেবারে ভিত্তিহীন না হইলেও সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নহে। কমল প্রচুর তর্ক করিয়াছে এবং এক রাজেন্দ্র ছাড়া অন্য সকলের মনে তাহা ধাঁধা জন্মাইয়াছে ; কিন্তু সেই তর্ক একটি গতিশীল কাহিনীর মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তর্কবহুল প্রচারমূলক উপন্যাসের মাপকাঠি ঘটনাবহুল ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের বা শিশুপাঠ্য ভূতের কাহিনীর মাপকাঠি হইতে স্বতন্ত্র। প্রচারমূলক সাহিত্যের কাহিনীকে যুক্তি তর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, আবার তাহার যুক্তি তর্ককেও ঘটনার বিবর্তন হইতে পৃথক করিলে উহা প্রাণহীন হইয়া পড়ে। প্রচারধর্মী যে কোনও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা নাটকের পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই এই শ্রেণীর সাহিত্যে তর্ক ও কাহিনীর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বস্তুতঃ, এই শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইতেছে কতকগুলি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কোনও বিশিষ্ট ভাবধারার পরিণতির চিত্র আঁকা। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে প্লটের অভাব বা অপ্রাচুর্য নাই। সাধারণতঃ, এই প্রকারের নাটক বা উপন্যাসে যেরূপ প্লট থাকে, এই প্লট তদপেক্ষা ঘটনাবিরল নহে। বরং ইহার মধ্যে যেরূপ একটি সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত কাহিনী পাওয়া যায় অনেক গল্পেই তাহা দুর্লভ।

এই কাহিনীতে একটি ব্যাপারে খট্‌কা লাগে। কমলের ফিলজফি যাচাই করা হইয়াছে এমন একজন লোকের সম্পর্কে যে অতিশয় নীচ ও পাষণ্ড। শিবনাথের অতীত জীবনের যে কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, কমলের সঙ্গে সে যে প্রতারণা করিয়াছে, আশুবাবুর গৃহে সে যে অশান্তি আনিয়াছে, তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে ঔদাসীন্যের ভাব আসা বা ঘৃণার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তাহাকে অম্লান বদনে বিদায় দেওয়ার মধ্যে ক্ষমাশীলতা ও ঔদার্যের প্রমাণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আনন্দের যে চিরচঞ্চলতার জয়গান কমল করিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নাই। কারণ শিবনাথের নীচতার কথা জানার পর তাহার প্রতি কোনও আকর্ষণ থাকিতে পারে না ; তখন তাহাকে পরিত্যাগ করার মধ্যে কোনও ক্ষোভের ভাব আসিতে পারে না, বরং ভারমুক্তির ও পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস আসাই স্বাভাবিক। কমলের মনের প্রকৃত পরীক্ষা হইত যদি শিবনাথ এমন একজন লোক হইত যে সর্বতোভাবে বরণীয়, যাহাকে কমল পাইয়া হারাইয়াছে অথচ হারাইয়াও পুনরায় পাইতে চাহে। তাহা হইলে কমলের হৃদয়াবেগের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হইত তাহার সচেতন বুদ্ধির, এবং সেইখানেই তাহার মনের সত্যিকার বিচার হইত। 'ঘরে বাইরে'তেও অনুরূপ

ত্রুটি আছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ‘সন্দীপের বাহিরের রাজবেশের অন্তরালে গড়মাটিবাংতার শুষ্ক কঙ্কাল যদি বাহির হইয়া না পড়িত, তাহার নির্লজ্জ ভোগলোলুপতার বীভৎসতা উদ্‌ঘাটিত না হইত, যদি সে নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীপদবাচ্য হইতে পারিত, তবে এই অগ্নি-পরীক্ষায় কি ফল হইত বলা যায় না।··· মানদণ্ড নিরপেক্ষভাবে ধরিলে বিচার···· সহজ হইত না।’ ‘ঘরে বাইরে’র সমস্যা ‘শেষপ্রশ্ন’-এর সমস্যা হইতে ভিন্ন রকমের, কিন্তু উভয় উপন্যাসের মধ্যেই রহিয়াছে একই ত্রুটি।

অজিত ও কমলের প্রণয়কাহিনী উপন্যাসের অন্যতর প্রধান উপজীব্য। অজিত ভাবপ্রবণ ; সে সহজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। সুতরাং কমলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার বাগদত্তা প্রণয়িনী মনোরমা কমলকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, কাজেই কমলের প্রতি তাহার স্নেহ ও সমবেদনা ছিল। স্নেহ, সমবেদনা ও শ্রদ্ধা ভালবাসায় রূপান্তরিত হইল। কমলের মনেও তাহার প্রতি প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই প্রণয়ের আদানপ্রদানের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন বিশেষ শিল্পচাতুর্য নাই। প্রথম দিন কমল অজিতকে খাওয়াইয়া যে সকল কথা বলিল, তাহা প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক। কমলের মতবাদের মধ্যে দুইটি দিক আছে—একটি অতীতের বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে চায় আর একটির লক্ষ্য বর্তমানে সুখভোগের প্রতি। একটি যাচাই করা হইয়াছে শিবনাথের প্রতি ব্যবহারে আর একটির পরিচয় পাই অজিতের সঙ্গে প্রণয়ের আদানপ্রদানে। প্রথম কাহিনীতে ত্রুটি থাকিলেও কমলের মত তাহার আচরণের মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শিবনাথের প্রতি তাহার ক্রোধ নাই, প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা নাই, শিবনাথের ব্যবহারে সে আঘাত পাইয়াছে, কিন্তু তাহার চিত্তের নবীনতা সজীবতা, নির্ভয়তা বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। যাহা শিবনাথের নিকট হইতে সে পাইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, আরও কেন পাওয়া গেল না ইহা লইয়া সে আক্ষেপ করিতেও লজ্জা বোধ করে। কিন্তু অজিতের সঙ্গে তাহার ব্যবহারে সেই সজীবতা নাই, তাহার প্রণয়নিবেদনে প্রগল্‌ভতা আছে, কিন্তু উল্লাস নাই, আগ্রহ আছে কিন্তু উৎসাহ নাই। অজিত যেন সহায়হীনার আশ্রয়, উচ্ছ্বসিত প্রণয়ের উৎস নহে। দেহ ও মনের পরিপূর্ণ যৌবনের অকুণ্ঠিত জয়গান যে করিয়াছে, তাহার ব্যবহারে সেই উন্মুক্ততা নাই, ভাষায় সেই আবেগ নাই। সে যেন অতিশয় শ্রান্ত, অতীতের বন্ধনকে যে অস্বীকার করিয়াছে, ভবিষ্যতের সম্পর্কে তাহার নিঃশঙ্ক সাহস ও আশা নাই। যে

চিরচঞ্চলতার বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল, সে যেন থামিতে চায়। যে সুখ সে পাইয়াছে তাহাকে সে যেন ঐশ্বর্যের মত ভোগ করিতে পারে না, সম্বলের মত আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। উপন্যাসের উপসংহারে সে অজিতকে বলিয়াছে, "তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, এত নিষ্ঠুর আমি নই......ভগবান্ তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কোরতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আগলে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।" এই সেই কমল!

শিবনাথ-কমল-অজিতের কাহিনী উপন্যাসের মূল উপজীব্য। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও দুই একটি বিষয় আছে যাহা মুখ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য। কমলকে নানা অবস্থায় নানা পরিবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া ঔপন্যাসিক তাহার মতবাদের নানা শাখাপ্রশাখা এবং তাহার বুদ্ধির ও অনুভূতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার মনের গতি যেমন দ্রুত তেমনি বৈচিত্র্যময়। তাজমহলের আর্টকে সে শিরোধার্য করিয়াছে, কিন্তু চিরবিরহীর "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়া" বাণী তাহার কাছে গৌরবহীন, প্রায় অর্থহীন। অন্য কতকগুলি মতের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবু এইখানে দুই একটির পুনরুক্তি অবান্তর হইবে না। হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের নিষ্ফল দারিদ্র্যচর্চা তাহার সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা আকর্ষণ করিয়াছে এবং বোধ হয় ইহারই ফলে আশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। আশুবাবু বিপত্নীক; মৃত স্ত্রীর স্মৃতি তাঁহার কাছে সজীব। ইহার জন্য বর্তমানের সমস্ত সম্ভোগ হইতে তিনি বিরত হইয়াছেন। কমল ইহাকে মনের জড়তা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছে। নীলিমা বালবিধবা; স্বামীর পুণ্যস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া সে পরের গৃহের নিঃস্বার্থ গৃহিণী ও পরের ছেলের নিঃস্বার্থ জননী হইয়াছে। কমলের কাছে ইহা গৃহিণীপনার মিথ্যা অভিনয়, কাজেই ইহাকে সে কোনও সম্মানই দেয় না। ইহা অদ্ভুত হইতে পারে, কিন্তু ভাল নহে। আশুবাবু ও নীলিমার আদর্শের সঙ্গে কমলের আদর্শের সঙ্গতি নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহারা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেও তাহাদের প্রতি আসক্তি অনুভব করিয়াছে। কমল কাহারও নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু দারিদ্র্যের পীড়নে আশুবাবুর কাছে মেয়ের মত হাত পাতিতে তাহার আপত্তি হয় নাই। নীলিমাকে সে ভালবাসে এবং তাহার ভালবাসাও সে পাইয়াছে। এই স্নেহের আদানপ্রদান মনের গভীর ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাই ইহার মধ্যে ভাবপ্রবণতার আতিশয্য আছে। প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে

শরৎচন্দ্র অনেক সময় বাহিরের সঙ্ঘর্ষকে প্রাধান্য দিয়া ভাবাতিশয্যের (sentimentality) সৃষ্টি করেন। এইখানেও তিনি বাহিরের মিলকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া অতিশয়োক্তি দোষ ঘটিয়াছে। ভাবাবেগ (sentiment) ও ভাবাতিশয্য (sentimentality)—ইহাদের মধ্যে যে অনির্দেশ্য অথচ সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে তাহা রক্ষিত হয় নাই। বিশেষ করিয়া আশুবাবুর কমলকে 'কাকাবাবু' বলিয়া সম্বোধন করার অনুরোধ, কমলের তাহাতে সম্মতি ও অসম্মতি, আশুবাবুর হাতে কমলের হাত দেওয়া, নালিমা ও কমলের সম্ভাষণ ও আপ্যায়ন—এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে ন্যাকামির গন্ধ রহিয়াছে।

এই উপন্যাসের মধ্যে আর্টের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা দুর্বল কাহিনী হইতেছে নীলিমার। কমলের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্যের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই, স্নেহের আদানপ্রদানের বাহ্যাড়ম্বর আছে, কিন্তু অন্তরের সুগভীর তলদেশে ইহার ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নীলিমার নিজের মনে যে পরিবর্তন আসিয়াছে, আশুবাবুর প্রতি তাহার যে ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, তাহাও অতিশয় অপ্রত্যাশিত। ইহা শুধু অতর্কিত ও অশোভন নহে, অবিশ্বাস্যও। নীলিমার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে করুণ করিবার জন্য, গ্রন্থকার অবিনাশবাবুকে একটি বিবাহ দেওয়াইয়াছেন, যিনি এতকাল বিপত্নীক থাকিলেন, তিনি হঠাৎ স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইয়া আত্মীয়ের পীড়াপীড়িতে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। গ্রন্থের মূল কাহিনীর সঙ্গে নীলিমার সম্পর্ক নাই, অথচ তাহাকে খুব একটা বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। গল্পের এই অংশকে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য, এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন করান হইয়াছে।

অক্ষয়ের পরিবর্তন এই শ্রেণীর ঘটনা। উপন্যাসের প্রথম অংশে অক্ষয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, কমলের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য, এবং এই উপন্যাসের হাস্যরসের মূলে রহিয়াছে অক্ষয়ের সঙ্কীর্ণতা ও অতিরিক্ত শুচিতা। এই রকম চরিত্রকে বেশীক্ষণ পুরোভাগে রাখা যায় না, কারণ ইহারা অনমনীয়, বারংবার একরকমের কথা বলিবে ও একরকমের কার্য্য করিবে। তাই কিছুকাল পরে ইহাদের কার্যকলাপ একঘেয়ে, নীরস হইয়া পড়ে। তারপর, কমল যখন সকলের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া ফেলিয়াছে তখন অক্ষয় থাকিয়াও কিছুই করিতে পারিত না। সে শুধু কলহ করিত ও ভর্ৎসনা পাইত। এই সব কারণে তাহাকে উপন্যাসের শেষার্ধ হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উপসংহারে আবার তাহাকে আনা হইল। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এবং

গ্রামের দুরবস্থা দেখিয়া এই রুচিবাগীশের মন নরম হইয়া গিয়াছিল। সে কমলের কাছে স্নেহ ও চিঠি ভিক্ষা করিল এবং বলিল যে কমলের কথা সে প্রায়ই ভাবিবে। এই সেই অক্ষয়! তাহার পরিবর্তন (অধোগতি?) শুধু যে আকস্মিক তাহা নহে, ইহা সম্ভাব্যতার সীমাও অতিক্রম করিয়াছে।

কেহ কেহ বলিবেন, অসম্ভব কি সম্ভব হয় না?' প্রতিদিন আমরা কি এমন ঘটনা দেখিতেছি না যাহা ঘটিবার পূর্বে অবিশ্বাস্য বলিযা মনে হইয়াছিল? এইখানে স্মরণ করাইযা দেওযা ভাল যে আর্ট ও জীবনের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। ব্যবহারিক জীবনের সত্যকে সম্ভাব্যতার দায় গ্রহণ করিতে হয় না; সে চক্ষুর সম্মুখে ঘটিয়া যায়, তাহাকে স্বীকার কবিযা লইতে হয়। কিন্তু আর্টের মূল বহিযাছে মনে, ব্যবহারিক জীবনে নহে। এখানে শুধু ঘটনা ঘটিলেই চলিবে না, তাহাকে বিশ্বাস্য হইতে হইবে, সম্ভবের সীমা লঙ্ঘন করিলে তাহার চলিবে না। আর্টের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে সন্দেহকে নিরস্ত করা, অবিশ্বাসকে অচল করা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিরাট ভূমিকম্প হইয়া গেল। ইহা হওযা উচিত ছিল কিনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ইহাব সঙ্গতি আছে কিনা, ইহাকে প্রত্যাশা কবা হইয়াছিল কিনা, এই সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। কিন্তু আর্টে অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য ঘটনা আনিলেই চলিবে না, শিল্পীকে দেখাইতে হইবে, ইহা অতর্কিত হইলেও সম্পূর্ণ আকস্মিক নহে; ইহার বীজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং লোকচক্ষুব অন্তরালে তাহা সঞ্জীবিত হইয়াছিল। এই অবশ্যস্বীকার্য মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে নীলিমাব কাহিনী ও অক্ষয়ের পরিবর্তন অতিনাটকীয, অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব।

উপন্যাসে আর একটি চবিত্র আছে সে এক হিসাবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সে রাজেন। কমলের ব্যক্তিত্বের কাছে সকলেই নতি স্বীকার করিযাছে, শুধু করে নাই রাজেন, এবং কমল বুঝিয়াছে সে অন্য পুরুষ হইতে বিভিন্ন। তাহার কাছে রমণীর বিশিষ্ট আকর্ষণ নাই, কাহারও সঙ্গে গায় পড়িয়া সে ভাব করিতে চাহে না, নিজেব সুনির্দিষ্ট পথ হইতে কোন কারণেই সে বিচ্যুত হয় না। রাজেন বিপ্লবী, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে বিপ্লববাদের কথা নাই। বিপ্লবী অন্যের সংস্পর্শে কি ভাবে ব্যবহার করে, সাধারণ জীবনে তাহার আচরণ কিরূপ তাহাই দেখান হইয়াছে। রাজেন্দ্রের ইতিহাস অদ্ভুত হইলেও অস্বাভাবিক নহে। জীবনের রাজপথ ছাড়িয়া যাহারা অলিতে-গলিতে সঞ্চরণ করে, তাহাদের কার্যকলাপ অন্য সকলের কার্যকলাপ হইতে স্বতন্ত্র। রাজেনের ব্যক্তিত্ব

অতিশয় প্রখর ; সে বিনা প্রয়োজনে কথা বলে না, নিজেকে জাহির করে না, কিন্তু কর্তব্যপথ হইতে কিছুতেই বিচলিত হয় না। কমলের বন্ধুত্বকে সে অস্বীকার করে নাই, গ্রহণও করে নাই, তাহার সাহায্য সে পাইয়াছে কিন্তু কমলের দ্বারা সে অণুমাত্র প্রভাবান্বিত হয় নাই। তাহার আদর্শ কমলের আদর্শ হইতে বিভিন্ন, কিন্তু কমল তাহাকে তর্কে পরাস্ত করা দূরে থাকুক তর্কে আহ্বান করিতেও পারে নাই। একবার মাত্র সে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছে, তখনই কমল বুঝিয়াছে যে ন্যায়ের তর্ক ও ভাবের বিলাস হইতে সে বহুদূরে। পবের জন্য সে আত্মোৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত ; এই হিসাবে সে আদর্শপন্থী। অথচ যাহাদের জন্য সে খাটিতেছে, জীবন বিসর্জন দিতেছে তাহাদের দুঃখে সে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। সে অশ্রুপাতপ্রবণ সাধারণ বাঙ্গালী নহে। দীন, নীচ, প্রপীড়িতদেব জীবনের স্বরূপ সে জানে, সে বস্তুতান্ত্রিক, রিয়ালিষ্ট। আদর্শবাদী হইয়াও সে বস্তুতান্ত্রিক ; তাই সে হাস্যরসিক। তাহার হাস্যরসানুভূতি আদর্শবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতাব মধ্যে সংযোগেব সেতু। রাজেনের হাস্যরসের মধ্যে কঠোর ব্যঙ্গ আছে ; তবু এই রসবোধই জীবনেব বোঝাকে লঘু করিয়া দিয়াছে। তর্ক না করিয়াও সে কমলকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে তাহার মতবাদ কত অন্তঃসারশূন্য। সে দেখাইয়াছে যে বাহিরের অনুষ্ঠান বাদ দিয়া মন চলিতে পারে না ; যে মনেব মিল মতের দ্বৈধকে অগ্রাহ্য করে তাহা শুধু ভাবের বিলাস। কমলের মতে সত্যের ভিত্তি মনে, অনুষ্ঠান বহিঃপ্রকাশমাত্র। রাজেন্দ্রের বক্তব্য এই যে, বাহ্য অভিব্যক্তি ছাড়া সত্যের কোন আধার নাই ; অনুষ্ঠানের সাহায্য ব্যতিরেকে সে আপনাকে প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। প্রাচীন ভারত বা নব্য য়ুরোপের দোহাই দিয়া সে নিজের মতকে সমর্থন করে নাই, তাহার মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে নিজের জীবনের গভীর ভিত্তির উপর। তাই কমল তাহার কাছে নত হইয়াছে, তাহাকে নত করিতে পারে নাই।

আর একটি লোকের কথা উল্লেখ না করিলে বর্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তিনি হইতেছেন আশুবাবু। উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, অথচ তাঁহার প্রশান্ত হাস্যে উপন্যাসখানি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে নানা প্রকারের চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে—গুণী অথচ চরিত্রহীন শিবনাথ, ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র, বিপ্লবী রাজেন, ভাবপ্রবণ অজিত, শুদ্ধাচারিণী হিন্দু বিধবা নীলিমা ও বিদ্রোহী কমল। ইহারা বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, কিন্তু আশুবাবু সকলের মনের কথা

বুঝিয়াছেন, সকলকেই ভালবাসিয়াছেন, সকলের শ্রদ্ধা সমানভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মনের প্রশস্ততা অনন্যসাধারণ, তাই সকলের অন্তরে তিনি সমানভাবে প্রবেশ করিতে পাবেন, কোন লোকের প্রতি তাঁহার কোন বিরুদ্ধতা নাই। কমল তাঁহার আদর্শকে বারংবার আঘাত করিয়াছে, তাঁহার মনকে জরাগ্রস্ত বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছে, অথচ কমলের কথা তিনি অতি সহজে বুঝিয়াছেন, তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাহার মতবাদকে শিরোধার্য করিতে না পারিলেও স্বীকার করিয়াছেন। বিপ্লবী রাজেনকে তিনি খুব কমই দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধের অবধি নাই।* তিনি বিলাতফেরৎ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত; তথাপি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি নিজে মৃত স্ত্রীর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ দেখাইযাছেন, আবার কমলকে তিনি সর্বান্তঃকবণে আশীর্বাদ করিতে চেষ্টা করিযাছেন। বেলার বিবাহ-বিচ্ছেদে তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন; এমন কি শিবনাথের সঙ্গে তাঁহার মেয়ের বিবাহে পর্যন্ত আপত্তি করেন নাই।

তাঁহাব হৃদযের প্রশস্ততাব সঙ্গে আর একটি জিনিয জড়িত ছিল। তাহা হইতেছে বৈবাগ্য। তিনি বিপত্নীক; ঐশ্বর্যশালী হইযাও ভোগের কীট নহেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও তিনি যেন সব কিছু হইতে বহু উর্ধ্বে বিবাজ করিতেছেন, কোন কালিমা বা জড়তা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পাবে নাই। তাই সকল বিষয়ের মাধুর্য তিনি গ্রহণ করিতে পারেন, অথচ কোন কিছুর মধ্যেই তিনি আবদ্ধ থাকেন না। এই বৈরাগ্য ছিল বলিযাই তিনি সুগভীর শোকের স্মৃতি অনুক্ষণ বহন করিয়াও সদা প্রফুল্ল থাকিতেন, এবং কঠিন আঘাত পাইয়াও তিনি যে মনোরমাকে ক্ষমা করিতে পাবিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও এই বৈরাগ্যের পরিচয় আছে। তিনি সব চেয়ে বেশী বিচলিত হইয়াছিলেন নীলিমাব ব্যবহারে; ইহার একটি কারণ এই যে ইহার মধ্যে তাঁহার বিরাগী চিত্ত নূতন বন্ধনের চিহ্ন দেখিযাছিল। আশুবাবুর হাসি প্রভাতের আলোব মত উজ্জ্বল, তাহারই মত শুভ্র ও পবিত্র এবং তাহারই মত সবাইকে সমানভাবে প্রফুল্ল করে; আবার প্রভাতের আলোর মতই ইহা আসে দূর, বহু দূর হইতে।

* তিনি শুধু অক্ষয়কে ভয় করেন, কাবণ অক্ষয় সঙ্কীর্ণমনা ও পরের দোষানুসন্ধিৎসু। অথচ অক্ষয়ের বিরুদ্ধেও তাঁহার কোন বিদ্বেষ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ছোট গল্প

ছোট গল্পের পরিসর ছোট। সুতরাং তাহার মধ্যে একটি ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে চরিত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা বা ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া কোন কাহিনীর পরিণতির চিত্র আঁকা সম্ভবপর নহে। গল্পলেখক কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার গল্পটি সজ্জিত করেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঠিক সেই দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাহা ঐ কেন্দ্রীয় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং এখানে চরিত্রেরও শুধু আংশিক অভিব্যক্তিই সম্ভবপর হয়। সুতরাং ছোট গল্পে একটি রসঘন নিবিড়তা ও ঐক্য আছে যাহা সুদীর্ঘ উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে নারীহৃদয়ের বিচিত্র ও জটিল দ্বন্দ্বের চিত্র আঁকিয়াছেন। এই দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনার মধ্য দিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ বদলাইয়াছে আবার ইহাই পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই প্রকারের দ্বন্দ্ব ছোট গল্পের পক্ষে উপযোগী নহে। কারণ দ্বন্দ্বের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা সুদীর্ঘ, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণেই উপন্যাসের বিশেষত্ব। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের দেখা হইয়াছিল অতর্কিতে, কিন্তু তাহার পর রাজলক্ষ্মীর মনে নানাভাবের যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া চলিতে লাগিল তাহা যেমন বিচিত্র তেমনি দীর্ঘায়ত। এই কাহিনীর কোন অংশে সেই আকস্মিকতা বা সম্পূর্ণতা নাই যাহার মারফতে ইহা ছোট গল্পের বিষয়ীভূত হইতে পারে। শরৎপ্রতিভার অভিব্যক্তির উপযুক্ত বাহন বড় উপন্যাস—ছোট গল্প নহে।

কখনও কখনও শরৎচন্দ্র ছোট গল্পের আশ্রয় লইয়া তথায় এমন সমস্ত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন যাহা উপন্যাসের পক্ষেই সমধিক উপযোগী। এই সকল গল্পে ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ততা আছে, কিন্তু তাহার বৈশিষ্ট্য নাই। ইহারা ক্ষুদ্রাবয়ব, কিন্তু তাহার কারণ এই যে গ্রন্থকার একটি সুদীর্ঘ উপন্যাসকে সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত করিতে চাহেন। যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ আমরা দাবী করিতে পারি, তাহা তিনি দিতে প্রস্তুত নহেন। শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের মধ্যে 'আঁধারে আলো' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, যদিও তাহার আখ্যানভাগ

উপন্যাসের পক্ষেই বেশী উপযোগী। গ্রন্থকার গল্পের সূচনা করিয়াছেন ধীরে ধীরে, বিজলীর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের প্রণয়ের যে উন্মেষ হইয়াছে তাহার চিত্র অতি সুচারুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু বিজলীর গৃহে তাহাদের যে মিলন হইল তাহার বর্ণনায় এই গল্পের মৌলিক ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। সুরাপানোন্মত্তা বাইজী প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথকে লইয়া বহু কদর্য তামাসা করিল, তাহাকে সঙ সাজাইল, অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাঁটু গাড়িয়া বৈষ্ণব পদাবলী হইতে "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু" পদটি আবৃত্তি করিয়া সত্যেন্দ্রের পদরেণু ভিক্ষা করিল। এই তরুণ যুবকের প্রণয়ের নবীনতা ও অকপটতা ও তাহার মনের শুচিতার প্রতি পানোন্মত্তা রমণীর অণুমাত্র দৃষ্টি নাই। সে তামাসাচ্ছলেই তাহার দাসীকে সত্যেন্দ্রের জন্য খাবার আনিতে বলিল, কিন্তু যেই দেখিল সত্যেন্দ্র তাহার ছোঁওয়া অথবা তাহার দেওয়া খাবার খাইতে প্রস্তুত নহে, অমনি তাহার মনে এক গভীর পরিবর্তন আসিল। সেই চটুলতা, সেই নির্লজ্জতা চলিয়া গেল, সুরামদির কণ্ঠে আসিল অপূর্ব কমনীয়তা। এই পরিবর্তন আকস্মিক, অদ্ভুত, প্রায় অসম্ভাব্য।

মানবহৃদয়ের পরিবর্তন যে যুক্তিশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়াই চলিবে, এইরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু যে পরিবর্তন অতর্কিতে আসিল, তাহা ধীরে ধীরে কিরূপ সহজ হইয়া পড়িল, গল্পে তাহার বর্ণনা নাই। রাজলক্ষ্মীর পক্ষে পিয়ারী বাইজী ছিল একটা বাহিরের খোলসমাত্র, তবু রাজলক্ষ্মী তাহাকে একদিনেই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিজলী বাইজী ছিল সত্যি সত্যি বাইজী। যত অতর্কিতে তাহার পরিবর্তন আসিয়াছে বলিয়া গল্পে বর্ণিত হইয়াছে, তত অতর্কিতে বাইজীর জীবনে অনুরূপ পরিবর্তন আসা সম্ভব কিনা এবং সেই পরিবর্তন অর্ধচেতন মদোন্মত্ত অবস্থায় আসা সম্ভব কিনা—এই সব প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদিত হয়। যদি এই ভাবে এই পরিবর্তন আসা সম্ভবপরই হয়, তবু ইহাকে আপনার করিয়া লইতে, অভ্যস্ত জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করিলেও অভ্যস্ত চিন্তা ও অনুভূতির পথ ত্যাগ করিতে সময় লাগে। গল্পে তাহার কিছুই দেখান হয় নাই। গল্পের শেষের অংশে দেখি বাইজী বিজলীর সর্বত্যাগিনী মূর্তি। যে বিস্তীর্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে এই পরিবর্তন স্পষ্ট ও বিশ্বাস্য হইত, তাহা দীর্ঘ উপন্যাসেই সম্ভব, স্বল্পপরিসর ছোট গল্পে ইহার আভাসমাত্র সূচিত হইতে পারে। বিজলীর মদোন্মত্ত লালসাপঙ্কিল জীবন, তাহার মধ্যে প্রকৃত প্রণয়ের পূর্বরাগ, প্রত্যাখ্যানাহত প্রেমের বেদনা, ব্যর্থপ্রণয়িনীর কাতরতা, অনুতপ্ত পতিতার

ত্যাগ—এক ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে এই সকল বিচিত্র এবং পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের চিত্র আঁকা হইয়াছে। যাহা উপন্যাসে সুন্দর, স্বাভাবিক হইত, ছোট গল্পে তাহাই হইয়াছে আকস্মিক, অতিনাটকীয়।

'পথনির্দেশ' আর একটি প্রণয়ের গল্প। হেমনলিনীর সঙ্গে বিজলী বাইজীর চরিত্রগত সাদৃশ্য নাই। তাহাদের জীবনের ধারাও বিভিন্ন, কিন্তু উভয়ের কাহিনীই ছোট গল্পের পক্ষে অনুপযোগী। গুণীনের সঙ্গে হেমনলিনীর প্রণয়ের আলোচনা স্থানান্তরে করা হইয়াছে। এইখানে শুধু একটি কথা বলা প্রয়োজন। গুণীনের বাড়ীতে হেমনলিনীর আশ্রয়লাভ, গুণীনের সঙ্গে একত্র পাঠাভ্যাস, গুণীনের প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার, তাহার বিবাহ, তাহার বৈধব্য ও বিবাহের মূল্যহীনতা সম্বন্ধে তাহার মত জ্ঞাপন, গুণীনের প্রণয়প্রস্তাব ও তাহার প্রত্যাখ্যান, শ্বশুরবাড়ীতে প্রত্যাবর্তন ও গুণীনের বাড়ীতে পুনরাবর্তন—এই সব ঘটনা ও নানাভাবের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া এত ক্ষিপ্রগতিতে বর্ণিত হইয়াছে যে গ্রন্থপাঠান্তে সমস্ত কাহিনীকেই একটি অস্পষ্ট ছায়াবাজির মত মনে হয়। হেমনলিনীকে সজীব মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, মনে হয় যে একটি কলের পুতুল, দম দিয়া দিলে একবার এদিক আর একবার ওদিকে আন্দোলিত হইবে। কিরণময়ী, অচলা, রাজলক্ষ্মী—ইহাদের জীবনের ইতিহাস হেমনলিনীর কাহিনী অপেক্ষা কম বিস্ময়কর নহে, কিন্তু বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য ঐ সকল রমণীর ভাগ্যবিপর্যয় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। 'পথনির্দেশ' ছোট গল্প, তাহার মধ্যে দীর্ঘ বর্ণনা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ঘটনাবহুলতার অবকাশ নাই। ছোট গল্পের অপরিহার্য সংক্ষিপ্ততার জন্য কাহিনীর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'কাশীনাথ'। ইহাতে যে-সব কাহিনী আছে তাহাদের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের সূচনা আছে। এখানেও দেখি নারীর প্রতি সেই গভীর সহানুভূতি, সেই স্পষ্ট, সবল অথচ অতিমধুর প্রকাশভঙ্গী। কিন্তু এই ছোট গল্পগুলিতে যে-সকল আখ্যায়িকা আছে তাহারা সুদীর্ঘ উপন্যাসেই শোভন হইত। 'কাশীনাথ' গ্রন্থে প্রেমের গল্প আছে তিনটি: 'আলো ও ছায়া', 'মন্দির' ও 'অনুপমার প্রেম'। তিনটি গল্পেই নিষিদ্ধ প্রেমের বিশুদ্ধতার চিত্র আঁকা হইয়াছে, চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে শরৎপ্রতিভার ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রতিভার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। স্বল্পপরিসর ছোট গল্পে এইরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। এইখানে একটি কেন্দ্রীয় ঘটনাকে আশ্রয় করা প্রয়োজন। উল্লিখিত

গল্পতিনটি কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, মনে হয় ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি দীর্ঘ উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, ছোট ঘটনাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, আখ্যায়িকার মুখ্য অংশও শুধু আভাসেই বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে চরিত্রগুলিও পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, এবং গল্পগুলিকে দীর্ঘ উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া মনে হয়। 'আলো ও ছায়া' গল্পের আরম্ভ হইয়াছে যজ্ঞদত্ত ও বালবিধবা সুরমার অবৈধ প্রণয় লইয়া। এই চিত্রটি অতি সুন্দর, ইহাদের সম্বন্ধ স্নেহে, আনন্দে ভরপুর, কিন্তু ইহার মধ্যে বিষাদের ছায়াও আছে। সুরমা মনে করে তাহার জন্য যজ্ঞদত্ত নিজের জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতেছে, এই ব্যর্থতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে যজ্ঞদত্তকে বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইল। যজ্ঞদত্তের বিবাহে তাহার মন যুগপৎ উৎসাহ ও নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির লুকোচুরির চিত্র অতি অপরূপ হইয়াছে। নিজে সে সাগ্রহে সম্বন্ধ আনিয়াছে, কিন্তু যজ্ঞদত্তের ইহাতে উৎসাহ আছে দেখিয়া নৈরাশ্যে তাহার মন ভরিয়া গিয়াছে। এইখানে সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রের পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে। কিন্তু এই গল্পের শেষের অংশ প্রথমার্ধের তুলনায় নিকৃষ্ট হইয়াছে। বিবাহের পরই যজ্ঞদত্ত বুঝিয়াছে যে তাহার মস্ত ভুল হইয়া গিয়াছে, তাহার কেবলই মনে হইয়াছে, সে অপরাধ করিয়াছে আর সুরমা প্রাণপণে ক্ষমা করিতেছে। ইহার পর যজ্ঞদত্ত তাহার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। ভর্তার দায়িত্ব ও প্রণয়ীর কর্তব্যের মধ্যে সে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু যজ্ঞদত্ত তো স্ত্রীর শুধু ভর্তাই নহে, তাহার মনে প্রতুলকুমারীর প্রতি কি কোন আকর্ষণ হয় নাই?—সেই আকর্ষণের সঙ্গেই সুরমার প্রতি প্রেমের প্রকৃত দ্বন্দ্ব। যজ্ঞদত্তের মনে দুই রমণীর প্রতি যে পরস্পরবিরুদ্ধ আসক্তির সঞ্চার হইয়া থাকিবে, তাহার কোন পরিচয় গল্পে নাই। এই আকর্ষণের চিত্র আঁকিতে হইলে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন, ছোট গল্পে তাহার অবকাশ নাই। এই কারণেই গল্পের শেষের দৃশ্য অতিনাটকীয় হইয়াছে।

'মন্দির' গল্পটিতে শ্রেষ্ঠ আর্টের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশবে বালিকার মনে দেবতা ও দেবমন্দিরের প্রতি যে আকর্ষণ জাগিয়া উঠিয়াছে কৈশোরে ও যৌবনে সেই আকর্ষণ বর্ধিত হইয়া প্রণয়াসক্তির বিরুদ্ধতা করিয়াছে। আবার এই দুই প্রবৃত্তি জড়াইয়া গিয়া পরস্পরের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। মন্দিরের প্রতি অনুরক্তি অপর্ণার স্বামিপ্রীতির অন্তরায় হইয়াছিল, আবার

শক্তিনাথের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল মন্দিরে। শৈলেশ্বরের মন্দিরে তিলোত্তমা-জগৎসিংহের মিলনের মত এই মিলন আকস্মিক নহে, কারণ অপর্ণা মন্দিরের পূজারিণী আর শক্তিনাথ তাহার পূজারী ব্রাহ্মণ। আর একটি ঐক্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অপর্ণা দুইটি পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল; উভয়ের সম্ভাষণ চরমে পঁহুছিয়াছিল গন্ধদ্রব্যের উপহারে এবং উভয়ের উপহারই সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। শুধু যে অপর্ণার চরিত্রের অভিব্যক্তি সুন্দর হইয়াছে তাহাই নহে, এই গল্পের গঠনকৌশলও অনবদ্য। অবশ্য, কেহ কেহ এই অতিরিক্ত কৌশলের নিন্দা করিবেন, এইখানে সবই যেন একটি নিয়মে বাঁধা, কোথাও শৃঙ্খলার অভাব নাই, কোথাও অপ্রত্যাশিত কিছু নাই। সামঞ্জস্যের এই আতিশয্য গল্পটির উপর অবাস্তবতার ছায়াপাত করিয়াছে। গল্পটির সম্পর্কে আরও একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। শক্তিনাথের প্রতি অপর্ণার মনে ঠিক কি ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট হয় নাই। ইহার মধ্যে কতখানি স্নেহ, কতখানি করুণা, কতখানি প্রীতি এবং অন্য সকল ভাবের অন্তরালে কতটুকু প্রেম লুকাইয়া ছিল তাহা বুঝা যায় না। নানা ভাবের আনাগোনার চিত্র স্পষ্ট হয় নাই; ইহার জন্য সুদীর্ঘ উপন্যাসের প্রয়োজন। শক্তিনাথের মৃত্যু গল্পের অনিবার্য পরিণতি নহে, মনে হয় গল্পটিকে তাড়াতাড়ি শেষ করিবার উদ্দেশ্যে এই মৃত্যুর পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

'অনুপমার প্রেম' গল্পটির মধ্যেও শরৎপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়; নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ললিতমোহনের প্রেমের বিশুদ্ধতা, তাহার জন্য অনুপমার সহানুভূতি, অনুপমার নিজের জীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনী এই গল্পটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এইখানেও ঘটনাবাহুল্যের জন্য ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় নাই, মানবহৃদয়ের রহস্য কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। আবার কাহিনীর যে বিচিত্র সম্ভাবনা ছিল তাহাও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই, কারণ ছোটগল্প সংক্ষিপ্ত, উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বিস্তীর্ণতা এইখানে প্রত্যাশা করা যায় না। প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল এই গল্পে উপন্যাস-পড়া নায়িকার মানসিক বিকারের চিত্র আঁকা হইবে। কিন্তু অনুপমার জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা যে-কোন সুস্থ, অবিকৃতচিত্ত রমণীর জীবনে ঘটিতে পারিত এবং অবস্থাবিপর্যয়ে অনুপমা যেরূপ আচরণ করিয়াছে তাহার মধ্যে বিকারের লক্ষণ নাই বলিলেও হয়। একটির পর একটি করিয়া বহু আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়াছে

এবং এই ঘটনাগুলিকে একটি স্বল্পপরিসর ছোটগল্পের মধ্যে সাজাইতে হইয়াছে। ঘটনার এই বাহুল্যে অনুপমার চরিত্র বিকশিত হইতে পারে নাই।

'ছবি' গল্পের প্রতিবেশ ছবির মত সুন্দর। উপাখ্যানের ঘটনাস্থল সুদূর বর্মার একটি গ্রাম; সময় সেই অনতিসুদূর কাল যখন ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসে নাই, যখন পর্যন্ত তাহার নিজের রাজা-রাণী ছিল, পাত্র-মিত্র ছিল, সৈন্যসামন্ত ছিল। গল্পের নায়ক চিত্রকর বা-থিন রূপবান্ যুবক, নায়িকা মা-শোয়ে রূপবতী যুবতী, অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী। মা-শোয়ে বা-থিনের নিকট বাগ্‌দত্তা, আবার তাহার উত্তমর্ণ। দুইজনে আশৈশব একসঙ্গে "খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে—আর ভালবাসিয়াছে"। বা-থিন ছবি আঁকিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে চায়, তাহার কর্তব্যে সে তিলমাত্র অবহেলা করে না। তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা মা-শোয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও ইহা ক্ষণিক বিরূপতাও আনিয়াছে। কারণ কোন আমোদ আহ্লাদেই মা-শোয়ে তাহার প্রিয়তমকে পায় না—সে কেবল ছবি আঁকে! এমন কি মা-শোয়ে গল্প করিতে বসিলেও বা-থিন যেন বিরক্ত হয়—কারণ নির্ধারিত দিবসে তাহাকে ছবি দিতেই হইবে। বা-থিনের চরিত্র অতি অপরূপ হইয়াছে। তাহার ধৈর্য, স্থিরতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কোমলতার চিত্র অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। অবশ্য আর্টের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে তাহার পরাজয়ের কাহিনী। মা-শোয়ের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, মা-শোয়ের বাড়ীতে যাইয়া সে অপমানিত হইয়া আসিয়াছে। সে নিজের ছবি লইয়া নিমগ্ন রহিয়াছে, বহির্জগতের মান-অপমান সম্পর্কে সে উদাসীন রহিয়াছে। কিন্তু তাহার ছবি ফেরৎ আসিল, কারণ গোপার ছবি আঁকিতে যাইয়া সে নিজের অলক্ষিতে মা-শোয়ের মুখ আঁকিয়া ফেলিয়াছে—"এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিয়াছে—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহারই মা-শোয়ে।"

মা-শোয়ের চরিত্রাঙ্কন এত নিপুণ হয় নাই এবং এইখানেই গল্পের মৌলিক ত্রুটি। বা-থিন অতিরিক্ত কর্তব্যনিষ্ঠায় তাহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে মনে করিয়া অভিমানাহত রমণী ক্ষুব্ধ হইয়া বা-থিনকে পরিত্যাগ করিয়াছে; তাহাকে অপমান করিয়াছে। এই সময় তাহার সঙ্গে পরিচয় হইল অসীম-সাহসী বলিষ্ঠ বীর পো-থিনের, এবং পো-থিন অচিরেই তাহার প্রণয়প্রার্থী

হইল। একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরেই মা-শোয়ে জানিতে পারিল এই বলিষ্ঠ যুবক চরিত্রের দিক দিয়া বা-থিন অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং তাহাকে মা-শোয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া আদর-আপ্যায়ন করিলেও ইহার প্রতি তাহার মন বিতৃষ্ণা ও বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। অথচ ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই সে তাহার জীবন যাত্রা নূতন করিয়া সুরু করিল এবং ইহারই সাহায্যে সে বা থিনকে লাঞ্ছিত করিতে উদ্যত হইল। বা-থিনের জন্য সে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু উপযাচক হইয়া বা-থিন তাহার কাছে উপস্থিত হইলে সে তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় দিয়াছে। মা-শোয়ের মনে যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই অলীক, সে মনে মনে কখনও বা থিন ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি আসক্ত হয় নাই। যদি পো থিনের জন্য মা শোয়ের মনে সত্য সত্যই কোন আকর্ষণ থাকিত তাহা হইলেই এই গল্পের প্লট জমিয়া উঠিত। কিন্তু তাহা হইলে এই গল্প 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মত দীর্ঘ হইত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখিত।

'বিলাসী' গল্পটিকে ঠিক গল্প বলা যায় কিনা সন্দেহ, কারণ বিলাসীর জীবনকাহিনীকে আশ্রয় করিয়া প্রবন্ধাকারে বহু মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সব মন্তব্য গল্পে সুসমঞ্জস হইবে না সন্দেহ করিয়া গ্রন্থকার পাদটীকায় জানাইয়াছেন যে ইহা জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরী হইতে নকল। বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের কাহিনী তাহার উচ্ছ্বাস প্রকাশের উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু পল্লীবালকের আবেগময় বক্তৃতার মূল্য যাহাই হউক না কেন, গল্প হিসাবেও ইহা উৎকৃষ্ট। মৃত্যুঞ্জয়ের বাল্যজীবনের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে তাহার জীবনযাত্রার ধরণ অন্য পাঁচজনের পদ্ধতি হইতে পৃথক—সে সাহসী, নিঃসঙ্গ, প্রচলিত সংস্কারে আস্থাহীন, এবং হৃদয়বান্। তাহার সঙ্গে বিলাসীর পরিচয় হইল কঠিন রোগের মারফতে, যে রোগের মধ্যে নির্জন গৃহে মেয়েটি কুণ্ঠাহীন, বিশ্রামহীন, সহায়হীন সেবার দ্বারা ধীরে ধীরে তাহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া আসিল। এই নির্জন সেবাকক্ষের বাহিরে রহিল বাঙলার পল্লীর হৃদয়হীন সমাজ, বিচারহীন আচার, প্রীতিহীন ধর্ম। রোগমুক্তির পরে তাহাদের বিবাহ হইল ও তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা সুরু করিল। তাহাদের আনন্দমধুর জীবনযাত্রার বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও খুব ইঙ্গিতময়, কারণ এই স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসলব্ধ নহে, ইহাকে তাহারা ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে পায় নাই, ধর্ম, সংস্কার ও পুঞ্জীভূত বাধাকে অতিক্রম করিয়া পাইয়াছে।

ইহার মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর মনোভাবের বৈপরীত্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিলাসী রমণী—স্বভাবতঃ কোমলহৃদয়। যাহা পাইয়াছে তাহাকে সে সযত্নে আঁকড়াইয়া রাখিতে চাহে, বারংবার ভাগ্যপরীক্ষা করিতে তাহার শঙ্কা হয়, তাই মৃত্যুঞ্জয়কে সাপ ধরিতে দিতে তাহার ঘোরতর আপত্তি। মৃত্যুঞ্জয়ের কথা স্বতন্ত্র। বিলাসীকে বিবাহ করিতেই সে বহু জিনিষ ত্যাগ করিয়াছে—জাতি, কুল, মান, ধর্ম্ম, সম্ভ্রম। সে যাহা পাইয়াছে, অনেক ত্যাগ করিয়া, অনেক সাহস করিয়াই পাইয়াছে। কাজেই সে নিঃশঙ্ক, জীবনও তাহার কাছে তুচ্ছ। একদিন সাপ ধরিতে যাইয়া এই দুঃসাহসী যুবক নিয়তির কাছে শেষ পরীক্ষায় পরাজিত হইল। সর্পদংশনের ফলে তাহার ইহলীলা সাঙ্গ হইল—তাহার বাপমায়ের দেওয়া নাম, শ্বশুরের মন্ত্রৌষধি সবই মিথ্যা প্রমাণিত হইল। ইহার সাতদিন পর বিলাসী আত্মহত্যা করিল। এই গল্পটি সংক্ষিপ্ত। এইখানে কোন জটিল মনস্তত্ত্বব্যাখ্যার অবকাশ নাই। অথচ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ। মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর কাহিনী শুধু তাহাদের ব্যক্তিগত কাহিনী নহে; তাহার পশ্চাতে বাঙলার হিন্দুসমাজের আচারভীত, স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণতার যে পটভূমিকা রহিয়াছে গ্রন্থকার তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহারই জন্য এই কাহিনীতে একটি পরমাশ্চর্য বিস্তৃতি ও গভীরতা আসিয়াছে।

প্রকাশভঙ্গীর সম্বন্ধেও একটি কথা বলা প্রয়োজন। ন্যাড়ার ডায়েরীতে অনেক বক্তৃতা আছে; ডায়েরীতে বর্ণিত ঘটনার সে সাক্ষী এবং তাহাতে তাহার নিজেরও অংশ আছে। তাহার মন্তব্যগুলি নিরপেক্ষ নহে, সংযত নহে, তবু ইহাদের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষতা ও সজীবতা আছে যাহা শুধু নাটকেই পাওয়া যায়, গল্প ও উপন্যাসে তাহা সুলভ নহে। অথচ এই উচ্ছ্বসিত মন্তব্য-গুলিতে কোথাও গল্পের সহজ, সাবলীল গতি ব্যাহত হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর জীবনযাত্রা তাহার নিজের গতিতে চলিয়াছে, ন্যাড়া তাহাদের জীবনযাত্রায় যোগ দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার সহানুভূতি, প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অবধি নাই; তাহার আবেগময়ী বক্তৃতায় কাহিনীটি সজীব হইয়াছে, কোথাও বাধা পায় নাই।

'অনুরাধা' গল্পের সঙ্গে 'দত্তা'র আখ্যানগত সাদৃশ্য আছে। এই কাহিনীতে যে-প্রেমের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে কলঙ্কের স্পর্শ নাই এবং নায়ক-নায়িকার প্রেমের পথে বাধা জন্মাইয়াছে পারিবারিক কলহ। কিন্তু 'অনুরাধা'য় 'দত্তা'র সৌন্দর্য নাই। এই গল্পে রাসবিহারী ও নলিনীর অনুরূপ কোন চরিত্র নাই এবং বিজয়ার মনে যে দ্বন্দ্ব হইয়াছে সেইরূপ দ্বন্দ্বের আভাসমাত্র এই গল্পে

নাই। অথচ আখ্যানভাগ ছোট গল্পের আখ্যানের মত সরল ও ছোট নহে। একটি জটিল কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বলায় তাহার বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিজয় ও অনুরাধার সাক্ষাতের পর গল্পের পরিণতি সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। বিশেষতঃ ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর অনুরাধার উপর কোন দাবী নাই বা তাহার প্রতি অনুরাধার কোন আকর্ষণ নাই। তারপর, অনিতা হইয়াছে আবছায়ার মত অস্পষ্ট। আখ্যায়িকায় বা চরিত্রসৃষ্টিতে—কোথাও কোন রহস্যের অনুসন্ধান নাই, কোন অপ্রত্যাশিত সত্যের আবিষ্কার নাই, প্রকাশভঙ্গীতেও কোন চাতুর্য নাই।

(২)

শরৎচন্দ্র চারিটি গল্প লিখিয়াছেন দাম্পত্য জীবনের কাহিনী লইয়া—'কাশীনাথ', 'বোঝা', 'দর্পচূর্ণ' ও 'সতী'। এই গল্প কয়টিতে দেখিতে পাই স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ সহজ নহে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহারা একে অপরের সংসর্গে সুখী হইতে পারিতেছে না। 'বোঝা' গল্পটি ট্র্যাজেডি। সত্যেন্দ্র তাহার তৃতীয়া স্ত্রীকে লইয়া সুখী হইয়াছিল কিনা সেই কথা গল্পে লিখিত হয় নাই। সরলার ও নলিনীর মৃত্যু, বিশেষ করিয়া নলিনীর জীবনের দুর্ভাগ্যময় পরিণতি গল্পের উপজীব্য। প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত মন লইয়া সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিল, তাই দ্বিতীয়া স্ত্রী নলিনীকে সে আপনার করিয়া লইতে পারিল না। ক্রমে তাহাদের আংশিক মিলন হইল বটে, কিন্তু খানিকটা ব্যবধান রহিয়াই গেল। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও নলিনী স্বামীর মন অধিকার করিতে পারিল না। দেখা গেল সামান্য কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠে। সত্যেন্দ্রনাথের অভিমান ও ক্রোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় নাই, যে সামান্য কারণে সে স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হইয়া তৃতীয়বার বিবাহ করিল তাহাতে তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়াই মনে হয়। গল্পের ইহাই কেন্দ্রীয় ঘটনা, কিন্তু ইহা অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক।

'কাশীনাথ' 'বোঝা' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যদিও ইহার গল্পাংশ উপন্যাসের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কাশীনাথ দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু নির্লোভ ও উদাসীন প্রকৃতির লোক। তাহার স্ত্রী কমলা স্বামীর প্রতি অনুরক্তা হইলেও অতিশয় অভিমানিনী, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ। ইহাদের দাম্পত্য জীবনের গোড়ায় রহিল একটি বড় জিনিষের অভাব—ইহারা পরস্পরের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিল না। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে সুখী করিতে

চাহে অথচ চরিত্রের বৈষম্যের জন্য ও অবস্থার বৈগুণ্যে তাহারা সুখী হইতে পারিতেছে না—ইহা পরম আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু ইহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে দম্পতির দৈনন্দিন জীবনের বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন। স্বামী ও স্ত্রীর মিলন ও দ্বন্দ্ব হয় প্রতিদিন নানা তুচ্ছ ঘটনায় এবং প্রাত্যহিকের এই তুচ্ছতাকে রূপ না দিতে পারিলে সেই মিলন ও দ্বন্দ্ব জীবন্ত হইবে না। ছোট গল্পে তাহা সম্ভব হয় না। সুতরাং শরৎচন্দ্র দুই একটি বড় বড় ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয় নাই। কমলা যে সমগ্র সম্পত্তির দাবী করিয়াছিল তাহার কারণ বুঝিতে পারি, কিন্তু ম্যানেজার কর্তৃক কাশীনাথের অপমান সম্পর্কে কমলা যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা একটু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অভিমানিনী কমলার চরিত্রেও ইহা সুসমঞ্জস নহে। কমলা নির্বোধ নহে, স্বামী তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেও স্বামীর কথা সে যে ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং স্বামীকে যে ভাবে তাড়াইয়া দিয়াছে তাহা স্বাভাবিক এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

'দর্পচূর্ণ' অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের লেখা, কিন্তু শরৎপ্রতিভার নিদর্শন হিসাবে ইহা মূল্যহীন। ধনীর কন্যা ঝোঁকের উপরে চরিত্রবান্, গুণবান্ স্বামীকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন তাহার সহিত ঘরকন্না করিতে গেলে তাহার অহঙ্কার, অর্থ ও ভোগের জন্য তাহার লিপ্সা ও অর্থহীনের প্রতি তাহার ঘৃণা প্রকাশিত হইয়া পড়া অসম্ভব নহে এবং ইহাতে স্বামীর জীবন বিষময় হইয়া যাইবে। বাঙলা দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় অগভীর; তাই যেখানেই ইহার চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, সেইখানেই তাহা প্রাণহীন ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। 'দর্পচূর্ণ' গল্পের নায়িকা ইন্দুমতীকে মানুষ বলিয়াই মনে হয় না, সে যেন নরেন্দ্রনাথকে পীড়ন করিবার যন্ত্র মাত্র,—অনুভূতি নাই, উপলব্ধি নাই, প্রাণ নাই। সে বুঝিয়াও বুঝে না; পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অচেতন। চরিত্রের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার তাহার মধ্যে অনুভূতি সঞ্চারের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু সেই চেষ্টা সার্থক হয় নাই এবং শেষের দিক্ বাদ দিলে, তাহাকে হৃদয়শীল মানব বলিয়াই মনে হয় না। এই গল্পের আখ্যান পরিকল্পনা অনবদ্য, কিন্তু ইহার চরিত্রগুলি (বিশেষ করিয়া নায়িকা ইন্দু) প্রাণহীন।

'সতী' গল্প শরৎপ্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ দান; ইহা সর্বদেশের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে। এই গল্পটি

ব্যঙ্গরসাত্মক ; কিন্তু এই ব্যঙ্গরস তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের দ্বারা তিক্ত হয় নাই। ইহা প্রভাতের আলোর মত উজ্জ্বল ও মধুর। অতিরিক্ত সতীত্বের সঙ্গে সন্দেহপরায়ণতার সংস্রব হইলে নিরীহ স্বামীর জীবন যে কত দুর্বিষহ হইতে পারে তাহার অতি মধুর ও অতিশয় সুস্পষ্ট চিত্র আঁকা হইয়াছে—এই চিত্র হাস্যরসে উজ্জ্বল, করুণায় স্নিগ্ধ।

যে দিক্ হইতেই এই গল্পের বিচার করা যায় ইহার অনন্যসাধারণ শিল্পচাতুর্যের কথা মনে হয়। প্রথমতঃ মনে হইবে ইহার গঠনকৌশল। খুব সংক্ষেপে হরিশ্চন্দ্রের বিবাহের ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। তারপর কয়েকটি অতিশয় কৌতুকাবহ ঘটনার সাহায্যে হরিশের দাম্পত্যজীবনের রেখা-চিত্র দেওয়া হইয়াছে। নির্মলার সন্দেহ এত গুরুতর, এত স্পষ্ট যে ইহার বর্ণনায় চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। এইরূপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে কখন অগ্ন্যুৎপাতের মত ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং কোন উপায়েই কোন লোক ইহার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না। নির্মলার সন্দেহের প্রত্যেক অভিব্যক্তিই অতর্কিত আবার প্রত্যেক অভিব্যক্তিই তাহার চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস। অতর্কিত ও স্বাভাবিকের এই অপূর্ব সম্মিলন এই গল্পের আর্টের একটি প্রধান উপাদান, কীর্তনওয়ালীর গান শোনার ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া নির্মলার বিষপান পর্যন্ত কাহিনীর একটি সুশৃঙ্খল প্রগতি লক্ষ্য করা যায়, অথচ কোথাও জটিলতা নাই, বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ নাই, ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ততার কথা কোথাও গ্রন্থকার বিস্মৃত হন নাই।

নির্মলার সন্দেহপরায়ণতা গল্পের বিষয়, কিন্তু ইহার কেন্দ্র হইতেছে উপদ্রুত, হতভাগ্য হরিশ। বেচারী যাহাই করুক না কেন, সতী স্ত্রীর অতন্দ্র দৃষ্টি হইতে নিস্তার পাইবে না। মক্কেলের সঙ্গে কথা বলা, কীর্তন শোনা, ক্লাবে যাওয়া কিছুই তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। সত্য কথা বলিয়া দেখিয়াছে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছে, কিছুতেই রক্ষা পায় নাই, সত্য ও মিথ্যা যেন একত্র হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। নিজে যে মিথ্যার প্রাচীর তুলিয়াছে আবদুলের একটি কথায়, লাবণ্যের নিঃশব্দ প্রগল্‌ভতায় তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, এমন কি মাটির দেবতা শীতলা পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে,—কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি নাই। মনে হয় সে যেন এক আগ্নেয়গিরির উপর দিয়া চলিয়াছে, যত সন্তর্পণেই চলুক, কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, এমন কি রোগ হইতে মুক্তিও এই উপায়হীন

জীবনের একটি চরম অভিশাপ। গল্পের উপসংহারও অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছে। লাঞ্ছনা যখন চরমে পৌঁছিয়াছে তখন মনের ক্ষোভে সে নিজেকে ব্রজনাথের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। শ্রীরাধার একনিষ্ঠ প্রেমের কথা যুগে যুগে গীত হইয়াছে, যুগে যুগে ভক্তগণ তাহার দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রেম ব্রজনাথের পক্ষে নিশ্চয়ই নিতান্ত অস্বস্তিকর হইয়া থাকিবে, এবং ইহারই কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্রজনাথ মথুরায় পলাইয়া থাকিবেন। রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর এই ব্যাখ্যা অতিশয় অভিনব এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হরিশের তুলনা অতি অপরূপ।

(৩)

'বাল্যস্মৃতি', 'হরিচরণ', 'একাদশী বৈরাগী', 'মামলার ফল', 'হরিলক্ষ্মী', 'পরেশ',—এই গল্পকয়টিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র দেওয়া হইয়াছে। 'একাদশী বৈরাগী' একটি নক্সা; ইহার প্লট নাই বলিলেই চলে। একাদশী বৈরাগী ছোটজাতীয়, তাহাতে অতিশয় কৃপণ এবং কুসীদজীবী। দেনাদারদের সঙ্গে তাহার ব্যবহার অতীব নির্মম; সে কাহারও এক পয়সা সুদ ছাড়ে না, কাহাকেও সহজে এক টাকা ধার দেয় না। অথচ কঠোর অর্থ-পিশাচের হৃদয়ে স্নেহের ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইত। পদস্খলিতা ভগিনীকে আশ্রয় দিতে যাইয়া সে জাতি, কুল, গ্রাম, সমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু তবু বিচলিত হয় নাই। তাহার স্নেহ যেমন অপরিসীম, সৎসাহসও তেমনি অতুলনীয়। এই ঘৃণিত, কঠিন লোকটির চরিত্রের আর একটি মহনীয় দিক্‌ও আছে। তাহার সৎসাহস ও স্নেহপরায়ণতা পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহার অনমনীয় সততার দ্বারা। নিজের প্রাপ্য সে ছাড়িয়া দেয় না; অপরের ন্যায্য পাওনা সে কখনও আত্মসাৎ করে না, এই সততা ও সৎসাহস কোমলস্বভাবা গৌরী ও কঠিনপ্রকৃতি একাদশীর মধ্যে যোগসূত্র। গল্পটি ছোট, ইহার প্লট নগণ্য, কিন্তু তবু গল্পের প্রথমে একাদশী বৈরাগী সম্বন্ধে যে ধারণা পাই, গল্পের উপসংহারে তাহা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অথচ এখানে কোন আকস্মিক ঘটনা নাই, প্রথমার্ধ ও অপরার্ধের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই।

'মামলার ফল', 'হরিলক্ষ্মী', 'পরেশ'—বৃহৎপরিবারভুক্ত লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা লইয়া এই তিনটি গল্প রচিত হইয়াছে এবং কেমন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার অন্তরালে মিলনের স্বর্ণসূত্র থাকে তাহাও গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। এই তিনটি গল্পের মধ্যে 'পরেশ' সর্বনিকৃষ্ট।

স্বার্থের প্রেরণায় কেমন করিয়া পরেশ তাহার প্রতিপালক স্নেহপরায়ণ জ্যাঠামহাশয়ের প্রতিকূলতা করিল তাহার বর্ণনা অস্পষ্ট হইয়াছে। গুরুচরণের মহত্ত্বের ও স্খলনের উল্লেখ আছে, কিন্তু কিরূপে ধীরে ধীরে এই পূজ্য লোকের স্খলন হইল তাহার পরিচয় নাই। যখন বাহিরের জগতে সে উৎপীড়িত হইতেছিল, তখন কেমন করিয়া তাহার অন্তর মেঘাচ্ছন্ন হইতেছিল তাহার আভাস মাত্র নাই। অথচ আর্টের দিক দিয়া সেই রহস্যই মুখ্য।

'মামলার ফল' গল্পের গঠনকৌশল অতিমনোহর। শিবু ও শম্ভুর দৈনন্দিন জীবনের অতি সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। বাঁশপাতা লইয়া তাহাদের কলহ। জিনিষ সামান্য—ইহা লইয়া দুই ভাই ও তাহাদের দুই স্ত্রী প্রতিদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিতেছে—বাক্‌যুদ্ধ, জমিদারের কাছে হাটাহাটি, থানায় নালিশ, অতঃপর আদালত। এই ভ্রাতৃবিরোধের মীমাংসা করিতে তৃতীয় পক্ষ পাঁচুও অংশদার হইয়াছে। মামলা যখন খুব পাকিয়া উঠিয়াছে, যখন সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত তখন সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল অতি অতর্কিতভাবে। প্রতিপক্ষ শম্ভু ও তাহার পুত্র গয়ারামের বিরুদ্ধে আইনানুমোদিত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করিয়া শিবু দেখিতে পাইল যে তাহার স্ত্রী গোপনে গয়ারামের কাছে আশ্রয় লইয়াছে। ইহার পরে শত্রুতার জের টানিয়া চলা শিবুর পক্ষে (বোধ হয় শম্ভুর পক্ষেও) অসম্ভব। গঙ্গামণির পলায়ন ও গয়ারামের কুটীরে তাহাকে আবিষ্কার—এই একটি অন-আকস্মিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে গঙ্গামণির চরিত্রও অপ্রত্যাশিতরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গঙ্গামণি 'পল্লীসমাজ'এর বিশ্বেশ্বরীর মত কল্পলোকের অধিবাসিনী নহে, সে সত্য সত্যই পল্লীসমাজের রমণী। গয়ারামের প্রতি তাহার স্নেহ আছে, কিন্তু সেই স্নেহে কোথাও অস্বাভাবিকতা নাই, আতিশয্যও নাই। ক্রোধের সময় গয়ারামকে সে নানা কটূক্তি করিয়াছে এবং গয়ারামের পিতা ও বিমাতার প্রতি তাহার বৈরিভাব শিবুর বৈরিতা হইতে কম নহে। গয়ারামকে আশ্রয় করিয়া ভ্রাতৃবিরোধ যে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিল ইহাতে সে গয়ারামের বিরুদ্ধতা করিবে না, ইহা নিশ্চিত হইলেও ঠিক কি ভাবে তাহার মাতৃস্নেহ আত্মপ্রকাশ করিবে তাহা পূর্বে অনুমান করা যায় নাই। সুতরাং গল্পের পরিণতি সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক না হইলেও অপ্রত্যাশিত। গঙ্গামণির চরিত্র যে-ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য কোথাও নাই, তবু মনে হয় গল্পের উপসংহারে আমরা মাতৃহৃদয়ের রহস্যের নূতন পরিচয় পাইলাম।

'হরিলক্ষ্মী' গল্পে হরিলক্ষ্মীর চরিত্রের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি অপূর্ব। ছোট গল্পে জটিল মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের অবকাশ নাই, কিন্তু এই গল্পে ছোট ছোট দুই একটি ঘটনার সাহায্যে মানবহৃদয়ের রহস্যের যে সন্ধান দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনা বিরল। গল্পের প্রথমাংশে অসাধারণত্বের চিহ্ন নাই। শরৎচন্দ্রের আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই শেষের অংশে যেখানে বিপিনের স্ত্রী কমলাব প্রতি লাঞ্ছনায় অধিকতর অপমানিত হইতেছে হরিলক্ষ্মী নিজে। হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া হরিলক্ষ্মী তাহাব বর্বর স্বামীকে প্রতিহিংসায় উদ্দীপিত করিল এবং তাহার পর প্রতিপক্ষকে ছোট করিতে যাইয়া হরিলক্ষ্মী নিজেই ছোট হইতে লাগিল। গল্পের পরিণতির মধ্যে দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাসের আভাস আছে বলিযা মনে হয। স্বামীর জিঘাংসাকে প্রশমিত করিতে যাইযা হরিলক্ষ্মী দেখিয়াছে যে, সে তাহার ইন্ধন জোগাইয়াছে মাত্র। মানবহৃদয়ের গতি অতি সূক্ষ্ম। হরিলক্ষ্মাকে খুসী কবিবার জন্য শিবচন্দ্রও তাহার পিসিমা কমলাকে পদে পদে উৎপীড়িত করিযাছে। সেই উৎপীড়ন কমলা নীবরে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এই বর্বর অত্যাচার ও উৎপীড়িতের নীরব সহিষ্ণুতায হরিলক্ষ্মী মুষড়িযা গিয়াছে। সে শুধু নিজের কাছেই ছোট হয় নাই, সে জানে কমলার কাছেও সে ছোট হইয়া গিযাছে। সে শুধু ভাবিয়াছে, "মেজবৌযের একটা সান্ত্বনা বাকী আছে—তাহা বিনা দোষে দুঃখ সহার সান্ত্বনা, কিন্তু তাহার নিজেব জন্য কোথায কি অবশিষ্ট রহিল?" এমনি করিয়া তাহার বিজয়মাল্য পরাজযের গ্লানিই বহন করিয়া আনিযাছে। মিথ্যা চুরির অভিযোগে মেজবৌকে "বিচাবের" জন্য তাহার কাছে ধরিযা আনা হইলে, "তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তাহার মনে হইল এত লোকেব সম্মুখে সেই যেন ধরা পড়িয়াছে এবং বিপিনের স্ত্রী-ই তাহার বিচার করিতে বসিয়াছে।"

'বাল্যস্মৃতি' ও 'হরিচরণ' দবিদ্র ভৃত্যের নিপীড়িত জীবন লইয়া রচিত। দরিদ্র লোকের জীবনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ইহাদের কথা তিনি যেখানেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেইখানেই ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার নিদর্শন রহিয়াছে। 'হরিচরণ' গল্পটি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। ইহার প্লট খুবই অকিঞ্চিৎকর এবং ইহাতে অবান্তর কথা আছে যথেষ্ট। ট্র্যাজেডির মূলে যে ঘটনা রহিয়াছে তাহা আকস্মিক, দুর্গাদাসবাবুর অত্যাচার অনিচ্ছাকৃত। জীবনে ও আর্টে আকস্মিকের স্থান নাই এমন নহে, কিন্তু তাহাকেই কাব্যে ও নাটকে কেন্দ্রীয় ঘটনা করিলে আর্টের ধর্ম রক্ষা করা যায় না। যাহা অতর্কিতে আসিয়াছে তাহার সঙ্গে স্বাভাবিক ও প্রাত্যহিকের সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে।

'বাল্যস্মৃতি' গল্পটি নিখুঁৎ। গদাধর ঠাকুরের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস অতি নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে মেসে সে চাকুরি করিত এবং যে-ভাবে তাহাকে চাকুরি করিতে হইত তাহার বর্ণনার দ্বারা গদাধরের জীবনের প্রতিবেশ রচিত হইয়াছে—এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর। তারপর চিম্‌নি ভাঙা, টাকাচুরি, তাহার কর্মচ্যুতি এবং দেড় টাকা মনিঅর্ডারযোগে পাঠান—এই কয়েকটি সামান্য ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাহার জীবনের কাহিনী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনায় কোথাও আতিশয্য নাই, ঘটনাবাহুল্য নাই, কিন্তু কোথাও অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। তুলির দুই একটি টানে চিত্র পরিপূর্ণ, প্রোজ্জ্বল ও সজীব হইয়াছে। এই গল্পের আর একটি বিশেষত্ব আছে। শুধু যে গদাধরের কাহিনীই নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে, সুকুমারের শিশুহৃদয়ও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। গদাধরের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা তাহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি গদাধরের সংস্পর্শে আসিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহার অভিজ্ঞতার গণ্ডি পরিবর্ধিত হইয়াছে।

'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ'—এই গল্প দুইটিও দুর্ভাগা দরিদ্রের জীবনের ইতিহাস লইয়া রচিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে—বিশেষতঃ 'মহেশ' গল্পে যে শিল্পচাতুর্য আছে তাহা অনন্যসাধারণ। এই দুইটি কাহিনীতে যে সকল নারীর কথা বলা হইয়াছে তাহারা মুখ্য হইয়াও গৌণ, যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের কোন নিজস্ব মূল্য নাই। গল্পের নায়কনায়িকার সাহায্যে বৃহত্তর সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এইখানে অতি অপরূপ উপায়ে পটভূমিকাকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং পটভূমিকার মূল্যই বেশী। এই কারণে, এই দুইটি গল্পে যে বিস্তীর্ণতা আছে তাহা সাধারণতঃ ছোট গল্পে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ ছোট গল্প একটি কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে এবং বৃহত্তর সমাজের চিত্র দিতে হইলে বিরাট উপন্যাসের প্রয়োজন হয়। বৃহত্তর সমাজের প্রতি গ্রন্থকারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া আজকালকার উপন্যাস দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছোট গল্পের সাহায্যে বিরাট পল্লীসমাজকে রূপ দিয়াছেন। এই দুইটি গল্পে বিশালায়তন উপন্যাসের বিস্তৃতি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সঙ্গে ছোট গল্পের রসঘন নিবিড়তার সমন্বয় হইয়াছে। 'অভাগীর স্বর্গ' 'মহেশ' অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ স্বামিপরিত্যক্তা অভাগীর ব্যক্তিগত কাহিনী অতিরিক্ত প্রাধান্য পাইয়াছে। জমিদারের গোমস্তা, দরওয়ান, মুখুয্যে মশায়, তাহার পুত্র, নাপতে বৌ, বিন্দী পিসী, রসিক

বাঘ—ইহাদের সবাইকে লইয়া যে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে তাহার চিত্র অভাগীর জীবনকে বিশালতা দিয়াছে, কিন্তু তবু অভাগীর নিজস্ব দুর্ভাগ্য মাঝে মাঝে পটভূমিকাকে অস্পষ্ট করিয়াছে।

'মহেশ' শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। পৃথিবীর সাহিত্যে খুব কম ছোট গল্পেরই নাম করা যায় যাহার মধ্যে অনুরূপ বিস্তৃতি ও নিবিড়তা আছে। এই গল্পে বাঙলা দেশের কৃসকের উপদ্রুত, দুর্ভাগ্যময় জীবনের কাহিনী বিচিত্র বর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। গফুর নিরন্ন কৃষক, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সে অতিকষ্টে নিজের ও কন্যার আহার সংস্থান করিতে পারে। ইহার উপরে অজন্মা হইলে সেই ক্ষীণ আহার ক্ষীণতর হইয়া পড়ে; তাহার মেয়ে জানে যে ভাতের ফ্যান পযন্ত ফেলিতে পারা যায় না, ইহাও তাহাদের আহাযের উপাদান। যে ঘরে তাহাদের বাস তাহা জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইতেছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জাসম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। ভগবানের দেওয়া জল পর্যন্ত তাহাদের দুষ্প্রাপ্য, কারণ তাহারা অস্পৃশ্য, পুকুরের জল নিজেরা ছুঁইতে পারে না; অন্য সবাই পর্যাপ্ত ও অপযাপ্ত পরিমাণে লইয়া দয়া করিয়া একটু দিলে তাহারা পাইতে পারে।

এই দরিদ্র কৃষকের একমাত্র সঙ্গী ও বন্ধু তাহার ষাঁড় মহেশ। কসাইয়ের কাছে ষাঁড় প্রিয় বস্তু, সে ইহা কাটিয়া বিক্রী করে। ব্রাহ্মণের কাছে গো দেবতা, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম আচারের আতিশয্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাই ব্রাহ্মণের নিকট জীবন্ত গরু অপেক্ষা গো সম্বন্ধীয় আচারই সত্যতর। কিন্তু গফুর দরিদ্র কৃষক—তাহার পক্ষে মহেশ অন্নদাতা, বন্ধু, তাহার দারিদ্র্যের সাক্ষী ও সহচর। ব্রাহ্মণ জমিদার গোচরভূমি আত্মসাৎ করিয়াছে, গফুর পাযে ধরিলেও একটি খড় ছাড়িয়া দেয় নাই। গফুর নিজে না খাইয়া মহেশকে খাওয়াইয়াছে, খড়ের অভাব হইলে নিজের আবাসগৃহের তৃণ তাহাকে দিয়াছে। জমিদার মহেশকে খোঁয়াড়ে দিয়াছে, গফুর নিজের শেষ সম্বল বাঁধা দিয়া মহেশকে খালাস করিয়াছে। গফুর নিরুপায় হইয়া মহেশকে কসাইযের নিকট বিক্রী করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু কার্যকালে তাহা পারে নাই। কসাই যে ভাবে মহেশের চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করিযাছে ইহাতে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ জমিদার এই অ-হিন্দু প্রস্তাব শুনিযা বিধর্মী গফুরকে সাজা দিয়াছে, গফুর অম্লানবদনে ন্যায্য শাস্তি গ্রহণ করিযাছে। উপায়হীন, অপমানিত, ক্ষুধার্ত গফুর ক্ষোভে, ক্রোধে, উৎপীড়নে জ্ঞানশূন্য হইয়া মহেশকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তর্করত্ন তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছে। সেই প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে

তাহার ঘরবাড়ী ঘটি থালা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে চটকলের কাজে—পূর্বে শত দুঃখেও যেখানে যাইতে তাহাকে সম্মত করান সম্ভব হয় নাই।

এই গল্পের আর্ট অতি অপূর্ব। মহেশকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীসমাজের বহু প্রতিনিধির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—ব্রাহ্মণ জমিদার, শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তর্করত্ন, কায়স্থ গৃহস্থ মাণিক ঘোষ, গো-ব্যবসায়ী কসাই, গো-প্রতিপালক কৃষক গফুর। ইহাদের চরিত্র দুই একটি কথায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, আর গফুরের সঙ্গে অন্য সকলের পার্থক্য সর্বত্র দেদীপ্যমান হইয়াছে। বর্ণনার বাহুল্য নাই, বর্ণের প্রাচুর্য নাই, কিন্তু তবু চিত্রটি হইয়াছে সর্বাঙ্গসুন্দর। মনে হয় চিত্রকর পটের উপরে দুই একটি রেখা টানিয়া দিয়াছেন এবং সমগ্র পট অপরূপ আলেখ্যে ভরিয়া গিয়াছে। এই গল্পের আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মূক মহেশ পর্যন্ত মানুষের কাহিনীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। মনে হয়, সে যেন সব বুঝিতে পারিতেছে, সে নীরবে সকল অন্যায়, সকল অত্যাচার সহ্য করিতেছে এবং যখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্যই বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নাটক

শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক। তিনি নাটক লিখেন নাই, তাঁহার কয়েকখানা উপন্যাস অভিনয়ের জন্য নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন মাত্র। নাটক ও উপন্যাসের আর্টে অনেক পার্থক্য আছে। নাটক দৃশ্যকাব্য, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার জন্যই ইহা সাধারণতঃ রচিত হইয়া থাকে। দর্শক অল্প সময়ের জন্য অভিনয় দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে চায়। এই সময়ের মধ্যে কোথাও সে চুপ করিয়া বসিয়া অদৃশ্য তত্ত্ব বা রহস্যের চিন্তা করিবে না, তাই প্রত্যেক মুহূর্তেই খানিকটা বিস্ময়কর, মনোহারী ঘটনার প্রয়োজন। এই কারণে নাটকের প্লট সুদীর্ঘ বা জটিল হইতে পারে না। অথচ তাহার মধ্যে ঘন ঘন পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য না থাকিলে দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার সাহায্যে নাটকের প্লট গড়িয়া উঠে না, কোন একটি বিষয় লইয়া অধিকক্ষণ বিব্রত থাকিবার মত অবকাশ নাটকের নাই, ইহার প্লট সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পপরিসর, কিন্তু ঘটনাবহুল এবং বৈচিত্র্যময়। ঘন ঘন পট পরিবর্তন

করিতে হয় বলিয়া, নাটকের কাহিনী শুধু যে বৈচিত্র্যময় হয় তাহাই নহে, তাহা খুব সচলও হয়। চিত্রশিল্প মানবজীবনের স্থিতিশীলতার পরিচয় দেয়, নাট্যাভিনয়ে আমরা জীবনের পরিবর্তনশীলতা ও দ্রুতগতির আলেখ্য পাই।

নাটক প্রধানতঃ অভিনয়ের জন্য রচিত হইয়া থাকে এবং অভিনয়ের সুবিধা অসুবিধার উপর তাহার রূপ নির্ভর করে। নাট্যাধিকারীর অধীনে অগণিত অভিনেতা থাকে না, সুতরাং নাটকের 'পাত্রপাত্রী'র সংখ্যা খুব বেশী হইলে চলিবে না। টমাস হার্ডির The Dynasts-কে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা যে-কোন নাট্যসঙ্ঘের পক্ষেই কষ্টকর। এই জন্যই নাটকের কাহিনী হয় উপন্যাসের কাহিনী অপেক্ষা স্বল্পপরিসর। তারপর, যে কাহিনীতে দীর্ঘদিনের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে তাহাকে অভিনয় করিতে নানা অসুবিধা। এই চরিত্রে বাল্য হইতে পরিণত বয়সের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে সেই ভূমিকায় একাধিক অভিনেতাকে গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহা হইলে অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। Buddenbrooks জাতীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া অসম্ভব। 'বিরাজবৌ' উপন্যাসে পুঁটির শৈশব ও যৌবনের চিত্র আছে। এই উপন্যাসকে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করিয়া নাট্যমন্দিরে যে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে দুইজন অভিনেত্রীর সাহায্যে পুঁটির জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, কিন্তু তবু মনে হইয়াছে যে এই অভিনয়ে একটি মৌলিক অবাস্তবতা রহিয়াছে।*

নাটকের লেখককে আরও একটি দিক লক্ষ্য করিতে হয়। সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কৃতিত্ব সমান নহে। দর্শকগণ প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে বারংবার দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কৃতিত্বের উপর নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং নাটকে নায়কনায়িকার স্থান খুব বড, তাহাদের চরিত্র বিকাশ করিবার জন্যই যেন অন্যান্য চরিত্রগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। জনৈক বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন, উপন্যাসাকারে লিখিত হইলে হ্যাম্‌লেট আরও উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ হইত। হ্যাম্‌লেট নাটকের কাহিনী এত জটিল ও দীর্ঘ যে উপন্যাসই বোধ হয় ইহার উপযুক্ত বাহন, কিন্তু উপন্যাস হ্যাম্‌লেটে ডেনমার্কের রাজকুমারের প্রাধান্য কমিয়া যাইত। 'দেনাপাওনা' বিশেষভাবে ষোড়শীর জীবন-কাহিনী, ইহার নাট্যরূপের নাম দেওয়া হইয়াছে 'ষোড়শী'। কিন্তু নাটকে জীবানন্দ হইয়াছে প্রধান ব্যক্তি, তাঁহাকেই কেন্দ্র

* একই অভিনেত্রী দিয়া কাজ চালাইলেও অবাস্তবতা দোষ দূর হইত না।

করিয়া কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রাধান্যের মূলে রহিয়াছে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়প্রতিভা।

শরৎচন্দ্রের নাটকগুলি প্রথমতঃ উপন্যাসাকারে লিখিত হইয়াছিল এবং তিনি প্রধানতঃ নাট্যকার নহেন। সুতরাং তাঁহার নাটকগুলিকে শুধু নাটক হিসাবে বিচার করিলে তাহাদের উপর সুবিচার করা হইবে কিনা সন্দেহ। তবু নাটককে নাটক হিসাবেই বিচার করিতে হইবে। শরৎচন্দ্র যে কয়খানা নাটক লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'রমা' ও 'বিজয়া'র বিষয়বস্তু নাটকের পক্ষে তেমন উপযোগী নহে। নাটক কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিনীত হয় বলিয়া তাহার বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির মধ্যে একটি সরল যোগসূত্র থাকা দরকার। একটি ঘটনার সঙ্গে অপর একটি ঘটনার সম্পর্ক স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, প্রত্যেকটি দৃশ্যের পরেই দর্শকের মনে কৌতূহল জাগিবে, ইহার পরিণতি কোথায়? অন্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা আসিলেই তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। উপন্যাস পড়া হয় ধীরে ধীরে; কাজেই তথায় বিস্তৃত বর্ণনার অবকাশ আছে। কিন্তু নাটকে কেন্দ্রীয় ঘটনা ও চরিত্রের পরিণতিকেই মুখ্য করিতে হইবে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে পল্লীসমাজের নানা বৈচিত্র্যের চিত্র আছে। বাঁড়ুয্যের সঙ্গে বনমালী পাড়ুইর, কৈলাস নাপিতের সঙ্গে সনাতন হাজরার কোন প্রত্যক্ষ সংস্রব নাই। রমা, রমেশ ও বেণী ঘোষাল—ইহারা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং সবাই ইহাদের সংস্রবে আসিয়াছে। ইহাদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির মধ্যে একটা সংযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, যদিও এই সংযোগ খুবই আল্‌গা ধরণের।

নাটকে এই শিথিলতা পরিবর্জনীয়। এই কারণে বর্তমান যুগের জনৈক শ্রেষ্ঠ লেখক চেষ্টারটন বলিয়াছেন যে, সামাজিক শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নাট্যাকারে লিপিবদ্ধ করা যায় না। যে সকল প্রতিভাশালী নাট্যকার সমাজশক্তিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা শিথিল ঘটনাবাহুল্যের মধ্যে ঐক্য আনিয়াছেন অতি অভিনব উপায়ে। তাঁহারা কোন একটি লোকের জীবনকে কেন্দ্র করেন এবং দেখাইতে চেষ্টা করেন যে নায়ক বা নায়িকার জীবনে যত বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্য দিয়া একই অভিজ্ঞতা আসিতেছে, তাহারা সবাই একই তথ্য বহন করিতেছে। কুমারী ভিভি ওয়ারেন বহু লোকের ও অনুষ্ঠানের ঐশ্বর্যের গোপন সত্যটি আবিষ্কার করিল এবং দেখিতে পাইল যে সর্বত্রই ঐশ্বর্যের সঙ্গে পাপের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ডাঃ হ্যারি ট্রেঞ্চ তাহার পরিচিত লোকের ঐশ্বর্যের মূলদেশ অনুধাবন করিয়া বুঝিতে পারিল যে, অভিজাতের আভিজাত্য

ও মধ্যবিত্তের ভদ্রস্থতার অন্তরালে রহিয়াছে দরিদ্রের নির্যাতন। এমনি করিয়া বার্ণাড শ' ব্যক্তির জীবন ও সমষ্টির শক্তির চিত্র আঁকিয়াছেন ও উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণও অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু 'রমা' নাট্যে এইরূপ কোন চেষ্টা নাই। ফলে, নাটকখানিকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্র ও ঘটনার সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, কোথাও যেন ঐক্য নাই, কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ নাই। এমন কি নায়ক রমেশও আসিয়াছে দর্শক ও দাতা হিসাবে, পল্লীসমাজের সঙ্গে তাহার কোন নিবিড় সম্পর্ক নাই। উপন্যাসে এই প্রকারের বিক্ষিপ্ততা তেমন মারাত্মক নহে, এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বর্ণনা থাকায় নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে একটি ঐক্যের আভাস পাওয়া যায়। নাটকে শুধু অপেক্ষাকৃত চমকপ্রদ কাহিনীই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাই নানা বিচিত্র কাহিনীগুলি কোথাও ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই। রমেশের জীবনে—তথা পল্লীসমাজের ইতিহাসে—কৈলাস নাপিত ও সেখ মতিলালের উচ্ছ্বাসহীন সঙ্কল্প সনাতন হাজরার বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক বেশী বড় জিনিষ, কিন্তু নাটকে সনাতন হাজরার বক্তৃতার স্থান হইয়াছে আর কৈলাস ও মতিলালের উল্লেখও নাই।

'দত্তা'র মধ্যে সমাজশক্তিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয় নাই, তবু ইহার কাহিনীও নাটকের পক্ষে উপযোগী নহে, এবং উপন্যাসের যে-সমস্ত নাটকোচিত গুণ ছিল, গ্রন্থকার নাটকে তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। নাটকের কাহিনী ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া শেষের দৃশ্যে চরমে পরিণত হয়, রমেডিতে কাহিনীর চরম মুহূর্তেই তাহার শেষ মুহূর্ত। দর্শকের কৌতূহল ও আগ্রহ স্তরে স্তরে প্রবর্দ্ধিত হইয়া উপসংহারে পরাকাষ্ঠা লাভ করে, যদি এই চরম মুহূর্ত নাটকের পুরোভাগে অথবা মধ্যভাগে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে নাটকের শেষের অংশ অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া যায়, দর্শকের উৎসাহ ম্লান হইয়া আসে। 'দত্তা' উপন্যাসে নরেন্দ্র ও বিজয়ার মিলনের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে রাসবিহারীর পরাজয়। বিজয়া ও রাসবিহারীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব নিঃশব্দে চলিতেছিল তাহার সমস্ত মুখোস খুলিয়া গেল সেই দৃশ্যে যেখানে বিজয়ার সম্পত্তির দলিল হস্তগত করিতে যাইয়া রাসবিহারী বিফলমনোরথ হইয়া গেলেন এবং বিজয়া তাহার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়া দিল। ইহাই নাটকের চরম মুহূর্ত। ইহার পর গল্পাংশকে সজীব রাখা কষ্টকর, ইহার পর যে রাসবিহারী রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তিনি যেন আর পূর্বেকার রাসবিহারী নহেন। উপন্যাসেও দেখিতে পাই, শেষের দিকে

রাসবিহারী যেন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু নাটকে নিষ্প্রভতা মারাত্মক ত্রুটিতে পরিণত হইয়াছে।

উপন্যাসে দেখিতে পাই নরেন্দ্র নলিনীর একত্র পঠনপাঠনের দৃশ্য দেখিয়া বিজয়ার মন নরেন্দ্র ও দয়ালের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছে। সে মনে করিয়াছে যে, সব পুরুষমানুষই স্বার্থপর এবং বিলাসের অপরাধই সবচেয়ে কম। তাই দয়ালের বাড়ী হইতে ফিরিয়া সে সন্তুষ্টচিত্তে বিলাসের সহিত বিবাহের দলিল সহি করিল। এইভাবে কাহিনীটির মধ্যে রস সঞ্চারিত হইয়া উঠিল, পাঠকের কৌতূহল পুনরায় উদ্দীপিত হইল। নাটকে শরৎচন্দ্র আখ্যায়িকার এই অংশকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, উপন্যাসের শেষভাগে যে নাটকোচিত সম্ভাবনা আছে নাটকে তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। দলিলে সহি করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র, প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হয় নাই। বিজয়া দয়ালের বাড়ী পরিত্যাগ করার পর নলিনী (ও দয়ালের স্ত্রী) তাহার ও নরেন্দ্রের মনোভাব ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই ব্যাখ্যা কোন নূতন রহস্যের সন্ধান দেয় না, ইহা নাটকের গতি প্রতিহত করিয়াছে। তাই মনে হয় নাটক এইখানেই (অথবা ইহার পূর্বেই) শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার পরের দৃশ্যগুলি আর জমিয়া উঠিতে পারে নাই, শেষের দৃশ্যে রাসবিহারীর চরম পরাজয়কে ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই অংশটাকে বাড়াইয়া গুছাইয়া নাটকোচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সেই চেষ্টা প্রশংসাই হইলেও সফল হয় নাই। গ্রন্থকার নিজেই ইহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

'দেনা পাওনা' শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ইহার কাহিনীতে নাটকীয় সম্ভাব্যতাও যথেষ্ট আছে। 'ষোড়শী' নাটকে সেই সম্ভাব্যতা সার্থক হইয়াছে। ইহার গঠনকৌশল অনবদ্য। চরিত্রের বিকাশের দিক্ দিয়া নাটকটি উপন্যাসের তুলনায় অনেকাংশে অপূর্ণাঙ্গ, কিন্তু গঠনকৌশলে 'ষোড়শী' 'দেনা পাওনা' অপেক্ষা নিকৃষ্ট তো নহেই বরং কোন কোন জায়গায় শ্রেষ্ঠত্বই দাবী করিতে পারে। ষোড়শীর সঙ্গে জীবানন্দের পরিচয়, হৈম-নির্মলের অভ্যাগম, ষোড়শীকে বহিষ্কৃত করিবার উদ্যোগ আয়োজন, জীবানন্দের বৈরিতা ও প্রণয়ভিক্ষা, ষোড়শীর পদত্যাগ এবং জীবানন্দের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও মৃত্যু—এই সকল নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া জীবানন্দ ও ষোড়শীর দেনা-পাওনার কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। কোথাও আতিশয্য নাই, গল্প কোথাও থামিয়া যায় নাই। প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে অপরাপর ঘটনার

ও মূল কাহিনীর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। 'দেনা পাওনা' উপন্যাসের আলোচনায় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "নির্মল হৈমবতীর আখ্যান মূল গল্পের সহিত নিবিড় ঐক্য লাভ করে নাই।" নির্মল ও হৈমবতীর শান্ত আনন্দময় জীবনযাত্রার কথা জানিয়াই ষোড়শীর মন বেশী করিয়া ভৈরবীজীবনের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। আখ্যানের ইহাই সার্থকতা, কিন্তু উপন্যাসে এই কাহিনী অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে, তাই মূল গল্পের সঙ্গে তাহা পরিপূর্ণরূপে অঙ্গবদ্ধ হয় নাই। নাটকে এই ত্রুটি একেবারে নাই বলিলেই চলে। আখ্যানের অবান্তর অংশকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহার সম্পর্ক খুব সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। এমন কি কোথায় ষোড়শী হৈমর জীবনযাত্রার কথা শুনিয়া নিজ জীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করিল তাহাও নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সুনির্দিষ্ট সঙ্কেতে আতিশয্য আছে, কিন্তু মূল গল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বা আখ্যানের সংযোগ কোথায় সেই সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

'ষোড়শী' নাটকের উপসংহারে যে নূতনত্ব আছে তাহার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'দেনা পাওনা'য় দেখি ষোড়শী আসিয়া জীবানন্দকে হাত ধরিয়া লইয়া গেল তাহার কুষ্ঠাশ্রমের কাযে। নাটকের শেষ হইয়াছে জীবানন্দের মৃত্যুতে। যে কর্মক্ষেত্র জীবানন্দ নিজের জন্য বাছিয়া লইয়াছিল সেইখান হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইল, ইহাই গল্পের পরিণতি। ষোড়শী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গেলে এই বিদায় সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উপন্যাসের এই উপসংহারে নাটকোচিত চমৎকারিত্ব নাই, গল্পের অন্যান্য অংশের তুলনায় ইহা অপেক্ষাকৃত নীরস। তাই নাটকে জীবানন্দের মৃত্যু বর্ণনা করিয়া কাহিনীর শেষের অংশকে গাম্ভীর্য দান করা হইয়াছে। জীবানন্দের মৃত্যু আসিয়াছে আকস্মিক দুর্ঘটনার মারফতে, কিন্তু এই মৃত্যু আকস্মিক হইলেও অস্বাভাবিক নহে। জীবানন্দ তাহার বহুদিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং পরের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ডাক্তাররা পর্যন্ত ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং তাহার মৃত্যু একেবারে অপ্রত্যাশিত নহে, এবং ইহার বর্ণনায় কোথাও বাহুল্য নাই, অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নাই। যাহা অকস্মাৎ আসিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া নায়কনায়িকার চরিত্র সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। যে কথা ষোড়শীর মনে বহুদিন যাবৎ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা অনিবার্য বেগে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। জীবানন্দ বলিয়াছিল যে মরণকে যেদিন আট্‌কাইতে পারিবে না, সেই দিন সকলের চোখের উপর দিয়াই সে চলিয়া

যাইতে চায়। যে মরণ সহসা আসিল তাহাকে সে সাহসের সহিত বরণ করিল, তাহার আবদ্ধ কাজের অপূর্তির জন্য ক্ষোভ করিল না, ষোড়শীর সঙ্গে মিলনের জন্য লোভ করিল না, বরং সূর্যের শেষ রশ্মির মধ্যে নিজের অস্তায়মান জীবনের চরম রহস্যের পরিচয় দেখিতে পাইল।

(২)

শরৎচন্দ্রের নাটকগুলির আখ্যানভাগের আলোচনার পর বিচার করিতে হইবে যে, তিনি নাটকের টেক্‌নিক বজায় রাখিতে পারিয়াছেন কিনা। নাটক দৃশ্য কাব্য, সুতরাং তাহার মধ্যে প্রাধান্য থাকে ঘটনার, বর্ণনার নহে। নাটকের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে কার্যের দ্বারা, ইঙ্গিতের সাহায্যে। তাহার মধ্যে বাক্‌বাহুল্য থাকিলে গল্পের গতি প্রতিহত হইয়া যায়। শেক্সপিয়রের নাটকে দীর্ঘ বক্তৃতা আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ হ্যাম্‌লেট্‌, ইয়াগো প্রভৃতির স্বগতোক্তিতে—সুদীর্ঘ বক্তৃতার সঙ্গে বাহিরের কার্যকলাপের খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘ বক্তৃতা শেক্সপিয়রের নাটকের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বাকসংযম সাহিত্যের একটি প্রধান গুণ, নাটকের ইহা অপরিহার্য অঙ্গ। শরৎচন্দ্র নাট্যকার নহেন, তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে উপন্যাসে। যখন তিনি উপন্যাসগুলিকে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা চলিয়া গিয়াছে। তাই তিনি সব রহস্যকেই স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চাহেন। সাহিত্য রহস্যের সৃষ্টি করে, তাহার মূল কোথায় সেই দিকে সঙ্কেত করে। ব্যাখ্যা করা টীকাকারের কর্তব্য।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটক 'ষোড়শী'র কথাই ধরা যাক। ষোড়শী জীবানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার লুপ্ত নারীত্বের প্রথম আস্বাদ পাইল, ইহার পরে ভৈরবীর কাজে আর মন বসিতে চাহিল না। হৈমের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া, তাহার শান্ত অনাবিল জীবনযাত্রা দেখিয়া সে নিজের জীবনের শূন্যতা অনুভব করিল। বহু নরনারী ইতিপূর্বে তাহার কাছে নিজেদের জীবনের সুখদুঃখের কথা বলিয়াছে, কিন্তু ষোড়শীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাহা প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে হৈমর জীবনের যে সামান্য পরিচয় পাইল, তাহাতেই তাহার চিত্ত উদ্বেলিত হইল, তাহার কারণ ইহার পূর্বে জীবানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া সে এক নূতন স্পন্দন অনুভব করিয়াছে। ষোড়শীর জীবনে যে গভীর পরিবর্তন আসিল তাহার মূলে ছিল দুইটি নূতন সংস্পর্শের সম্মিলন। ষোড়শীর নিভৃত চিন্তা, সাগরের সঙ্গে তাহার কথোপকথন, ফকির সাহেবের ব্যগ্র প্রশ্ন ও

ষোড়শীর সসঙ্কোচ উত্তর—নানা উপায়ে উপন্যাসের মধ্যে এই অভিনব সংস্পর্শের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার চিত্র আঁকা হইয়াছে। ষোড়শীর জীবনের যে রহস্য সে নিজেই ভাল করিয়া জানিত না, তাহার প্রতি ঔপন্যাসিক অতি প্রখর আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। নাটকে দুইটি প্রভাবের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার চিত্র নাই।* হৈমর প্রভাবে ষোড়শীর জীবন কিরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার স্পষ্ট ও নিখুঁত বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি প্রভাবকে অতিশয় স্পষ্ট করিতে যাইয়া আর একটিকে প্রায় বাদ দেওয়া হইয়াছে। জীবানন্দের সংস্পর্শে আসায় ষোড়শীর মনে যে কি প্রলয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শুধু নাটক পড়িয়া বা দেখিয়া অনুমান করিতে পারি না। হৈম-ষোড়শীর সংবাদকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দুই একটি কথা অতিশয় অনুপযোগী বলিয়া মনে হয়। হৈম চলিয়া গেলে পর ষোড়শী স্বগতোক্তি করিয়া বলিল, "হৈম তুমি যেন আজ আমার কত যুগের চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে গেলে বোন্।" এই প্রকারের ব্যাখ্যা নাটকে অতিশয় অশোভন। হৈম যে ষোড়শীর অন্ধতা দূর করিয়া দিয়া গেল, তাহা তাহার পরবর্তী জীবনের কার্যে প্রকাশ পাইবে; তাহার জন্য কোন টীকার প্রয়োজন নাই।

এইরূপ লঘু উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বগতোক্তি অনাটকোচিত ব্যাখ্যার দ্বারা 'বিজয়া' ও 'রমা' নাটক সর্বাপেক্ষা বেশী ভারাক্রান্ত হইয়াছে। বিজয়া পিতার হাতের লেখা চিঠি দেখিয়া "বাবা! বাবা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। মৃত পিতার চিঠি দেখিয়া অভিভূত হওয়া বিজয়ার পক্ষে স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সেই চিঠি তাহার সঙ্কটের সুখময় সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে। কিন্তু সে এই চিঠি দেখিয়া অপর ব্যক্তির কাছে চীৎকার করিয়া উঠিবে, ইহা অনেকটা অস্বাভাবিক এবং অতিশয় অশোভন। এই কারণেই অভিনয়ে এই চীৎকারটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। রমেশও গোপাল সরকারের কাছে তাহার মৃত পিতার মহত্ত্বের কথা শুনিয়া "বাবা! বাবা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। ইহাও অপরিণত নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দেয়। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমা ও রমেশের প্রণয় নানা বিরুদ্ধ শক্তির প্রেরণায় ব্যাহত কিন্তু পরিপুষ্ট হইয়াছে। নাটকে এই কাহিনীর জটিলতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নাই, তাহার পরিবর্তে আসিয়াছে

* উদাহরণ স্বরূপ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্যের সহিত উপন্যাসের ১৯ সংখ্যক অধ্যায়ের তুলনা করা যাইতে পারে।

আবেগময় উচ্ছ্বাস। একটি উদাহরণ দিলেই এই পার্থক্য (এবং নাটকের এই দুর্বলতা) স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। রাধাপুরের ডাকাতির পর পুলিশ খানাতল্লাসী করিতে যেদিন রমেশের বাড়ীতে আসে সেই দিন রমা সেইখানে ছিল এবং পুলিশের কাছে রমেশকে ফেলিয়া যাইতে আপত্তি করিয়াছিল। উপন্যাসে এই ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এই ভাবে :

'রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল—"আর এক মুহূর্ত থেকো না রমা, খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে যাও। পুলিশ খানাতল্লাসী করতে ছাড়বে না।" রমা নীলবর্ণ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমার কোন ভয় নেই তো?" রমেশ কহিল—"বল্‌তে পারিনে। কতদূর কি দাঁড়িয়েছে সে ত এখনও জানিনে।" একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সেদিন তাহার নিজের অভিযোগ করা, তাহার পরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "আমি যাব না।" রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্তকাল অবাক্ থাকিয়া বলিল—"ছি—এখানে থাকতেই নেই রমা! শীগগির বেরিয়ে যাও।"'

এই বর্ণনায় আবেগ আছে, উচ্ছ্বাস নাই। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে হইবে। রমার ত্রাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে তাহার অনুশোচনা ও আশঙ্কা। হয়ত রমেশের এই বিপদের জন্য সে নিজেই দায়ী। এই সংযত অথচ আবেগময় বর্ণনা নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছে এই ভাবে :

"রমেশ—যতীন ঘুমিয়ে পড়েছে সে থাক্। কিন্তু তুমি আর এক মুহূর্ত থেকোনা রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও। পুলিশ খানাতল্লাসী করতে ছাড়বে না।

রমা (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতকণ্ঠে)—তোমার নিজের তো কোন ভয় নেই?

রমেশ—বলতে পারিনে রমা, কতদূর কি দাঁড়িয়েছে সে ত এখনো জানিনে।

রমা—তোমাকেও ত গ্রেপ্তার করতে পারে?

রমেশ—তা' পারে।

রমা—পীড়ন কর্‌তেও ত পারে?

রমেশ—অসম্ভব নয়।—

রমা—(সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি যাবোনা রমেশদা।

রমেশ—(সভয়ে) যাবে না কি রকম?

রমা—তোমাকে অপমান করবে, তোমাকে পীড়ন করবে, আমি কিছুতেই যাবো না রমেশদা।

রমেশ—ছি ছি, এখানে থাকতে নেই। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে রাণী।"

নাটকে রমা রাণী হইয়াছে—তাহার ভয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, অথচ এই আশঙ্কার সঙ্গে অনুশোচনা কেমন করিয়া জড়াইয়া ছিল তাহা প্রকাশ পায় নাই। রমার প্রণয়ের বৈশিষ্ট্য এম্‌নি করিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'বিজয়া' নাটকেও এই অনাবশ্যক ব্যাখ্যাপ্রবণতা গল্পের সহজ গতিকে রুদ্ধ করিয়াছে। রাসবিহারী-বিলাসবিহারীর সঙ্গে বিজয়ার প্রথমতঃ কোন বিরুদ্ধতা ছিল না, এবং কোন প্রকারে বিবাহটা সারিয়া ফেলিলেই যে শেষে কোন গোল থাকিবে না, রাসবিহারীর এইরূপ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজয়ার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার পর—এবং ইহাই স্বাভাবিক। নাটকে দেখি রাসবিহারী প্রথম দৃশ্যেই তাহার প্ল্যান খুলিয়া বলিতেছেন—ইহা সুসঙ্গত নহে। তাঁহার মনোভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইলেই দর্শকের কৌতূহল সজীব থাকিত। প্রথম দৃশ্যে রাসবিহারীকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। নলিনী ও নরেন্দ্রের মধ্যে প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছে, এই সন্দেহে বিজয়ার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছিল এবং ইহার নিরসনের পরেই সে নরেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিল। সন্দেহ ও বিতৃষ্ণার তীব্রতাই তাহার লুক্কায়িত প্রণয়কে বাহিরে প্রকাশ করিতে সাহায্য করিল। নাটকে নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপে (তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) বিজয়ার আশঙ্কা অলক্ষিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এই দৃশ্যটি নাটকের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু নাট্যকার এইখানেই থামেন নাই। উপন্যাসে (২৫) নরেন্দ্র বিজয়াকে বলিয়াছে, "নলিনীর কথা নিয়ে আপনি মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্ছেন? আমি জানি তাঁর মন কোথায় বাঁধা আছে, এবং আমিও যে কেন পৃথিবীর আর এক প্রান্তে পালাচ্ছি, সে তিনিও ঠিক বুঝ্‌বেন।" উপন্যাসে যাহা আভাসে ব্যক্ত হইয়াছে নাটকে তাহাকে বিনাইয়া বিনাইয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার জন্য অনুপস্থিত জ্যোতিষকে আমদানী করা হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে। নলিনী নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছে যে তাহার বিজয়াকে দেখিতে ইচ্ছা করে কিনা, এবং নরেন্দ্র বলিয়াছে, "করে, দিবারাত্র করে।" এই অসঙ্কোচ স্বীকৃতি অনাবশ্যক, অশোভন, হাস্যকর।

উপন্যাসের শেষের পরিচ্ছেদে যে পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা আসিয়াছে অতর্কিতে, যে পরিণতি পাঠক আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে কিন্তু প্রত্যাশা করিতে পারে নাই তাহার এই অলক্ষিত অভ্যাগমে পাঠকের মন নানা অনুভূতিতে ভরিয়া উঠে। নাটকে এই রস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দয়ালের

বাড়ীতে দয়াল, তাহার স্ত্রী ও নলিনীর কথাবার্তা* হইতে বুঝা যায় যে দয়াল পূর্বাহ্নে সচকিত হইয়া কিছু একটা করিতেছে, সুতরাং বিজয়া ও নরেন্দ্রের মিলন অবশ্যম্ভাবী। এমনি করিয়া আখ্যায়িকার অতর্কিত পরিণতির মাধুর্যকে নষ্ট করা হইয়াছে। তারপর, কোন বিষয়ের একবার বর্ণনা করিয়াই নাট্যকার থামেন নাই, যখনই তাহার পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই পুনরুক্তিদোষে 'বিজয়া' ও 'রমা'র আর্ট অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে।

পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে শরৎচন্দ্রের রচনার একটি লক্ষণ ভাবপ্রবণতা। তিনি বাস্তবপন্থী, অথচ তিনি ভাবপ্রবণ। তাহার শ্রেষ্ঠ রচনায় ভাবপ্রবণতা ও বাস্তবপ্রিয়তার সমন্বয় হইয়াছে, তথায় তিনি মানবমনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন উপন্যাসে ভাবপ্রবণতায় বাস্তবতাবোধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সেই সব উপন্যাস অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। নাটকে ভাবপ্রবণতার এই আতিশয্য লুপ্ত হয় নাই, বরঞ্চ স্থানে স্থানে বাড়িয়াই গিয়াছে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে বিশ্বেশ্বরী বাস্তব চিত্র নহেন, নাটকে এই অবাস্তবতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি কেবল ভাবাতিশয্যপূর্ণ কথার সৃষ্টি, ধরণীর ধূলির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই। শুধু একটি বিষয় লক্ষ্য করিলেই নাটকের নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হইবে। উপন্যাসে দেখি রমেশের প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকিলেও তিনি ক্রোধ ও বিরক্তির অতীত নহেন এবং রমেশের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধে কখনও কখনও তিক্ততা আসিয়া পড়িয়াছে, এমন কি একবার রূঢ়ভাবেই রমেশকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে তিনি বেণীর বিরুদ্ধে রমেশের পক্ষাবলম্বন করিবেন, রমেশের এইরূপ প্রত্যাশা করা অতিশয় অসঙ্গত হইবে। কিন্তু নাটকে তাহার এই দিকটা মুছিয়া গিয়াছে, তিনি ভাববিলাসে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। যখন সনাতন বেণীকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল, তখন একমাত্র পুত্রের বিপদাশঙ্কায়ও তিনি বিচলিত হইলেন না, বরং ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে তিনি গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাঙ্গুলি-ঠাকুরপো, ছোটলোকের মুখে এমন আস্পর্ধার কথা শুনেও যে বড় চুপ করে আছ?" পুত্রের বিপদের সম্ভাবনায় মায়ের এই ব্যঙ্গোক্তি শুধু কঠোর নয়, অস্বাভাবিক।

উপন্যাসে দয়াল বিজয়াকে বলিয়াছেন, নলিনীর সঙ্গে এতক্ষণ আমার এই কথাই হচ্ছিল—সে সমস্তই জানতো। উপরি উল্লিখিত কথোপকথন এই অতি সংযত ইঙ্গিতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

রমার চরিত্রও নাটকে অপেক্ষাকৃত অবাস্তব হইয়াছে। উপন্যাসে দেখিতে পাই, সে যে রমেশের বিরুদ্ধতা করিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে নানা প্রবৃত্তির সমাবেশ। বেণী যে তাহাকে খোসামোদ করে ইহাতে সে সন্তুষ্ট হয়, বহুদিন যাবৎ বৈষয়িক ব্যাপারে বেণী তাহার পরামর্শদাতা, রমেশের অতিরিক্ত সাহস ও অপরের প্রতি অবহেলায় রমার শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, হিন্দুর আচারের প্রতি রমেশের অবজ্ঞায় স্বধর্মনিষ্ঠ বিধবার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে, রমেশকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আকবর লাঠিয়ালকে সে নিজে বাঁধ পাহারা দিতে পাঠাইয়াছে, সমাজের কলঙ্কের ভয়ে সে ভীত হইয়াছে আবার এই প্রশ্নও মনে জাগিয়াছে যে, যে সমাজের ভয়ে সে একটা গর্হিত কর্ম করিয়া বসিল, সে সমাজ কোথায়?—এইরূপ বিচিত্র ও বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির আনাগোনায় রমার চরিত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে। নাটকে তাহাকে ভাবপ্রবণ রমণী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার চরিত্রের সেই বৈচিত্র্য নাই, তাহার সেই তেজ নাই, সে পুলিসে সংবাদ দেয় নাই, আকবর লাঠিয়ালকে সে প্রস্তুত করে নাই। মনে হয় শুধু কলঙ্কভীতিই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।* তাহার অশ্রুপাত-প্রবণতা ও দুর্বলতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

আরও দুই একটি বিষয়ে শরৎচন্দ্র নাটকের টেক্‌নিক বজায় রাখিতে পারেন নাই। নাটকের গল্পাংশ নাট্যকারের বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও তাহার গতি হইবে সহজ, তাহার প্রবাহ হইবে স্বতঃস্ফূর্ত। নাটকের পাত্রপাত্রীগণ নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের উদ্দেশ্য লইয়া স্বাধীনভাবে যাতায়াত করিবে, দর্শকের কখনও মনে হইবে না যে তাহারা স্রষ্টার একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলে তাহারা জীবন্ত হইবে না, তাহাদিগকে যন্ত্রচালিত কলের পুতুল বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ নাটকের কলকব্জা ঠিক থাকে, ইহাদের গঠনকৌশল নির্দোষ, কিন্তু ইহারা প্রাণহীন। ফরাসী নাট্যকার সার্দু ও ইংরেজ নাট্যকার পিনেরোর অনেক নাটকে এই প্রাণহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের নাটকে একটা সমস্যা থাকে, সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই চরিত্রগুলি সৃষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে সাহায্য করার জন্য নানা প্রকারের কৌশল অবলম্বন করা হয়—দরজা-জানালার সুবিধাজনক সন্নিবেশ, চিঠি, তার ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রের কোন কোন নাটকে এই যান্ত্রিকতা পরিলক্ষিত হয়, যদিও সার্দু-পিনেরো বর্ণিত কলকব্জা তাহাদের

* এই কারণেই তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মীকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মীর মাযের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। (পল্লীসমাজ—১৫ দ্রষ্টব্য)

মধ্যে নাই। 'বিজয়া' নাটকে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখিতে পাই নদীর ধারে বিজয়া ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল এবং নরেন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের পর রাসবিহারী সেইখানেই উপস্থিত হইল এবং তাহারই একটু পরে বিলাসবিহারীও সেইখানে হাজির হইল। এম্নি করিয়া নদীর ধারে এক সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইল। নরেন্দ্রনাথ ও বিজয়ার সাক্ষাতে যে আকস্মিকতা ছিল, তাহা চলিয়া গেল। মনে হয়, ইহারা সব শতরঞ্চ খেলার গুটি, খেলোয়াড়ের প্রয়োজনানুসারে নির্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছে। এই দৃশ্যের শেষের দিকে বিজয়া খুব রাগ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ইহা যেমন অতিনাটকীয় তেমন অশোভন। রাত্রিতে বিজয়া প্রকাশ্য পথ হইতে রাগ করিয়া সবেগে ধাবিত হইবে—ইহা একেবারে অস্বাভাবিক, বিশেষতঃ এক রোগের বিকারগ্রস্ত অবস্থা ছাড়া সে আর কোথাও সংযমের বাঁধ অতিক্রম করে নাই।

এই নাটকে আরও দুই একটি দৃশ্য আছে যেখানে পাত্রপাত্রীগণের আসা যাওয়ায় এই যান্ত্রিকতা অনুভব করা যায়। যে দৃশ্যে মাইক্রস্কোপ দেখান হয়, তথায় নরেন্দ্রের চলিয়া যাওয়া ও পুনঃপ্রবেশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নহে। অন্যত্র দেখি বিলাসবিহারী দয়ালকে গালাগালি দিল ও দয়াল বাহির হইয়া গেলেন, একটু পরেই নরেন্দ্র আসিয়া বিজয়াকে বলিল যে সে দয়ালের নিকট সমস্তই শুনিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে নরেন্দ্রনাথের এই সময়ে আগমন যেন পূর্ব হইতেই স্থির করা ছিল এবং তাহাকে সব কথা বলিবার জন্যই দয়ালবাবু বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। উপন্যাসে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনীকে নাটকে একত্র করিতে যাওয়ায় আখ্যায়িকা স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে মাইক্রস্কোপের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল একদিন এবং তাহার পর অপর এক নির্ধারিত দিনে নরেন্দ্রনাথ বিজয়াকে উহা দেখাইতে আনিয়াছিল। বিজয়ার বাবার চিঠির কথা একদিন হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়াছিল এবং অতঃপর বিজয়া সেই চিঠি আনিয়াছিল। নাটকে বিভিন্ন দিনের কাহিনী একই দৃশ্যে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা হইতে মনে হয় যেন বিজয়াকে দেখাইবার জন্যই নরেন্দ্রনাথ মাইক্রস্কোপ ও চিঠি বহন করিয়া আনিয়াছিল। যে আকস্মিকতা 'দত্তার' প্রধান মাধুর্য তাহা 'বিজয়া' নাটকে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকারের ত্রুটি 'ষোড়শী'তে নাই বলিলেই চলে, কিন্তু 'রমার' কোন কোন দৃশ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া মনে পড়ে দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্যের কথা। এই দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে

২২ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া। প্রথমে রমা ও রমেশ জল বাহির করার আলোচনা আরম্ভ করিল, তারপর বেণী ও গোবিন্দ আসিয়া তাহাদের মত প্রকাশ করিয়া গেল, ইহার পর রমা ও রমেশের মধ্যে অভিমান, অনুনয় ও ভীতিপ্রদর্শনের পালা আরম্ভ হইল, তাহার পর রমেশের দ্রুতপদে প্রস্থান, নেপথ্যে আকবরের সঙ্গে মারামারি এবং আহত আকবরের সমভিব্যাহারে বেণী ও গোবিন্দের প্রবেশ ও রমার সঙ্গে তর্ক ও আলোচনা। রমার সঙ্গে রমেশের কথোপকথন হইতে আরম্ভ করিয়া আকবর লাঠিয়ালের প্রস্থান পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারগুলি ঘটিতে অনেক সময় লাগিয়া থাকিবে; এই বাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে রমা প্রায় সমস্তক্ষণই তাহার বহির্বাটীতে দাঁড়াইয়া আছে। ইহা যেমন অসম্ভব তেমনি অনাটকোচিত।

(৩)

পূর্ববর্তী অংশে শরৎচন্দ্রের নাটকের ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করা হইয়াছে। শরৎপ্রতিভার বিকাশ হইয়াছে উপন্যাসে, সুতরাং তাঁহার নাটক রচনা নির্দোষ হয় নাই, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু কোথাও কোথাও নাটকেও তাঁহার প্রতিভার স্ফূর্তি হইয়াছে। তাঁহার নাটকের মধ্যে 'ষোড়শী' সর্বশ্রেষ্ঠ। এই নাটকের শেষ দৃশ্যের মাধুর্য পূর্বেই উল্লিখিত হইযাছে। ইহা ছাড়াও এই নাটকে অনেক উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। প্রথমতঃ ইহার গঠনকৌশল অনবদ্য। উপন্যাসে যে সমস্ত অবান্তর আখ্যান ছিল, যে সমস্ত কাহিনীর সঙ্গে মূল গল্পের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নহে, তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে অথবা তাহাদিগকে ছোট করিয়া মূল গল্পের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। বিপিন মাইতিকে নাটকে দেখিতে পাই না, সাগর সর্দার ও ফকির সাহেব পূর্বাপেক্ষা অল্প জায়গা জুড়িয়াছে। নির্মল ও হৈমবতীর কাহিনীর অবান্তর অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং নাটকে তাহার যাথার্থ্য সমধিক স্পষ্ট হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে যে কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে তাহা অপ্রতিহতবেগে আপন পরিসমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

পরিবর্জন ও পরিবর্তনের পর গল্পটি নাটকে যে-রূপ পাইয়াছে তাহা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। দুই একটি উদাহরণ দিলেই নাটকের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হইবে। ষোড়শীর সঙ্গে বীজগাঁয়ের লোকের যে সংঘর্ষ তাহার আরম্ভ হইয়াছে হৈম'র পূজার মধ্যে এবং তাহা চরমে পঁহুছিয়াছে সভামণ্ডপের সেই দৃশ্যে যেখানে ষোড়শী জমিদারকে ভয় দেখাইয়াছে। উপন্যাসে এই সংঘর্ষ নানা বিচ্ছিন্ন

ব্যাপারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততা নাটকোচিত নহে। নাটকে সমস্ত ব্যাপারটি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে একটি দৃশ্যে (প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য), এবং সেইখানেও ঘটনার বা লোকের কোন অনাবশ্যক ভীড় নাই; স্তরে স্তরে সংঘর্ষ চরমে উঠিয়াছে এবং ইহার মধ্য দিয়া পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেও এইরূপ নাটকোচিত পরিবর্তন ও কেন্দ্রীকরণ আছে। প্রফুল্ল ও জীবানন্দের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে উভয়ের চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়, এবং তাহার পর এককড়ি ও জীবানন্দের মধ্যে ষোড়শীর সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই ষোড়শীর আবির্ভাব হইল। ষোড়শীকে কেমন করিয়া আনা হইল তাহা উপন্যাসে অপ্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু নাটকে তাহার বর্ণনা দিতে গেলে মূল গল্পের গতি রুদ্ধ হইত। এই প্রকারের যে যে পরিবর্তন নাটকে করা হইয়াছে, তাহাতে কাহিনী অপেক্ষাকৃত বেগবান্ ও নাটকোচিত হইয়াছে এবং জীবানন্দের চরিত্র সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ষোড়শীর চরিত্র অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট হইয়াছে এবং ইহাই নাটকের মৌলিক ত্রুটি।

'বিজয়া' নাটকের নিজস্ব মাধুর্য প্রায় কিছুই নাই। শুধু উপন্যাসে নলিনী সম্পর্কে ঈর্ষার যে ইঙ্গিত আছে, তাহা নাটকে স্পষ্টতর হইয়াছে। 'রমা' নাট্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বেণীকে প্রহারের দৃশ্য; তাহার মধ্যে গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও দরওয়ানের চরিত্রের একটি দিক অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

শরৎ-সাহিত্যে নীতি

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস যখন প্রথম বাহির হইতে লাগিল তখন তাহার দুর্নীতিতে ভদ্র-সমাজ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। অনেকে তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদের এই বই পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন, বঙ্গসাহিত্যের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য কত লোক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রের রচনার অশ্লীলতার প্রতি এই বিতৃষ্ণা এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র একজন সম্ভোগবিরোধী নীতিবিদ্, ইংরেজিতে যাহাকে বলে Puritan। তাঁহার

অধিকাংশ নায়কনায়িকারা সব সময়েই যৌন মিলন হইতে নিজেদের দূরে রাখিযাছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আমাদের সমাজে এ-বস্তুটিকে লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধ হয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য demonstration-এ লজ্জা করে।" কথাটা অনেকাংশে সত্য। আমাদের সংস্কারের গভীরতা, তাহার দুশ্ছেদ্য বন্ধনের নিবিড়তাকে তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। রাখাল পণ্ডিত ও শিবু পণ্ডিত যে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা বেদে'র মন্ত্রের মতই অর্থহীন। "কিন্তু তবু ত এদের কোন মন্ত্রই বিফল হয়নি। এদের দেওয়া বিবাহবন্ধন আজও তেমনি দৃঢ়, তেমনি অটুট আছে।" হিন্দুরমণীর স্বামি-প্রীতি যে কত নিবিড়, কত গভীর তাহা সৌদামিনী টের পাইল স্বামীকে ত্যাগ করিয়া। প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মীর মনে যে দুই শক্তির নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইতেছে হিন্দুরমণীর আজন্মার্জিত সংস্কার। তাই তাহারা মন প্রাণ দিয়া তাহাদের প্রেমাস্পদকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে শ্রীকান্ত নিজেই বলিয়াছে, "তাহার দুর্বশ হৃদয় ও প্রবুদ্ধ ধর্মবৃত্তি এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন্ সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়া তাহার এই দুঃখের জীবনে তীর্থের মত সুপবিত্র হইয়া উঠিবে সে তাহার কোন কিনারাই দেখিতে পায় নাই।" শ্রীকান্তের পক্ষেও তাই। সে রাজলক্ষ্মীব জন্য সব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সম্ভ্রম ছাড়িতে পারে না। শুধু তাই নয়। শ্রীকান্ত সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা ও আবেগ দিয়া লিখিয়াছে তাহার অন্নদাদিদির সম্বন্ধে। অথচ অন্নদাদিদি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ত করেনই নাই, বরঞ্চ সমাজ তাহাকে যে স্বামী দিয়াছিল সেই বর্বর পশুকে অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া আজন্ম সতীধর্ম রক্ষা করিযা গিয়াছেন। তিনি সমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছেন, সমাজেব আদর্শকে অটুট রাখিবার জন্য। তাঁহার অখ্যাতি ছিল কলঙ্কিনীর—প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন হিন্দুরমণীর শিরোমণি। কমল এই গল্প শুনিলে প্রশ্ন করিত, শাহ্‌জীর মত বর্বরকে বরণ করায় সত্যিকার মহত্ত্ব কি আছে? ত্যাগই তো একমাত্র গৌরবের সামগ্রী নহে। অন্নদাদিদি যে সমাজ ত্যাগ করিলেন, সুখ ত্যাগ করিলেন, সুনাম পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন, তাহার পরিবর্তে তিনি পাইলেন কি? তাঁহার এই ত্যাগে তাঁহার জীবনে কতটুকু সুখ আহৃত হইয়াছিল? শাহ্‌জীকে তিনি মন্ত্র পড়িয়া পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কি তাহার ঘৃণিত চরিত্রের জন্য নিজেকে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলে নাই? একটা মন্ত্রপড়া সংস্কার কি সত্যকেও ছাপাইয়া

যাইবে? শাহজীর সঙ্গ, সংস্পর্শ—ইহাতে আকাঙ্ক্ষার, উপভোগের, গৌরবের কি আছে? এ-ত্যাগের মাহাত্ম্য কোথায়? শরৎচন্দ্র কিন্তু এইরকম একটি প্রশ্নও তোলেন নাই। অন্নদাদিদির জীবনে সেবার মহত্ত্বই তিনি দেখিয়াছেন —সেই সেবার মধ্যে যে কতবড় বিড়ম্বনা ছিল, সেই দিকে তিনি লক্ষ্যমাত্র করেন নাই। তাহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, শরৎচন্দ্র মূলতঃ সম্ভোগ-বিরোধী, তাঁহার কাছে ভোগের ও ঐশ্বর্যের অপেক্ষা ত্যাগের মূল্য বেশী।

শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্রের মধ্যে মাত্র দুইজন লোক ভোগকে বরণ করিয়াছিল এবং তাহাদের জীবন হইয়াছে সর্বাপেক্ষা ঊষর। কিরণময়ী ধর্ম মানিত না, শাস্ত্র মানিত না, স্বয়ং ভগবান্‌কে মানিত না। তাহার কাছে কোন আচার, কোন সংস্কারের মূল্য ছিল না। তাহার কাছে পরলোকেরও কোন মূল্য নাই, তাই সে বুঝিত শুধু ইহকালের সুখ, শুধু দেহের আনন্দ। তাহার ভালবাসার মধ্যেও ইহার ছাপ আছে। রাজলক্ষ্মী যদি শ্রীকান্তকে না পাইত, তাহার ভালবাসা তেমনি তীব্র থাকিত, তাহার মন রহিত তেমনি অকলঙ্ক শুভ্র। সরোজিনীর প্রতি যে সাবিত্রীর মনে একটুও ঈর্ষা ছিল না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্বেষের কণা মাত্র নাই। কিন্তু যেই উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিল, অমনি তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, আর সে যে উপায়ে প্রতিহিংসা লইল তাহা যেমনি নীচ তেমনি বীভৎস। তাহার জিঘাংসার মূলে রহিয়াছে নীতি ও ধর্মের প্রতি একান্ত বিদ্বেষ। সে ভালবাসা বলিতে যৌনমিলনই বুঝিত, তাই সে প্রতিহিংসা লইল পুত্রস্থানীয় বালকের মনে রিরংসাবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া। কিন্তু এই প্রেমলিপ্সা ও প্রতিহিংসার মধ্যে কল্যাণকর কিছুই নাই। এ-আগুনে দিবাকর ভস্মীভূত হইতে পারে, কিন্তু কিরণময়ীর সুখ হয় নাই। তাহাদের আরাকান প্রবাসের শেষ দিক্ দিয়া দেখিতে পাই যে, দিবাকরের মনে কিরণময়ী যে সম্ভোগলিপ্সা জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাই হইয়াছে তাহার সবচেয়ে বড় বোঝা।

মেয়েদের মধ্যে যেমন কিরণময়ী চাহিয়াছিল শুধু দেহের মিলন, তেমনি পুরুষদের মধ্যে এ জিনিষটি চাহিয়াছিল সুরেশ। কিরণময়ীর পাণ্ডিত্য অসাধারণ, সে যুক্তিতর্ক দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করিত। সুরেশের তাহার মত দার্শনিক বিদ্যা ছিল না—সে তাহার সহজাত সংস্কারবলেই পাপপুণ্য, আত্মা প্রভৃতি মানিত না। সে নিজেই বারংবার বলিয়াছে যে সে নাস্তিক, ধর্মহীন, পাপপুণ্যের ফাঁকা আওয়াজের ধার ধারে না। তাহার প্রবৃত্তি উদ্দাম এবং সেই

প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় সে একই সময়ে সর্বাপেক্ষা মহৎ ও নীচ কাজ করিয়াছে। নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া মহিমের জীবন রক্ষা করিয়াছে আবার মহিমের অসাক্ষাতে তাহার ভাবী স্ত্রী ও শ্বশুরকে তাহারই প্রতি বিরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; অবশেষে রুগ্ণ বন্ধুর পরিণীতা স্ত্রীকে চুরি করিয়া লইয়া সে চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছে। ঐ তরুণী রমণীর দেহটাই ছিল তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু; সেই দেহটাকে পাইলেই তাহার জীবন চরিতার্থ হইবে এই ছিল তাহার ধারণা। কিন্তু শেষে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে শুধু দেহটাকে পাইয়া কোন লাভ নাই—যে অচলাকে পাইবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল, সেই অচলাই শেষে তাহার কাছে দুর্বহ হইয়া দাঁড়াইল। আগে সে তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল, এখন ব্যস্ত হইল কি করিয়া তাহাকে মুক্তি দিবে, তাহার ভার সে যেন আর বহিতে পারে না। শরৎচন্দ্র সুরেশের ভুলের কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "কিছুদিন হইতেই নিজের ভুল তাহার কাছে ধরা পড়িতেছিল, কিন্তু ওই লুণ্ঠিত দেহলতা, ওই বেদনা —ইহার সম্মিলিত মাধুর্য তাহার চোখের ঠুলিটাকে যেন এক নিমেষে ঘুচাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, প্রভাতরবিকরে পল্লবপ্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, সেই অপরূপ সৌন্দর্যকে যে লোভী হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেমনি করিয়াছে। সে নাস্তিক, সে আত্মা মানে না; যে প্রস্রবণ বহিয়া অনন্ত সৌন্দর্য নিরন্তর ঝরিতেছে, সেই অসীম তাহার কাছে মিথ্যা; তাই স্থূলটার প্রতিই সমস্ত দৃষ্টি একাগ্র করিয়া সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, ওই সুন্দর দেহটাকে দখল করার মধ্যেই তাহার পাওয়াটা আপনা আপনিই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে; কিন্তু আজ তাহার আকাশস্পর্শী ভুলের প্রাসাদ এক মুহূর্তে চূর্ণ হইয়া গেল। প্রাপ্তির সেই অদৃশ্য ধরা হইতে বিচ্যুত করিয়া পাওয়াটা যে কত বোঝা, কত বড় ভ্রান্তি, এ-তথ্য আজ তাহার মর্মস্থলে গিয়া বিঁধিল। শিশিরবিন্দু মুঠার মধ্যে যে কি করিয়া এক ফোঁটা জলের মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠে অচলার পানে চাহিয়া সে কেবল এই সত্যটাই দেখিতে লাগিল। হায়রে! পল্লবপ্রান্তটুকু যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্যের মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া?"

শরৎচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে কোন প্রকার শারীরিক মিলনের কথা তিনি লিখেন নাই। 'বঙ্গবাণী'তে তিনি একবার লিখিয়াছিলেন, "আলিঙ্গন ত দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের কোথাও দিতে পারিলাম না।"

কথাটা খুব সত্যি, আবার ইহার মধ্যে ভুলও আছে। আরাকান যাত্রার সময় জাহাজে কিরণময়ী দিবাকরের ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। সুরেশ অচলাকে শুধু চুম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এক দুর্যোগের রাত্রির দুরতিক্রম্য অভিশাপে তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে শুধু দৈহিক মিলন কত পীড়াদায়ক, কত বীভৎস। দিবাকর কিরণময়ীর চুম্বনে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, সুরেশ চুম্বন করিলে অচলার ঠোট দুটি বিছার কামড়ের মত জ্বলিয়া উঠিত। যে অন্ধকার রজনীতে রামবাবুর সুরমা লজ্জার গভীরতম পঙ্কে নিমগ্ন হইল, তাহার পরদিন প্রত্যূষে বৃদ্ধ দেখিলেন যে, সুরমার মুখ মড়ার মত সাদা, দুই চোখের কোণে গাঢ় কালিমা, এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। অপর পক্ষের সহৃদয় সম্মতি না থাকিলে যৌনমিলনের আকর্ষণ যে কত জঘন্য হইতে পারে, তাহাই এখানে প্রমাণিত হইয়াছে।

কমলকে বাদ দিলে শরৎসাহিত্যে মাত্র একটি রমণী অম্লানবদনে হিন্দুনারীর সতীত্বধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজের বিদ্রোহী হইয়াছে। সে অভয়া। শ্রীকান্তকে সে বলিয়াছিল, 'আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তার কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না আর এসেও উপায় হ'লো না। এখন তার স্ত্রী, তার ছেলেপুলে, তার ভালবাসা কিছুই আর আমার নিজের নয়। তবুও তারই কাছে তাঁরই একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফলফুলে ফুটে উঠে সার্থক হতো, শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারাজীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারী জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকেও আপনি দেখে গেছেন, তার ভালবাসা তো আপনার অগোচর নেই? এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে, শ্রীকান্তবাবু।" কিন্তু অভয়ার চরিত্রেও সুদীর্ঘদিনের সংস্কারসঞ্জাত সঙ্কোচ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অভয়া সর্বান্তঃকরণে রোহিণীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল স্বামীর সংসার করিবার জন্য এবং সেই স্বামী যদি তাহাকে অণুমাত্র দয়া বা প্রীতি দেখাইত তাহা হইলে রোহিণীবাবুর প্রেমের মর্যাদা থাকিত কোথায়? কাজেই রোহিণীবাবুর সঙ্গে তাহার যে মিলন—ইহার মূল রহিয়াছে ব্যর্থতায়। তাহা পরভৃৎ—তাহা আপনার শক্তিতে আপনাকে শক্তিমান্ করিতে পারে নাই।

(২)

শরৎচন্দ্র একটু অদ্ভুত রকমের Puritan। ভোগবিরোধী ধর্মনিষ্ঠ Puritan-রা মানবমনের একটি বৃত্তিকে স্বীকার করেন—সে হইতেছে তাহার বুদ্ধি। যাহা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা শুধু সুন্দর, তাহার প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ বিদ্বেষ। তাই হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রতিও তাঁহাদের বিতৃষ্ণা অনন্ত। সব জিনিষকেই তাঁহারা বুদ্ধি দিয়া বিচার করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি বুদ্ধি দিয়া কাহাকেও বিচার করেন নাই, সহানুভূতি দিয়া সবাইকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মানবজীবনের সমস্ত সুখদুঃখ, আঘাত-সংঘাতের বেদনাকে তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ সহানুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই যদিও তিনি সম্ভোগবিরোধী, যদিও রিরংসাবৃত্তিকে তিনি কোথাও শিরোধার্য করেন নাই, তবু মানবমনের চিরন্তন মিলনাকাঙ্ক্ষা, তাহার আবেগ-অনুভূতির মাধুর্য তিনি আহরণ করিয়াছেন।

এ-বিষয়ে বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। বার্ণার্ড শ'কেও কেহ কেহ Puritan আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার ভোগবিতৃষ্ণা এত বিস্তীর্ণ যে মানবহৃদয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি প্রণয়ের গৌরবকে অস্বীকার করিয়াছেন, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম প্রণয়িনীর জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যায়; তাঁহার নায়ক প্রাণ দিয়াছে সেই রমণীর জন্য যাহাকে সে ভালবাসে না। কিন্তু রিরংসাবিরোধী হইয়াও শরৎচন্দ্র প্রণয়ের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীকান্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে, বিশ্বের লোক তাহার পরাজয়টাই বড় করিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার অম্লানকান্ত বিজয়মাল্য কাহারও চোখে পড়িল না। প্রেমের এই অম্লানদীপ্তিই শরৎসাহিত্যে প্রতিভাত হইয়াছে। সুরেশ ও কিরণময়ীর জীবনে প্রকৃত মাধুর্য ছিল খুব কম। কিন্তু তাহাদের জীবনও শরৎচন্দ্র সমবেদনা দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে তাহাদের অপরাধ শুধু বুঝিবার ভুল—পাপ নহে। তিনি তাহাদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করেন নাই—ভ্রান্ত বলিয়া করুণা করিয়াছেন। মানুষের অন্তরতম অন্তঃস্থলে যে আকাঙ্ক্ষা নীড় বাঁধিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা মূঢ়তা। শরৎচন্দ্রের রচনার অশ্লীলতার মূল হইতেছে এইখানে এবং এইজন্যই কঠোর নীতিপরায়ণ Puritan-গণ তাঁহার রচনায় শিহরিয়া উঠিয়াছেন, যদিও তিনি নিজেই একজন Puritan। মানুষের ভ্রান্তি দুর্বলতার জন্য তাঁহার অফুরন্ত দরদ।

অচলা রামচরণবাবুর ধর্মপরায়ণতা ও স্নেহশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল, আবার সেই ধর্মপরায়ণতা তাঁহাকে কত নির্মম ও কঠোর করিতে পারে তাহার অভিজ্ঞতাও তাহার হইয়াছিল। রামচরণবাবুর ব্যবহারে মহিমও প্রশ্ন করিয়াছে, "যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল, প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে, সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করিতেছে?" আর একটা কথাও আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়। তাহা হইতেছে এই: কে বেশী ভুল করিয়াছিল, সুরেশ না মহিম? কিসে বেশী গোল বাধাইয়াছে?—সুরেশের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি, না মহিমের নিশ্চল নীরবতা? ব্রহ্মচর্যে গৌরব আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা ফাঁকিও আছে। ইহা ষোড়শী বুঝিয়াছিল হৈমর দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য দেখিয়া; যৌবনকে নিপীড়িত করিয়া, প্রবৃত্তিকে উৎসাদিত করিয়া সে যে ধর্ম-চর্চা করিয়াছিল তাহা অন্তঃসারশূন্য। আর এই জন্যই বজ্রানন্দকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাজলক্ষ্মী এত ব্যগ্র, উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, আবার ইহার জন্যই অজিতকে হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য আশ্রম হইতে মুক্ত করিবার জন্য কমল এত ব্যস্ত। বস্তুতঃ হরেন্দ্রের আশ্রমে নিষ্ঠা আছে, দারিদ্র্যচর্চা আছে; তাহাতে পাপের স্পর্শ নাই। কিন্তু তথায় পরিপূর্ণ মানব তৈরী হয় বলিয়াও মনে হয় না। আশ্রমীদের সমস্ত চেষ্টা যেন ব্যর্থতায় ভরা। তাহারা জোর করিয়া কিছু কামনা করে না, সমস্ত শক্তি দিয়া আকাঙ্ক্ষার নিরোধ করে মাত্র। ঐ আশ্রমের সংস্রবে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে রাজেন প্রকৃত মহামানব। কিন্তু বিপ্লবী কর্মীর সঙ্গে আশ্রমের কোন নিবিড় টান নাই। সে ইহার আদর্শে বিশ্বাস করে না; আর তাহার উদ্যোক্তারা সামান্য কারণেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ব্রহ্মচর্যের এই শূন্যতা দেখিয়াই কমল বলিয়াছিল, "এই সব শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই নিষ্ফল দারিদ্র্যচর্চায় লাভ কি হরেন বাবু? এই বুঝি সব আপনার ব্রহ্মচারী? হরেন বাবু, আপনার হৃদয় আছে, এদের মানুষ করতে চান ত সাধারণ সহজ পথ দিয়ে করুন। মিথ্যে কুসংস্কার দিয়ে দুঃখের জেলখানা তৈরী করবেন না। অসংযমে সত্য নেই বলে অতিসংযমকেও সত্য বলে ভুল করবেন না। সেও এত বড়ই মিথ্যে!" সন্ন্যাসী বজ্রানন্দও ইহা অনুভব করিত। সে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে, সংসারকে ঘৃণা করিয়া নয়, তাহাকে বেশী আপনার করিয়া পাইবার জন্য। তাই বাংলাদেশের সহস্র মা বোন্‌দের জন্য তাহার অনন্ত

বেদনা, অফুরন্ত স্নেহ। সংসারের রূপ রস ও গন্ধে তাহার মন ভরপুর। সবাইকে বেশী করিয়া ভালবাসিতে পারিবে বলিয়াই একটা পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মায়া সে ত্যাগ করিয়াছে।

বজ্রানন্দের জীবনে যে দ্বৈধতা দেখিতে পাই তাহা শরৎচন্দ্রের নিজের মধ্যেও রহিয়াছে। তিনি রিরংসাবিরোধী, কিন্তু পরিপূর্ণ সন্ন্যাসেও তাঁহার সহানুভূতি নাই। এই দ্বন্দ্ব তাঁহার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আবার ইহাই তাহার প্রধান দুর্বলতা। রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র যে অন্যায় করিয়াছেন ইহার কথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রশ্ন দিয়াছিলেন, "নারীত্বের দিক দিয়া রোহিণীর জীবন যে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা কি অপরাধে ও কাহার অপরাধে? সাংসারিক দিক দিয়া ভ্রমরের জীবন যে ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহা কি অপরাধে ও কাহার অপরাধে?" কাহার অপরাধে জানি না, কিন্তু শরৎচন্দ্রের নারীদের জীবনও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, নারীত্বের দিক দিয়া ও সাংসারিক দিক দিয়া উভয়তঃ। মৃণালের 'অত্যাজ্য সতীধর্মের' * চিত্র তিনি নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছেন, ব্রাহ্ম কেদার বাবুও তাহার আচরণে মুগ্ধ হইয়াছেন, পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশ পর্যন্ত তাহার কাছে নতশির হইয়াছে। কিন্তু এই 'সতীধর্ম'—ইহা কি শুধু দেহকে আশ্রয় করিয়াই আত্মরক্ষা করে নাই? অচলাকে সতীন বলিয়া সে যে লঘু পরিহাস করিয়াছে, তাহার অন্তরালে রহিয়াছে একটা গভীর ব্যথার করুণ সুর। সামান্য সামাজিক কারণে তাহার প্রেমাস্পদ মহিম তাহাকে বিবাহ করে নাই এবং বৃদ্ধ স্বামী ও ততোধিক বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা করিয়াই তাহার জীবন কাটাইতে হইয়াছে—এই সেবার মধ্যে রহিয়াছে চরম ব্যর্থতা এবং তাহার সমস্ত আচরণ ও কথার মধ্যে এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পার্বতী বড়বাড়ীর গিন্নী হইয়া সবারই মন পাইয়াছিল; কিন্তু তাহার নিজের মন বাঁধা রহিল দেবদাসের কাছে। সে ধর্মকর্ম করিত, সাধু সন্ন্যাসীর

---

* শরৎচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে অচলার পদস্খলনের একটা কারণ এই যে তাহার শিক্ষা, সংস্কার হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার নয়। অচলার চরিত্রের জটিলতা ও দ্বৈধতার কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার সঙ্গে বিশেষ কোন ধর্ম বা সংস্কারের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। উপন্যাসে এই বিষয়ের উল্লেখ না হইলেই শোভন হইত। যে নিষ্ঠুর সমস্যার কোন সমাধানই অচলা করিতে পারে নাই, তাহা যে কোন সমাজের যে কোন নারীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত। নর-নারীর চিত্তের এই যে কঠোর দ্বন্দ্ব ইহাকে কোন একটি বিশেষ ধর্ম অথবা সামাজিক সংস্কারের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলে ইহার প্রতি অবিচার করা হয়।

সেবা করিয়া, অন্ধ খঞ্জের পরিচর্যা করিয়া দিন কাটাইত—কিন্তু ইহার মধ্যে ছিল একটা চরম ফাঁকি। তাহাকে অসতী বলা যায় না, কিন্তু তাহার সতীত্বেরই বা মূল্য কতটুকু? তাহার কাছে চৌধুরী মহাশয় পাইয়াছিলেন কি?

সমাজের তথাকথিত আদর্শের বিরুদ্ধে যাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, যেমন বার্ণার্ড শ', বার্ট্রাণ্ড রাসেল, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিধাহীন নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন দেহের অন্যান্য আনন্দের মত যৌনমিলনেও চিত্তের স্ফূর্তি হয়। ইহাকে ঘৃণা করিয়া লাভ নাই, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মন্ত্র পড়িলেই ইহা পবিত্র হইবে না, মন্ত্র না পড়িলেও ইহা গর্হিত হইবে না। ইহা স্বভাবজাত বৃত্তি, ইহার আবৃত্তিতে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। ইহা পার্থিব জিনিস; ইহাতে স্বর্গের সুষমা নাই, নরকের পূতিগন্ধও নাই। Isadora Duncan ছিলেন বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নর্তকী, আর তাঁহার আত্মজীবন-চরিত এই যুগের একখানা খুব লোকপ্রিয় গ্রন্থ। তিনি বলিয়াছেন, "একথা শুনিয়া অনেকে হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু তাহাদের মনোভাব আমি বুঝিতে পারি না। তুমি যত ধার্মিকই হও না কেন দেহধারণের দরুণই যখন খানিকটা ক্লেশ তোমাকে সহ্য করিতে হয় তখন সুযোগ পাইলে সেই দেহ হইতেই চরম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা তুমি কেন করিবে না? যে লোক সমস্ত দিন মস্তিষ্কের কঠিন পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকে—জটিল প্রশ্ন ও দুশ্চিন্তায় কখনও কখনও যে পীড়িত হয়—সে কেন ঐ (তাহার নিজের) সুকুমার বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আনন্দ পাইবে না, কেন কয়েক ঘণ্টার জন্য বিস্মৃতি ও সৌন্দর্য উপভোগ করিবে না? আমার বিশ্বাস যাহাদিগকে আমি সেই আনন্দ দিয়াছি আমি যেমন করিয়া সেই কথা স্মরণ করিতেছি তাহারাও তেমনিভাবেই তাহার কথা মনে রাখিবে।" ইহাই হইতেছে নীতি-বিদ্রোহীর সহজ সরল নীতি। শরৎচন্দ্র পড়িয়াছেন উভয় স্রোতের মাঝখানে। যাহার বিরুদ্ধে তাঁহার নরনারীরা বিদ্রোহ করিয়াছে, তাহাকেই আবার তাহারা মানিয়া লইয়াছে, যাহা তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহাকেও তাহারা দৈনিকের সম্পত্তি করিয়া লইতে পারে নাই, তাহাদের জীবনে প্রেমের বিজয় গৌরব ঘোষিত হইয়াছে, আবার তাহার ব্যর্থতার সুরও বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভালবাসাকে স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিসমাপ্তিকে গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

কমলকে বাদ দিলে শরৎসাহিত্যে নীতির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কমলের মাতা হিন্দু বিধবা, যাহার রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না; তাহার বাবা

চা-বাগানের বড় সাহেব। তাহার প্রথম বিবাহ হয় এক অসমিয়া ক্রীশ্চানের সঙ্গে, পরে শিবনাথের সঙ্গে বিবাহ হয় শৈবমতে। ইহার পর সে অজিতের সঙ্গে মিলিত হয়, এই মিলনকে কোন অনুষ্ঠান দিয়াই সে ভারাক্রান্ত করিতে প্রস্তুত হয় নাই। কমলের জন্ম, আচরণ, কথাবার্তা—সকলের ভিতর দিয়াই প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্র যিনি শ্রদ্ধার সহিত আঁকিয়াছেন তাঁহার নীতি কি বিদ্রোহের নীতি নহে? তারপর দেখিতে পাই, এই গ্রন্থে একটি চরিত্র বিদ্রূপে জর্জরিত হইয়াছে—সে Puritan অক্ষয়। এই গ্রন্থে যে মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের মতবাদের সম্পর্ক কোথায়? অন্নদাদিদিকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহার কল্পনাই কমলকে মূর্তি দিয়াছে; ইহাদের আদর্শের মধ্যে কি কোন সংযোগের সূত্র নাই? কমল কি জীবন্ত চরিত্র নহে? সে কি শুধু কবি-কল্পনার একটা ক্ষণিক খেয়াল? ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কমলের মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পান নাই। অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসের পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সে সাবিত্রী, অভয়া, রাজলক্ষ্মীর সহোদরা বা স্বজাতীয়া নহে—ইহারা বাঙ্গালী, ইহাদের বিদ্রোহ যাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিতেছে তাহা সমস্ত সমাজ ও যুগযুগান্তরব্যাপী ধর্মবিধির সম্মিলিত শক্তি······ইহার (কমলের) যেন কোথাও কোন নাড়ীর টান বা সম্পর্ক নাই, ছোট বড় কোন টান ইহাকে বেদনায় মথিত করে না······কমল একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের সুস্পষ্ট ও জোরাল অভিব্যক্তি মাত্র,······একটা ইঞ্জিনের বাঁশী, হৃদয়-স্পন্দন নহে।"

কমলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। এইখানে শুধু তাহার মতবাদের বিচার করিতে হইবে। প্রথমেই বলা প্রয়োজন অন্যান্য গ্রন্থে যে বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে কমলের বিদ্রোহের কোন মৌলিক অসঙ্গতি নাই। শরৎচন্দ্র রুচিবাগীশ নহেন, রক্ষণশীলও নহেন। তিনি রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী প্রভৃতির জীবনের ব্যর্থতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, যে আচার, যে ধর্ম ইহাদিগকে জীবনের চরম সার্থকতা হইতে প্রবঞ্চিত করিল সেই ধর্মের মধ্যে কোন সত্য আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। একথাটি শরৎচন্দ্র বহু উপন্যাসে বহু রমণীর জীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। কমল শুধু এই কথাই নিঃসঙ্কোচে কোন সন্দেহ না করিয়া প্রচার করিয়াছে। সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, রমা প্রভৃতির জীবনে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, কমল তাহারই

অকুণ্ঠিত উত্তর দিয়াছে। সে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করে না, তাহার বক্তব্য এই যে, অনুষ্ঠান মানবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, অনুষ্ঠানের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। মানুষের কল্যাণই তাহার আদর্শ, কোন আচার বা নিষ্ঠাকে অবনত শিরে স্বীকার করা নহে। যে অনুষ্ঠান মানুষের জীবনের সার্থকতার পরিপন্থী, তাহাকে শিরোধার্য করিলে মঙ্গল অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে কমলের বিদ্রোহ আকস্মিক নহে। ইহা কোন বিশেষ ঘটনা হইতে সঞ্জাত হয় নাই, কোন বিশেষ বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিঘাত ইহাকে সঞ্জীবিত করে নাই। কিন্তু অন্নদাদিদি হইতে অভয়া পর্যন্ত যত রমণীর চিত্র শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন তাহাদের সকলের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করিলে যে প্রশ্ন, যে বিদ্রোহ অনিবার্য হইয়া পড়িবে, কমল শুধু তাহাকেই প্রকাশ করিয়াছে। কমলের চরিত্র শরৎসাহিত্যকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে।

আর একটা কথাও লক্ষ্য করিতে হইবে। কমল ব্রহ্মচর্যের অতিসংযম ও আত্মনিগ্রহের নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতার জয়গান করে নাই। বরঞ্চ অসংযমে কোন সত্য নাই ইহাকে স্বতঃসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াই তাহার মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছে। তাহার আহার ও সাজসজ্জায় অসংযমের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। অম্লানবদনে সে একটি একটি করিয়া তিনটি পুরুষের সঙ্গ লইয়াছে, কিন্তু কাহাকেও সে প্রতারণা করে নাই; কোথাও অনিয়ন্ত্রিত কামুকতার পরিচয় দেয় নাই। দারিদ্র্যের মধ্যেও সে সংযত, শান্ত। অজিত যখন উন্মত্ত প্রণয়ভিক্ষা জানাইয়াছে তখনও সে অবিচলিত। তাহার কথায় নিঃসঙ্কোচ প্রগল্‌ভতার পরিচয় আছে, কিন্তু তাহার আচরণে সংযম-হীনতার লেশমাত্র নাই। তাহাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি রক্ষণশীল নহেন, রুচিবাগীশ নহেন; কিন্তু তিনি অসংযমের প্রচারকও নহেন। এই উপন্যাসে আর একটি চরিত্রকে কমলের পাশে না রাখিলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করা হইবে। কমল গ্রন্থকারের মতের একটি দিক্‌কে খুব জোরাল অভিব্যক্তি দিয়াছে, কিন্তু আর একটি দিক্ তেমনি সুস্পষ্ট হইয়াছে আশুবাবুতে—তাঁহার কথায়, আচরণে, সর্বোপরি তাঁহার হাসিতে। কমলের সত্যিকার প্রতিপক্ষ অক্ষয় নহে—আশুবাবু। সুতরাং কমলের মতকে আশুবাবুর মতের সঙ্গে মিলাইয়া না লইলে শরৎচন্দ্রের মতবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। আশুবাবু ও কমলের মধ্যে মতের অমিল প্রচুর, কিন্তু মনের অমিল নাই—ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে শ্রদ্ধা, স্নেহ ও আবদারের

সম্পর্ক। গ্রন্থকার বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, সেই মতবাদই আদর্শ-স্থানীয় যাহা এই দুই পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শরৎ-সাহিত্যে হাস্যরস

হাসি আনন্দের প্রস্রবণ। শিশু তাহার মাকে দেখিলে হাসে, বিজয়ী বীর তাহার গৌববানুভূতিতে হাসে। এ হাসি বিধাতার দান—আদিম মানব বিশ্বের রূপ দেখিয়া এই হাসি হাসিয়াছিল। কিন্তু সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর এক প্রকারের হাস্যবসের আবিষ্কার করিয়াছি যাহার মূলে রহিয়াছে এক বিশেষ প্রকাবের আনন্দানুভূতি। তাহার নাম দিয়াছি ব্যঙ্গ-কৌতুক। আমরা ব্যঙ্গ কবি তাহাকে লইয়া যে নীতির দিক্ দিয়া আমাদের অপেক্ষা হীন—আব আমরা কৌতুক কবি তাহাকে লইয়া যে বুদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এসব বিষয়ে মানব-সমাজের একটা বিশেষ মাপকাঠি আছে। যদিও প্রত্যেক মানুষই স্বার্থান্ধ, তবুও সমাজশক্তির মূল হইতেছে স্বার্থত্যাগে। সবাই যদি নিজ নিজ স্বার্থই খুঁজিত তাহা হইলে সমাজ হইত একেবারে অচল। এই জন্যই হিংস্র পশুর কোন সমাজ হয় না। মানবের সামাজিক বুদ্ধি আত্মরক্ষা কবে ইহার প্রতিকূল স্বার্থলিপ্সাকে কশাঘাত করিয়া। তারপর, মানুষ বুদ্ধিজীবী হইলেও তাহার নির্বুদ্ধিতাও অনন্ত। বুদ্ধিমান মানব অপরের নির্বুদ্ধিতা লইয়া কৌতুক করিয়া আনন্দ পায়। তাই হাস্যরস-বহুল সাহিত্যের গোড়ায় আছে এই দুইটি জিনিষ। যাহা স্বার্থদুষ্ট, নীচ, আর যাহা মূঢ় তাহাই চিবকাল এই প্রকারের সাহিত্যের রসদ জোগাইয়াছে। সাহিত্যিকের প্রকৃতি অনুসারে হাস্যরসের রং বদলায়। যাহারা মানবসাধারণকে উপেক্ষা করিয়াছে, ঘৃণা করিয়াছে তাহাদের হাসি বিদ্রূপের হাসি। যাহারা তাহাকে ভালবাসিয়াছে তাহারা দেখিয়াছে যে মানুষ তো ভুল ও অন্যায় করিবেই, কারণ সে রক্তমাংসে গড়া মানুষ—সে মর্মর পাথবে গড়া দেবতা নয়। তাহার ভ্রান্তি ও অন্যায়েব সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে তাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার অনুভূতি, তাহার জীবনের সমস্ত মাধুর্য। তাহার জীবনের যে কাব্য তাহার ছন্দ গাঁথা হইয়াছে ভুল ও অসঙ্গতিতে। সে যদি কেবল সাধু

ভাষাই বলিত আর সাধু কাজই করিত, তবে তাহার জীবন হইত নীরস কঠিন গদ্য। এসব সাহিত্যিকদের হাস্যরস মাধুর্যে ভরপুর—তাহাতে শ্লেষ নাই—বিদ্রূপ নাই।

শরৎচন্দ্রের রচনায় এই উভয়প্রকারের হাস্যরসেরই সন্ধান পাওয়া যায়। তাহার রচনায় একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ রহিয়াছে সমাজের চিরাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে। তিনি দেখাইয়াছেন সমাজ যাহাদিগকে পতিতা বলিয়া গালি দিয়াছে, চরিত্রহীন বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে তাহাদের হৃদয় এমনি মধুর যে সমাজের তথাকথিত নেতারা তাহাদের কাছে নতশির হইতে পারেন। বেণী ঘোষাল রমাকে কলঙ্কিনী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল, কিন্তু কাহার চরিত্র মহত্তর—বেণী ঘোষালের না রমার? শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে তাহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে ডাক্তারবাবু ও ঠাকুর্দা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে যে ঐশ্বর্য ও যে মাধুর্য আছে তাহার তুলনা কোথায়? ইহা হইতেছে শরৎচন্দ্রের গভীরতর রচনার মূলসূত্র। তাঁহার রসরচনার গোড়ার কথাও ইহাই। সামাজিক কলঙ্কের অন্তরালে যে মহিমা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহাকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, আবার যাহাদিগকে আমরা ছিট্‌গ্রস্ত বোকা বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছি তাহাদিগের জীবনের মাধুর্যও তিনি আহরণ করিয়াছেন। সংসারের কুটিল পথে কতকগুলি বিশ্বভোলা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহারা তীক্ষ্ণধী নহে, তাহারা হয়ত বা একান্ত বোকা, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণের ঔদার্য তাহাদিগকে মহীয়ান করিয়া দিয়াছে। সাংসারিক বুদ্ধি বা স্বার্থসিদ্ধির ক্ষমতা তাহাদের নাই—এই দিক দিয়া তাহারা কৌতুকের পাত্র। কিন্তু তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার বা অবজ্ঞা করিবার উপায়ও নাই, কারণ তাহারা কোন ছোট, নীচ কাজ করিতে পারে না। তাহাদের সংসারানভিজ্ঞতা তাহাদিগকে বর্মের মত সমস্ত নীচতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। কৈলাস খুড়োর মাথায় সমাজ-নীতির কূট তর্ক খেলিত না, সে রাজনৈতিক নেতা হইতে পারিত না। বিশ্বের দাবা খেলার বড় বড় গজ ঘোড়া তাহার ছিল না—তাহার মন্ত্রী ছিল শুধু অপরিসীম স্নেহানুভূতি।

'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়নাথ ডাক্তার আর 'দত্তা'র নরেন্দ্র ডাক্তার উভয়েই অদ্ভুত রকমের লোক। ইহারা হইতেছে একেবারে সংসারানভিজ্ঞ। সংসারে ইহারা চলে স্বপ্নাবিষ্টের মত। আর সেই জন্যই ইহারা কৌতুকের পাত্র। সজাগ লোকের কাছে সব চেয়ে কৌতুকের বিষয় হইতেছে সেই সব স্বপ্নচালিত লোক, যাহারা জাগিয়াও ঘুমাইয়া আছে, ঘুমাইয়াও জাগিয়া আছে। এখানকার আবহাওয়া ইহারা কিছুই বুঝে না, পৃথিবীর সবগুলি পথ ইহারা জানে না, যাহা

জানে তাহাও স্বপ্নের আবেশে ভাল করিয়া দেখে না, সংসারের বিচিত্রতার ইহারা ধার ধারে না। ইহার কোন একটা পথ ইহারা জানে এবং স্বপ্নের ঘোরে তধু তাহারই আশ্রয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু সংসারে কোন পথই সহজ ও সরল নহে। সবগুলি পথ মিশিয়া জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার নাম গোলোকধাঁধা। কাজেই যেই ইহাদের অভ্যস্ত পথ অন্য পথের সঙ্গে মিশিয়া যায় অমনি ইহারা গোল বাধাইয়া বসে। প্রিয়নাথ ডাক্তার জানেন রোগী দেখিতে আর রেমিডি সিলেক্ট করিতে, কিন্তু রোগীর মন যে কত বিচিত্র তাহার কোন সন্ধানই তিনি রাখেন না। সে যে সত্যি সত্যি মৃত্যুভয় না করিয়াও বলিতে পারে যে সে ব্যথায় মরিয়া যাইতেছে, অথবা সে পড়িয়া মরিবে, তাহার মনের গতি বা অনুভূতি যে বইয়ের লেখার মত সহজ ও সুস্পষ্ট নয় একথা তিনি জানিতেন না। তিনি শুধু বই পড়িয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে ব্যথার বর্ণনায় ঘর্ষণ, মর্ষণ, সূচির আঘাত বা বৃশ্চিকের দংশনের উল্লেখ আছে। এই সব কথা যে শুধু কথা—ব্যথাটাই যে মূল জিনিষ একথা তাঁহাকে কে বুঝাইবে? তিনি প্রায়ই বলিতেন যে মহাত্মা হেরিং বলিয়াছেন, রোগীর চিকিৎসা করিবে, রোগের নহে। কিন্তু তাঁহার কাছে রোগ ও রোগী উভয়ই ছিল বইয়ের কথামাত্র। কাজেই তিনি পরাণ ডাক্তারের সঙ্গে রেশারেশি করিতেন—রোগীর চিকিৎসা করিয়া নয়। সে তাঁহার হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইয়া দেখাইয়াছে যে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। তিনিও তাহার দেওয়া কেষ্টর অয়েল খাইয়া মহাত্মা হানেমান ও হেরিংয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। স্বপ্নচালিতের কাছে হোমিওপ্যাথি ঔষধও যা কেষ্টর অয়েলও তাই। তিনি সংসারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার জগতে ছিল শুধু কতকগুলি হোমিওপ্যাথির বই ও কতকগুলি কল্পিত রোগী। বিপিন ও পরাণ ডাক্তার চিকিৎসা করিত অর্থোপার্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, তিনি জীবন ধারণই করিতেন চিকিৎসা করিবার জন্য। কাজেই তাহাদের সন্ধানে ফিরিত রোগী আর তিনি ফিরিতেন রোগীর সন্ধানে। তাঁহার কাছে অন্য কিছুর অস্তিত্বই নাই।

'দত্তা'র নরেন ডাক্তারের পেশা হইতেছে জীবাণু লইয়া আলোচনা করা। কাছেই একটা জীবন্ত আত্মা যে তাহার জন্য নিঃশেষে মরিতেছিল সে তাহার কোন সন্ধানই রাখিত না। মানবমনের যত প্রবৃত্তি আছে তন্মধ্যে প্রেম হইতেছে সর্বাপেক্ষা জটিল, কিন্তু নরেন ডাক্তারের বুদ্ধি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল জীবাণুর জটিলতার সন্ধানে। হৃদয়ের আদানপ্রদানের কথা সে বুঝিত না। তাহার হৃদয়টি ছিল যেমনি সরল, যে রমণী তাহার জন্য

ব্যথিত পীড়িত হইয়া মরিতেছিল তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা ছিল তেম্‌নি জটিল। সে দেনার দায়ে তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাকে গৃহহীন করিয়াছে, অন্য লোকের সঙ্গে তাহার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে—ইহার অন্তরালে যে কত গভীর প্রেম আত্মরক্ষা করিতেছিল এবং নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য সহস্র উপায় খুঁজিয়া মরিতেছিল নরেন্দ্র তাহার কোন সন্ধানই রাখিত না। তাই সে বুঝিতে পারে না বিজয়া তাহাকে কেন এত যত্ন করে, কেন বিলাসবিহারী তাহাকে ঈর্ষা করে, কেন একটা পাগ্‌লা ভূত তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল আর কেন বিজয়া কখনও কখনও তাহাকে চিনিতেই পারে না বা অবহেলা করে। স্বপ্নমূঢ়ের এই অজ্ঞতাই হাস্যরসের মূলাধার।

প্রিয়নাথ ডাক্তারের একটা বিশেষ ছিট্ ছিল আর নরেন ডাক্তার ছিল কোন একটা বিশেষ বিষয়ে একেবারে অচৈতন্য। 'নিষ্কৃতি'র গিরিশ ছিলেন সব-বিষয়ে ভোলানাথ। তিনি বুঝিতেন না কিছুই। তিনি নাকি বড় উকিল ছিলেন, কিন্তু প্রিয়নাথ ডাক্তারের ডাক্তারির মত উহা তাঁহার নেশা হইয়া পড়ে নাই। গিরিশ সম্পূর্ণ স্বপ্নাবিষ্ট, অথচ সংসারের সব বিষয়েই তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইত। ছোট ভাই রমেশ কিছুই করিতে পারিতেছে না—পাটের দালালী করিয়া চার হাজার টাকা নষ্ট করিয়াছে; সে যাহাতে আর তাহার নিজের কষ্টলব্ধ অর্থ নষ্ট করিতে না পারে সেইজন্য তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ও তাঁহার মক্কেল বাগবাজারের সা'দের দৃষ্টান্ত দিলেন। কিন্তু তাহারা পাটের দালালী করিত না খড়ের দালালী করিত সে কথাই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। যে স্বপ্নচালিত—তাহার কাছে পাটও যা খড়ও তাই। রমেশকে আর টাকা দিতে পারিবেন না, তাহাকে আর বসাইয়া বসাইয়া খাওয়াইতে পারিবেন না, এইজন্য তিনি এই রায় দিলেন, "একবার হাজার গেছে—গেছেই। কুচ পরওয়া নেই—আবার চার হাজার দাও। তা বলে আমি খেটে মরব আর তুমি বসে খাবে!...সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক্ দিব। চার হাজার টাকার খড় কিন্‌বে আর চার হাজার টাকা জমা থাকবে। এটা হলে তবে ও-টাকায় হাত দেবে—তার আগে নয়। বুঝলে? আমি তোমাদের বসে বসে খাওয়াতে পারব না।" রমেশের জন্য তাঁহার কষ্টলব্ধ অর্থ নষ্ট না হইতে দেওয়ার কি বিচিত্র উপায়! ইনি রমেশের সঙ্গে মোকদ্দমা করিলেন, অবশেষে রমেশকে জব্দ করিবার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি রমেশের স্ত্রীর নামে লিখিয়া দিলেন।

গিরিশের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী ও 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র গোকুলও অনেকটা এই ধরণের লোক; তাহারা একটু বোকা—একটু দুর্বলচিত্ত। সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়াছেন যে পঞ্চাশ টাকা এক আঁচলা টাকা—বারোগণ্ডার উপর দু'টাকা দিলেই পঞ্চাশ টাকা হয় একথা তিনি কিছুতেই মানিয়া লইলেন না। গোকুল এমনি বোক যে সে ক্লাশের পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে না আর নকল করিবার যে বিদ্যা সব ছেলের আছে তাহা পর্যন্ত তাহার নাই। ইহারা হাস্যরসের উদ্রেক করে ইহাদের একান্ত স্নেহশীলতা দিয়া। সংসারের নিয়ম হইতেছে স্বার্থের নিয়ম, ইহার মধ্যে স্নেহের স্থান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তাই যখন কাহারও স্নেহ সমস্ত সীমা অতিক্রম করিয়া উপ্‌চিয়া পড়ে তখন ইহার মাধুর্যে আমরা অভিভূত হই আবার ইহার অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতায় কৌতুক অনুভব করি। সিদ্ধেশ্বরী শৈলজাকে একরকম তাড়াইয়াই দিয়াছিলেন, কিন্তু কানাই, পটল খাইতে পারিল কিনা, না না-খাইয়াই শুইয়া পড়িল এইসব কথা চিন্তা করিয়া তিনি নিজে ঘুমাইতে পারিলেন না এবং পরদিনই মোকদ্দমা করিয়া শিশু দুইটিকে লইয়া আসিবেন ইহা স্থির করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

ভাইদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়, সাধারণ রকম ভাবও থাকে, কিন্তু অনার গ্রাজুয়েট ভাইয়ের জন্য গোকুলের প্রীতিটা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। সে পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারিলেও সগর্বে ঘোষণা করিত যে তাহার ভাই ডবল প্রমোশন পাইয়াছে। বিনোদের গর্ভধারিণী ভবানী তাহার বিমাতা, গোকুল জানিত এই মা তাহারই। বিনোদের বাড়ী আসিয়া সে বলিয়া গেল, "সব মিথ্যে। কলিকাল—আর কি ধর্ম-কর্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমায় দিয়ে বল্লেন, 'বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা।' আমি ভাল মানুষ, নইলে বেন্দার বাপের সাধ্য কি সে আমার মাকে জোর করে নিয়ে আসে। কেন আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি এখন জোর করে নিয়ে যেতে পারি। এই হল বাবার আসল উইল।" বিলক্ষণ! বাপের সম্পত্তি সবাই দাবী করে—কিন্তু এ যে বিমাতাকে দাবী করা! বৈমাত্র ভাইয়ের monopolyতে হস্তক্ষেপ।

গিরিশ বা গোকুলের মত আত্মভোলা লোক বিরল। মানবজীবনের গোড়ার কথা হইতেছে—অহংজ্ঞান। নিজেকে জাহির করা, নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া—ইহা ~~মানবের~~ জীবনের মূলমন্ত্র। মানুষের এই মজ্জাগত প্রবৃত্তি লইয়া আবার সবাই মজাও করে। মানুষ নিজেকে যেমন জাহির করে তেমনি অপরের অহংজ্ঞানকে ঠাট্টাবিদ্রূপও করে। রসরচনার ইহাও একটা প্রধান

বিষয়বস্তু, শরৎ-সাহিত্যে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, আর ইহাতেও শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। দুঃখ-দুর্বলতাপূর্ণ মানবজীবনের প্রতি তাঁহার অনন্ত সহানুভূতি। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই অহংজ্ঞান একটা মধুর দুর্বলতা মাত্র। ইহা আমাদের সকল কর্ম ও সকল চিন্তার অন্তরালে থাকিয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া তাহার হাস্যোজ্জ্বল রশ্মিসম্পাত করে। রেঙ্গুনের বিখ্যাত হরিপদ মিস্ত্রীর কাছে শ্রীকান্ত রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। "অমনি লোকটা অসম্ভ্রমসূচক এক প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, ওঃ মিস্তিরী! অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় ম'শায়। মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়। মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত কাউকে দেখতে পাইনে, তখন বড় সাহেবের কাছে কতখানি উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন?—একশখানি। আরে কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম?—কেটে যে জোড়া দিতে পারি।" রাখাল পণ্ডিত বলিয়াছিল, "মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।" শিবু পণ্ডিত বলিল, "এ মন্ত্র মিথ্যা। আসল মন্ত্র হইতেছে, মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ। যতদিন জীবন ধারণং ততদিন ভাতকাপড় প্রদানং স্বাহা।' এম্‌নি করিয়া সে প্রমাণ করিয়া দিল যে আসল মন্ত্র সে একাই জানে, আর সবাই যজমানকে ঠকাইয়া খায়। ইহাদের ঝগড়া শুনিয়া রতন আভিজাত্যগৌরবে স্ফীত হইয়া বলিল "তোদের ডোম ডোকালির আবার বিয়ে। এ ত আমাদের বামুন কায়েত নবশাকের বিয়ে নয়।' এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে রতন জাতিতে নাপিত।

এই হরিপদ মিস্তিরী, রতন নবশাক শিবু পণ্ডিত বা পটলডাঙ্গার মেসের চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ—ইহারা অন্য দশ জনের মত সুখে দুঃখে জীবন যাপন করিয়াছে। ইহাদের জীবনযাত্রার অন্তরালে রহিয়াছে এই সুতীক্ষ্ণ অহঙ্কার। ইহা তাহাদের দুঃখদৈন্য প্রপীড়িত জীবনকে অপেক্ষাকৃত সহনীয় করিয়া দিয়াছে। ইহাতে বিদ্রূপ করিবার, ঘৃণা করিবার কিছুই নাই। শরৎচন্দ্রও ইহাকে ব্যঙ্গ করেন নাই। ইহা সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনকে কত সরস করিয়া দেয় তিনি শুধু তাহাই দেখাইয়াছেন। তাহার রসরচনার মূলে রহিয়াছে তাঁহার অখণ্ড সহানুভূতি। যাহারা অপাংক্তেয়, মূঢ়, তিনি তাহাদের জীবন তাহাদের মত করিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সব্যসাচী যখন গিরিশ মহাপাত্র সাজিয়াছিলেন তখন তিনি ঠিক তেম্‌নি করিয়া নেবুর তেল মাখিয়াছিলেন ও ঠিক তেম্‌নি করিয়া গাঁজার কল্‌কে ধরিয়াছিলেন যেমন করিয়া একজন নির্জীব, নেশাখোর ছোটলোক তেল মাখে ও গাঁজার কল্‌কে ধরে।

রেঙ্গুন যাত্রার যে বর্ণনা শরৎচন্দ্র দিয়াছেন তাহা এত মধুর হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে তিনি সাধারণ লোকের অজ্ঞতা, ভয় ও আনন্দ ঠিক তাহাদের মত করিয়াই দেখিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের জীবন ঠিক সুসভ্য, ভদ্র, শিক্ষিত লোকের মত নয়, কিন্তু তাহাদের আনন্দানুভূতি আমাদের মতই তীব্র আর যেহেতু তাহাদের জীবন ঠিক আমাদের ছাঁচে ঢালা নয় সেই জন্যই উহা আমাদের কাছে কৌতুকাবহ। তাহারা Beethoven-এর সঙ্গীত সাধে না, কিন্তু তাহাদেরও সঙ্গীত আছে, কাবুলিওয়ালাও গান গায়। তাহাদের জীবন দৈন্যপ্রপীড়িত, কিন্তু তাহার একটা উন্মুক্ততা আছে যাহা সুসভ্য লোকের জীবনে নাই। ডেকের যাত্রীদের জীবনে ঐশ্বর্য নাই, কিন্তু তাহার একটা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত গতি আছে যাহা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জীবনে নাই—ইহাকেই শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা কৌতুকময়, কারণ ইহা আনন্দময়, সভ্যতার বিধিনিষেধে ইহার সাবলীল গতি প্রতিহত হয় নাই। ইহা আমাদের সুসভ্য জীবনের অপেক্ষা বিভিন্ন ও অনেকাংশে নিকৃষ্ট। যাহারা সুসভ্য নিয়ম মানিয়া চলে, তাহারা নিয়মের ব্যতিক্রম, কোন একটা কিছু বিকৃত বা অদ্ভুত দেখিলেই হাসে। এই হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে প্রাধান্যবোধ। এই সব তথাকথিত ছোটলোকেব জীবনযাত্রা দেখিয়া যে হাসির সঞ্চার হয় তাহার মধ্যেও এই প্রাধান্যবোধ নিহিত আছে সত্য। কিন্তু তাহাদেব সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তির পবিচয়ে আমরা চরিতার্থও হই। আমাদের হাসি সহানুভূতির রসে সঞ্জীবিত হয। মানবজীবনের প্রতি এই বিস্তীর্ণ সহানুভূতি শরৎচন্দ্রের রচনার প্রধান বিশেষত্ব।

এই বিস্তীর্ণ সহানুভূতি তাঁহার শিশুচরিত্রেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। শিশুর জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভূতিকে তিনি শিশুর সরলতা দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিযাছেন। থিয়েটারে গ্রীণরুমের গোপন রহস্য দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, ষ্টেজের উপর মেঘনাদের বীরত্ব—ইহার তিনি জীবন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। "ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নহে—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়াই আত্মরক্ষা করিতে হইল।" অভিনয়ের যুদ্ধ যে সত্যিকার যুদ্ধ নহে—একথা শিশু বুঝে না। শরৎচন্দ্রের এই বর্ণনার মধ্যে বালকের সরল বিস্ময়ানুভূতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। শিশু তাহার সহজ সরলতা দিয়া প্রেম আদানপ্রদানে কিরূপ অসুবিধা করে, নারীহৃদয়ের

গোপন কথা কেমন করিয়া বাহির করিয়া দেয় তাহার চিত্র রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন 'বঙ্কিম্বার' সতীশে। 'দত্তা'র পরেশও কম নহে। তাহার কাছে বাতাসা কেনা নরেন্দর বাবুর সংবাদ নেওয়া হইতে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং যে কথা বিজয়া অতি সঙ্গোপনে রাখিতে চায় তাহা সে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

শুধু শিশু কেন—ভয়ের তাড়নায় বা নিরাশ প্রেমে বয়স্ক ব্যক্তিও কিরূপ শিশুর মত ব্যবহার করিতে পারে তাহার চিত্রও শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন ছিনাথ বউরূপী বাঘ সাজিয়া শ্রীকান্তদের বাড়ী আসিলে তাহাকে খাঁটি বাঘ মনে করিয়া শ্রীকান্তের পিসেমহাশয় ও ভট্চায ম'শায় যে চীৎকার করিয়াছিলেন এবং গম্ভীরপ্রকৃতি মেজদা' The Royal Bengal Tiger দেখিয়া ফিট হইয়া যে আর্তনাদ করিয়াছিল তাহা একেবারে শিশুসুলভ। মহিমের অসাক্ষাতে সুরেশ অচলা ও কেদারবাবুর সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছে এমন সময় একদিন ভূতের মত মহিম তথায় উপস্থিত! অচলা সুরেশকে অগ্রাহ্য করিয়া মহিমের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত হইল দেখিয়া সুরেশ হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে মাপ করতে হবে কেদারবাবু, আমার আর এক মিনিট অপেক্ষা করবার যো নেই···না, না, এ-ভুলের মার্জনা নেই। আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ আজ প্লেগে মৃতকল্প, আর আমি কিনা সমস্ত ভুলে গিয়ে এখানে বোসে বৃথা সময় নষ্ট কর্চ্ছি!" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সুরেশ এতক্ষণ অচলার সঙ্গে বসিয়া ছবি দেখিতেছিল! হঠাৎ এইভাবে স্বার্থত্যাগের গল্প উদ্ভাবন করিয়া সে অচলাকে এইকথা জানাইয়া দিতে চেষ্টা করিল যে মহিমের অপেক্ষা সে কত মহৎ। এই অভিমানাহত আস্ফালন একেবারে বালকসুলভ। টগর বোষ্টমী ও নন্দ মিস্ত্রীর জীবনযাত্রার মধ্যেও এই প্রকারের শিশু-জীবনের সরলতা আছে। টগর নন্দ'র ঘর করিয়াছে বহুদিন, তাহাকে তাহার সব সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার আভিজাত্য বজায় রাখিয়াছে। সে নন্দ'র ঘরণীগৃহিণী হইতে পারে, কিন্তু এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে তাহার জাতি নষ্ট করে নাই—বিশ বছরের মধ্যে একদিনও সে নন্দকে হেঁসেলে ঢুকিতে দেয় নাই। তাই নন্দ যখন এই বিশ বচ্ছরের গৃহিণীকে পরিবার বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিল তখন টগর সরোষে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল, "সাত পাকের সোয়ামী আমার, বল্‌ছেন কিনা পরিবার···জাতবোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হব কিনা কৈবর্তের পরিবার।" এইরূপে অশ্রান্তভাবে তাহাদের কলহ মারামারি চলিতে লাগিল। নন্দ'র কাছে টগর তাহার সত্যিকার মান

সমর্পণ করিয়াছিল—শেষে জাতিগত মিথ্যা অভিমান লইয়া কলহ ও মারামারি। দুই শিশু যেমন করিয়া সামান্য খেলনা লইয়া কলহ করে এ তেমনি কলহ আর তাহাদের ঝগড়া যেমন আপনা হইতেই মুহূর্তের মধ্যে মিটিয়া যায় ইহাদেরও ঠিক তেমনি।

মানব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মান-অভিমানের আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতির অন্তরালে যে কৌতুকের ধারা আছে তাহাকে এমনি করিয়া শরৎচন্দ্র প্রকাশ করিয়াছেন। রতনের জাত্যভিমান, রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তের প্রতি সাময়িক উপেক্ষা, কুঞ্জবোষ্টমের পত্নী-প্রীতি, ইহাদের সবারই উপরে তিনি কৌতুকের শুভ্ররশ্মিপাত করিয়াছেন। আর এক প্রকারের লোক আছে যাহারা নীচ, স্বার্থপর, যাহারা সংসাবিতে পাকা কিন্তু মানুষের সত্যিকার সম্পদে কাঙ্গাল। শরৎচন্দ্র তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তীব্র কশাঘাত করিযাছেন। কপট, ধর্মধ্বজী, স্বার্থপর লোকদিগকে তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন আর দেখাইয়াছেন তাহারা কিরূপে পদে পদে স্বার্থহীন ভালমানুষদের কাছে পরাজিত হইযাছে। এই প্রকারের চরিত্রের মধ্যে প্রধান হইতেছে 'শেষপ্রশ্নে'র অক্ষয় ও 'দত্তা'র রাসবিহারী। অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক, সবজান্তা সমাজনৈতিক। সে হিন্দুধর্ম ও নীতির ধ্বজা—কোন প্রকাব অন্যায় বা ব্যভিচার তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহাকে ঠকান যায় না; শিবনাথের লাম্পট্য ও মদ্যপানের কথা সর্বত্র প্রচার করিয়া সে আগ্রা সমাজের শুচিতা রক্ষা করে। কমল অন্য সবাইকে ঠকাইতে পারে; কিন্তু অক্ষয় জানে যে সে কুলটা, তাহার সংস্পর্শ সর্বথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণচেতা লোকটি পদে পদে অপদস্থ হইয়াছে—সবাই তাহার সঙ্কীর্ণতা লইয়া উপহাস করিয়াছে। শরৎচন্দ্র দেখাইযাছেন যে সত্যিকার অপাংক্তেয় লোক এই অনুদার অধ্যাপক—চরিত্রহীন শিবনাথ বা কমল নহে। 'দত্তা'র রাসবিহারী একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি কপটতার প্রতীক। প্রবন্ধান্তরে তাঁহার চরিত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। এইখানে শুধু একটি কথা বলা দরকার। এই অতিরিক্ত বুদ্ধিমান লোকটি বারংবার প্রতিহত হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত ফিকিরফন্দি চুরমার হইয়া গিয়াছে। আর এই যে তিনি ঠকিয়াছেন ইহা কৌশলী চতুর শত্রুর কাছে নহে। তাঁহার পরাজয় হইয়াছে এক তরুণী বালিকার কাছে (যাহার অভিভাবক ছিলেন তিনি নিজেই) আর এক সর্বভোলা যুবকের কাছে যাহার সর্বস্ব তিনি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। শরৎ-সাহিত্যে এই ভোলানাথদেরই জয় হইয়াছে।

আরও কয়েকটি স্বার্থান্ধ লোকের পরিচয় আমরা পাই। যেমন শ্রীকান্তের

মেজদা' ও নতুনদা'। মেজদা'র আক্রমণের ক্ষেত্র ছিল স্বল্পপরিসর, কিন্তু ইহার মধ্যেই শিশুদের উপরে তিনি যেরূপ বিধিবদ্ধভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল। শ্রীকান্তের নতুনদা' অখণ্ড স্বার্থপরতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাহার বিলাসিতা, সাধারণ মানুষের প্রতি ঘৃণা, মিথ্যা সভ্যতাভিমান, সঙ্গীতে ব্যর্থ অনুরাগ, প্রকৃত বলিষ্ঠতার অভাব—শরৎচন্দ্র এই সমস্ত দুর্বলতাকে তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন। 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র জয়লাল বাঁড়ুজ্যে এই প্রকারের আর একটি নীচ প্রকৃতির লোক; সে গোকুল, ভবানী, বিনোদ, নিমাই রায় প্রভৃতি সবাইকে খোসামোদ করিয়া তাহাদিগেব মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিত। অভয়ার "মন্ত্রপড়া" স্বামীকে আমরা খুব অল্পই দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যেই শরৎচন্দ্র এই পাষণ্ডের মেরুদণ্ডহীনতা, নির্লজ্জ মিথ্যাবাদিতার প্রতি যথেষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছেন। নারীর সমস্ত মহিমা নিঃশেষে মুছিয়া গেলে তাহাব মন কত নির্লজ্জ, কত কুৎসিত হইতে পারে তাহার ব্যঙ্গ-চিত্র শরৎচন্দ্র আঁকিযাছেন রাসী বামনী, মোক্ষদা ও কামিনী বাড়ীউলির চরিত্রে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এখানে নয়। মানবজীবনের গোপন মাধুর্যকে তিনি গভীব সহানুভূতি দিয়া বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিযাছেন—ইহাতেই তাহার বিশেষত্ব। রসবচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ইহারও বিকাশ হইযাছে তাঁহাব সহজ সবল গভীব অনুভূতিতে—স্বার্থবুদ্ধিহীন বিশ্বভোলা চরিত্রেব অঙ্কনে। যে জ্যাঠাইমা দেবর-কন্যা জ্ঞানদাকে নানাপ্রকার জ্বালাতন করিত তিনি সেই স্বর্ণমঞ্জরীকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাব প্রতিভার বিশেষ বিকাশ হইয়াছে সেই জ্যাঠাইমাব চরিত্রাঙ্কনে যিনি তাঁহার দেবর-পুত্র তাঁহাব কাছ ছাড়িয়া নিয়মমত খাইতে পারিল কি না এই চিন্তায় ঘুমাইতে পারেন নাই এবং মোকদ্দমা করিয়া তাহাদিগকে তাহাদেব মার নিকট হইতে লইযা আসিবেন এই হাস্যকর প্রস্তাব গম্ভীরভাবে উত্থাপন করিয়াছিলেন। কলঙ্কের অন্তরালে জীবনেব যে মহিমা লুকাইযা রহিয়াছে তাহাকে শরৎচন্দ্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন আব নির্বুদ্ধিতাব নীচে মনুষ্যত্বেব যে ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইয়াছে তাহাকে তিনি হাসির কলরোলে মুখর করিয়া দিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গঠন-কৌশল

শরৎচন্দ্রের রচনারীতির আলোচনা করিলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়িবে গল্পের গঠন-কৌশলের প্রতি। নাটক বা উপন্যাসের চরিত্র ও গল্পের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান ইহা লইয়া সমালোচকেরা তর্ক তুলিয়াছেন। ট্র্যাজেডির আলোচনায় অ্যারিষ্টটল্ বলিয়াছেন যে প্লট্ চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা মুখ্য। তাঁর এই মত অনেকেই গ্রহণ করিবেন না, এমন কি গ্রীক্ ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও ইহা গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান কালের সমালোচকগণ কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রসৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। এই বিষয়ে কোন সর্ববাদিসম্মত নির্দেশ দেওয়া কঠিন। কাহিনীর উদ্দেশ্য মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের অভিব্যক্তি দেওয়া, আবার মানব মনের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশিত হয় কাহিনীর মধ্য দিয়াই। শ্রেষ্ঠ আর্ট এই দুই উপাদানের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গভীরভাবে আলোচনা করিলে মনে হয় তাঁহার প্রধান লক্ষ্য চরিত্রসৃষ্টি, আখ্যায়িকা চরিত্রসৃষ্টির বাহন হিসাবেই উদ্ভাবিত হইয়াছে। মানবমনের পরমাশ্চর্যময় বৈশিষ্ট্য দেখিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা স্পন্দিত হইয়াছে। এবং তাহাকে প্রকাশ করিতেই তিনি কাহিনীর সূত্র গাঁথিয়াছেন। শুধু এক 'পরিণীতা'য় দেখি যে কাহিনীর রহস্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ছাপাইয়া গিয়াছে। শেখরের ভুলই উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান কথা। ইহা ছাড়া অন্য সকল কাহিনীতেই চরিত্রের রহস্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, গল্পাংশ সেই রহস্যের বহিঃপ্রকাশের উপায় মাত্র। এই কারণে শরৎচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত অপরিণত রচনার শিল্পকলা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির উপযোগী কাহিনী উদ্ভাবিত হয় নাই এবং এই দৈন্য ভরিতে হইয়াছে অবিশ্বাস্য ঘটনা বা ভাবাতিশয্যপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা। 'দেবদাস' উপন্যাসের চন্দ্রমুখী সম্পর্কিত কাহিনী, 'স্বামী', 'বিরাজবৌ'র প্রথমাংশ, 'বড়দিদি'র উপসংহার ও 'বিপ্রদাস' এই অপরিণতির পরিচয় দেয়।* শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে দেখি চরিত্রের

* শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ কাহিনীর মধ্যে একজন নায়িকা থাকে যাঁহার শক্তি অনন্যসাধারণ এবং নানা বাধার মধ্য দিয়া এই শক্তি বিরূপে প্রকাশিত হয় তাহাই তাঁহার উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। যেখানে নায়িকার বাধা অন্তর্লীন নহে, সেইখানে কাহিনীও হইয়াছে প্রাণহীন। সুনন্দার ইতিহাস চমকপ্রদ, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সজীব নহে। 'নববিধান' এইরূপ

ও কাহিনীর অপরূপ সামঞ্জস্য হইয়াছে; কোথাও অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধি নাই, গল্প তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে, নায়কনায়িকার হৃদয়ের অভিব্যক্তির জন্য কোথাও সে থামে নাই। অথচ চরিত্রের প্রত্যেক অণুপরমাণু কাহিনীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, যেন নায়কনায়িকার হৃদয়ের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য কাহিনী পূর্ব হইতেই সাজান ছিল। 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাতে নারীহৃদয়ের গভীরতম রহস্যের অপূর্ব অভিব্যক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়াও এই উপন্যাস অদ্বিতীয়। কাহিনীর আরম্ভ, পরিণতি ও পরিসমাপ্তির মধ্যে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, কোথাও একটি ঘটনা অনাবশ্যকরূপে বড় হইয়া উঠে নাই; কোন অংশ হঠাৎ খণ্ডিত হইয়া পড়ে নাই। প্রত্যেকটি খণ্ডচিত্রই নিখুঁত হইয়াছে আবার সকল খণ্ডচিত্রই হইয়াছে একটি বৃহত্তর ঐক্যের অংশমাত্র।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আখ্যায়িকা নানা উপায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি উপন্যাসে একটি মাত্র কাহিনী আছে, কোন অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা নাই। প্রারম্ভে নায়কনায়িকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং কি করিয়া গোলযোগের সূত্রপাত হইতে পারে তাহার সূচনাও উপন্যাসের প্রথম ভাগেই আছে। তারপর মধ্যভাগে আখ্যায়িকায় নানা জটিলতা ও দ্বন্দ্ব আসিয়া পড়ে, এবং একটি ঘটনায় এই জটিলতা চরমে পৌঁছায়। ইহাই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় ব্যাপার এবং ইহার পরে উপন্যাস তাহার পরিসমাপ্তিতে উত্তীর্ণ হয়। সাধারণতঃ দুইটি বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত ঘটনা থাকে, একটি মধ্যভাগে যেখানে কাহিনী চরমে পৌঁছায়, আর একটি পরিসমাপ্তিতে—মধ্যভাগে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, এইখানে তাহার নিরসন হয়। এই শ্রেণীর উপন্যাস হইতেছে 'দত্তা', 'পণ্ডিতমশাই', 'দেবদাস', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি। এইসব উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কোন অবান্তর ঘটনা আনেন নাই অথচ তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে কাহিনীর স্বল্পতা বা দীনতাও নাই। 'দত্তা'র কাহিনী বিশেষভাবে নরেন্দ্র-বিজয়া-বিলাসবিহারীর কাহিনী। ইহাদের পিতাদের বাল্যজীবনের ইতিহাসের সূত্র আছে, কিন্তু সেই ইতিহাসের মধ্যে যে অংশ উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক শুধু তাহারই উল্লেখ আছে; উপন্যাসের শেষের দিকে নলিনী প্রাধান্য লাভ

প্রাণহীনতার সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন। মনে হয় গল্পের কোন চরিত্রই সজীব মানুষ নহে; নায়িকা উষা কতকগুলি খেলার পুতুলে দম দিয়া দিয়াছে এবং তাহারা নির্দিষ্ট পথে সঞ্চরণ করিতেছে। এইখানে কাহিনীর উপযোগী চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই।

করিতেছিল, কিন্তু অনতিকাল পরেই আমরা জানিতে পারিলাম নলিনীর মন বাঁধা আছে অন্যত্র এবং বিজয়ার হৃদয়ে মিথ্যা ঈর্ষা সঞ্চারিত হইয়া যাহাতে তাহার অন্তরের সত্য কথা বাহির হইয়া পড়ে সেইজন্যই নলিনীকে আনা হইয়াছে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসেও দেখি মৃণাল, রাক্ষুসী, রামবাবু ইহাদের নিজস্ব কাহিনীর দ্বারা ইহারা উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করে নাই, মহিম-অচলা-সুরেশের কাহিনীতে ইহাদের যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু জায়গাই ইহারা পাইয়াছে, ইহার অধিক জায়গা জুড়িয়া বসে নাই।

আরও একটি কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'গৃহদাহ' ও 'দত্তা'র মধ্যভাগে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অফুরন্ত বলিয়া মনে হয়; কেমন করিয়া যে তাহার অবসান হইবে, সেই সম্পর্কে প্রায় শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিতের রহস্য থাকিয়াই যায়। যখন মনে হইয়াছে, প্রবল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বিজয়া নরেন্দ্রকেই গ্রহণ করিবে তখনই দেখি রাসবিহারী সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন এবং বিজয়াও নিশ্চিত বুঝিতেছে যে তাহার নিস্তার নাই। আবার তাহার পরই দেখি ধূমকেতুর মত নরেন্দ্র উপস্থিত হইয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে। কাহিনীটিতে উত্থান-পতনের অবধি নাই, যখনই কোন তরঙ্গ উত্তাল হইয়াছে তৎপরেই তাহা আবর্ত রচনা করিয়াছে। বিবাহের দিন ধার্য হইয়া রহিয়াছে, আশীর্বাদ পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ বিজয়ার পিতার চিঠির কথা বলিয়া তাহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল, এবং অপর দিকেও রাসবিহারীর সঙ্গে বিজয়ার প্রকাশ্য কলহ হইয়া গেল। ইহার পরই দয়ালের বাড়ী যাইয়া নরেন্দ্র-নলিনীর সংশ্রব দেখিয়া সে বিলাসের প্রতি অনুকূল হইয়া পড়িল ও বাড়ী ফিরিয়া বিনা আপত্তিতে ব্রাহ্মবিবাহের দলিল সহি করিল। ইহার পর নরেন্দ্র আবার উপস্থিত হইয়া সমস্ত ওলট্‌পালট্‌ করিয়া দিল। এমনি করিয়া আখ্যায়িকা দক্ষিণে বামে হেলিয়া তির্যকগতিতে চলিয়া গিয়াছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের গঠন আরও সুন্দর। ঘটনাবলী এমনভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে অচলা সুরেশ ও মহিমের মধ্যে কোন একজনের সঙ্গে স্থির হইয়া থাকিতে পারে নাই। যখন মনে হইয়াছে সে একান্তভাবে মহিমের প্রতি অনুরক্তা তখনই দেখি যে তাহার প্রতিবেশ এম্‌নি করিয়া রচিত হইয়াছে অথবা আকস্মিক এমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে যে সে সরিয়া আসিয়া সুরেশের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আবার সুরেশের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরই দেখি, সে অনিবার্যবেগে বিপরীত দিকে চালিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের বিরুদ্ধতা, মৃণালের সম্পর্কে ঈর্ষা ও মহিমের নীরব ঔদাসীন্যে যখন অচলার মন বিতৃষ্ণায়

ভরিয়া উঠিতেছিল, "ঠিক এমনি সময় বাহির হইতে সুরেশের চীৎকার আসিয়া পৌঁছিল—মহিম? কোথা হে?" তারপর কয়েকদিন টানা হেঁচড়ার পরে, অচলা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়া সুরেশের সঙ্গে চলিয়া আসিল। কিন্তু ইহার পরই মহিম পড়িল গুরুতর অসুখে এবং যে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অচলা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাকেই সে ফিরিয়া পাইল সেবার মধ্য দিয়া। কিন্তু স্বামীকে সে পাইয়াও পাইল না; সুরেশ আসিয়া গোল বাধাইয়া দিল। যখন কঠিন দ্বন্দ্বের পরে সুরেশের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সুরেশের পাশে বসিয়া ধনী গৃহিণীর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রামবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে, তখন দেখে যে মহিম সেইখানে উপস্থিত। এইভাবে একটির পর একটি ঘটনা সাজান হইয়াছে—কোথাও অপূর্ণতা নাই, কোথাও বাহুল্য নাই, কোথাও বিরাম নাই।

কাহিনীর গঠনকৌশল বিচার করিবার সময় আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। শরৎচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, শুধু বাহিরের ঘটনা সাজাইয়া অন্তরের পরিমাপ করা যায় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায় যে হৃদয়ের গোপনতম রহস্যের সঙ্গে বাহিরের ঘটনার নিবিড় সংযোগ আছে। মহিমকে ছাড়িয়া সুরেশ ও অচলার মোগলসরাইতে নামিয়া ডিহ্‌রীতে যাওয়া 'গৃহদাহ' উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আকস্মিক ও অদ্ভুত ঘটনা। শুধু বাহির হইতে বিচার করিলে ইহা অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সুরেশ পরস্ত্রীলুব্ধ এবং চঞ্চল, দুঃসাহসী ও দুর্দমনীয় প্রকৃতির লোক। তারপর তাহার এই দুষ্কার্যে অচলার অন্তরতম আত্মার সমর্থন ছিল। সুরেশ নিজেই বলিয়াছে "স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপর বলেছিলে, একজন পর পুরুষকে ভালবাসো—সে কি ভুলে গেলে? যে লোক ঘরে আগুন দিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল ব'লে তোমার বিশ্বাস, তার সঙ্গেই চ'লে আসতে চেয়েছিলে এবং এলেও তাই। স্মরণ হয়…?" অচলার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সুরেশের জন্য যে সমবেদনা সুপ্ত ছিল তাহা এই ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ইহাই যে তাহার হৃদয়ের শেষ কথা নহে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে পরবর্তী কাহিনীতে। যে রাত্রিতে সীমাহীন দুর্যোগে অচলা সতীধর্ম বিসর্জন দিয়াছিল, সেই দিনকার আচরণেও বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের অনুরক্তির সামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অচলা সুরেশকে ঘৃণা করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সে ইহাও বুঝিত যে সুরেশ তাহারই জন্য সর্বস্ব দিয়াছে; তাহাকে আনন্দে ও আরামে রাখিবার জন্য ইহার মনে ব্যাকুলতার অন্ত নাই। এই জন্যই

সুরেশ ভিজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলে সে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার যে অন্তরাত্মা সুরেশের প্রতি অনুকূল ছিল তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং রামবাবুর সনির্বন্ধ আবেদন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ তাহাকে স্পন্দিত কবিয়াছে। অচলা নিজেকে বুঝাইয়াছিল যে রামবাবুর পীড়াপীড়ি এবং মিথ্যা সম্মান ও শ্রদ্ধার লোভই তাহাকে সীমাহীন অন্ধকারেব পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল; সে জানিত না যে বাহিরের এই প্রেরণার অন্তবালে রহিয়াছিল নিজের হৃদযের গোপন আকাঙ্ক্ষা ও অনুরক্তি। 'দত্তা'র মধ্যেও এই সামঞ্জস্য সর্বত্র বর্তমান। বনমালীবাবু বিজয়াকে নরেন্দ্রের কাছেই দান করিযাছিলেন। ইহাব প্রথম আভাস গ্রন্থেব প্রারম্ভে দেওয়া হইলেও, বিজয়া এই বিষযে সম্পূর্ণ তথ্য তখনই জানিল যখন মনে মনে সে নরেন্দ্রনাথকে বরণ করিয়া লইযাছে। রাসবিহারী বিজযাকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল বাহির হইতে চাপ দিযা, কিন্তু বিজয়া তাহার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিতে সেই দিনই প্রস্তুত হইল যেদিন সে অসংশয়ে বিশ্বাস করিল যে বিলাসবিহারীর অপরাধই সব চেয়ে কম।

এই শ্রেণীর অন্যান্য যে সকল উপন্যাসেব উল্লেখ কবা হইয়াছে তাহারা 'গৃহদাহ' ও 'দত্তা'র মত সুগঠিত নহে, কিন্তু যে মাত্রাবোধ ও সামঞ্জস্যজ্ঞান এই দুই উপন্যাসেব গঠনকৌশলকে অনবদ্য কবিযাছে তাহাব পবিচয় অল্পাধিক পবিমাণে সর্বত্রই পাওযা যায়। শুধু 'দেনাপাওনা'য় একটু বৈষম্য দেখা যায়। 'দেনাপাওনা'য় বাহিরেব ঘটনাব সঙ্গে হৃদয়ের আসক্তি-বিরক্তির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার গঠন-রীতি অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা পৃথক। এই কাহিনীতে চরম সঙ্কটময় মুহূর্ত আসিয়াছে উপন্যাসের মধ্যভাগে নহে, প্রারম্ভেই, যেখানে ষোড়শী জীবানন্দের শয্যা স্পর্শ করিয়া নারীত্বের প্রথম সন্ধান পাইল। ইহার পর সে আর কিছুতেই ভৈরবীব কাজে মন বসাইতে পাবে না। কোন কাহিনী প্রারম্ভেই চরমে পৌঁছিলে তাহাকে পরিসমাপ্তি পযন্ত টানিয়া নেওয়া কষ্টকর। এই জন্য শরৎচন্দ্র একটি উপায় উদ্ভাবন করিযাছেন; ইহা হইতেছে নির্মল-হৈমবতী উপাখ্যানের অবতারণা। জীবানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া ষোড়শীর যে সুপ্তচেতনা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা উত্তেজিত হইল নির্মল-হৈমর শান্ত স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা দেখিয়া। জীবানন্দ ও ষোড়শীর মধ্যে যে বিরুদ্ধতা ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইযা গেল ইহাদের সাহায্যে। ষোড়শী সানন্দে স্বচ্ছন্দে ভৈরবীপদ পরিত্যাগ করিযা জীবানন্দের হাতে তাহার আরব্ধ, অসম্পূর্ণ কাজের ভার দিল। জীবানন্দ যে সম্পূর্ণরূপে ষোড়শীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছিল, তাহার প্রেরণা অবশ্য নিজের হৃদয় হইতেই আসিয়াছিল,

কন্তু নির্মলের বিরুদ্ধে ঈর্ষাও এই প্রেরণাকে কথঞ্চিৎ উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। উপন্যাসের উপসংহারে দেখি জীবানন্দ তাহার কাজ ফেলিয়া ষোড়শীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেল; স্বামী ও স্ত্রীর এই সম্মিলনেও রহিয়াছে হৈম'র প্রতি উপচিকীর্ষা।

'দেনাপাওনা'য় দুইটি কাহিনী আছে: একটি জীবানন্দ-ষোড়শীর আর একটি নির্মল-হৈমবতীর। শেষের কাহিনীটি গৌণ এবং মুখ্য কাহিনীর প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ইহার অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে একাধিক কাহিনী একত্রিত হইয়াছে। উপন্যাস বা নাটকে একাধিক কাহিনী একত্রিত করিলে আখ্যায়িকায় নানা জটিলতা আসিয়া পড়ে। সমালোচককে দেখিতে হইবে এই সব কাহিনীতে ঐক্য বজায় রাখা হইয়াছে কিনা। একাধিক কাহিনীর অবতারণা করিলে আখ্যায়িকা বিস্তৃতি লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করিতে না পারিলে তাহা কতকগুলি আখ্যায়িকার সমষ্টি মাত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই বিচ্ছিন্ন আখ্যায়িকার পরিণতিতে পাঠক আগ্রহ বোধ করিতে পারে না। 'চরিত্রহীন', 'বামুনের মেয়ে' ও 'শেষ প্রশ্ন'—এই তিনটি উপন্যাসের প্রত্যেকটিতে শরৎচন্দ্র দুইটি করিয়া কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। অরুণ ও সন্ধ্যার প্রণয় ও বিবাহের প্রস্তাব 'বামুনের মেয়ে'র প্রধান কাহিনী। জ্ঞানদার বেদনাময় আখ্যায়িকা আয়তনে ছোট, কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণাবয়ব কাহিনী। ইহার সঙ্গে অরুণ ও সন্ধ্যার বিবাহ-প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নাই। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে শিবনাথ ও কমলের বিবাহের পরে এবং অনতিকাল পরেই অজিত ও মনোরমার বিবাহ-প্রস্তাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাস অগ্রসর হইতে না হইতে দেখি শৈব বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শিবনাথ আসক্ত হইয়াছে মনোরমার প্রতি এবং অজিত কমলকে পাইতে লুব্ধ হইয়াছে। পরে দুইটি আখ্যান যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে: একটি কমল ও অজিতের কাহিনী আর একটি শিবনাথ ও মনোরমার কাহিনী। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে এই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা আরও বেশী স্পষ্ট। প্রথমতঃ, দেখিতে পাই সতীশ ও সাবিত্রীর আখ্যায়িকায় উপেন্দ্রের স্থান নাই। তারপর, উপন্যাসের প্রধান দুইটি নারীচরিত্র কিরণময়ী ও সাবিত্রী একেবারে নিঃসম্পর্কিত। উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে যে দুইভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র কোথায়?

শরৎচন্দ্র বিভিন্ন কাহিনীকে একত্রিত করিয়া অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয়

দিয়াছেন। তিনি দুইটি কাহিনীকে একত্র করিবার জন্য কোনরূপ জবরদস্তি করেন নাই ; কাহিনীগুলি আপনাদের সহজ স্বাধীন পথ বাহিয়া চলিয়াছে, মনে হয় অলক্ষিতে আপনা হইতেই তাহাদের মধ্যে ঐক্য আসিয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অ-কৃত্রিম, অনায়াসলব্ধ ; ইহার মূল রহিযাছে ঘটনার সন্নিবেশে নহে, দুই একটি চরিত্রেব সহজ বিস্তৃতিতে। ‘বামুনের মেয়ে’র প্রধান বিষয় অরুণ ও সন্ধ্যার বিবাহের প্রস্তাব নহে, প্রিয়নাথ ডাক্তাবের চরিত্র। এই উন্নতচেতা, স্বল্পবুদ্ধি ডাক্তার সমস্ত গ্রন্থকে জুড়িয়া বসিয়াছেন এবং ইহার বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে ঐক্য আনিয়াছেন। সন্ধ্যার তিনি পিতা, তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতা ও মহত্ত্ব কোথায তাহা সন্ধ্যা জানে, আবার জ্ঞানদাকে তিনিই রক্ষা করিয়াছেন। সন্ধ্যার ট্র্যাজেডিব সঙ্গে জ্ঞানদাব ট্র্যাজেডির সম্পর্ক নাই, কিন্তু উপন্যাসেব শেষে উভয়ে মিলিত হইয়াছে, কারণ উভযেই প্রিযনাথের সঙ্গী। ‘শেষ প্রশ্ন’ উপন্যাসে এই ঐক্য আসিয়াছে কমল ও আশুবাবুব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইতে প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে কমলের চবিত্রের দুইটি দিক্ আছে, একটি অভিব্যক্তি পাইয়াছে শিবনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদে আব একটি প্রকাশিত হইয়াছে অজিতের সঙ্গে মিলনে। আশুবাবুব সহজ ঔদায আলোক ও বাতাসের মত উপন্যাসের উপর ব্যাপ্ত হইয়াছে, কেহ তাহার প্রভাব হইতে দূরে যাইতে পাবে নাই, তিনি সবাইকে চেনেন, সকলের অন্তবে তিনি প্রবেশ কবিয়াছেন। উপন্যাসের আখ্যায়িকায় তাঁহার কিছু করিবার নাই, কিন্তু মনে হয় তিনি তাঁহার বিরাট দেহ ও ততোধিক বিরাট হৃদয় লইযা উপস্থিত না থাকিলে সকল ব্যাপারই ফিকে হইয়া যায।

‘চরিত্রহীন’ উপন্যাসের কাহিনী ‘শেষ প্রশ্ন’ ও ‘বামুনেব মেয়ে’র কাহিনী হইতে অনেক বেশী জটিল, ইহাব ঘটনাবলী অনেক বেশী বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন। সতীশ যখন সাঁওতাল পরগণায় আশ্রয লইয়াছে তখন পাঠকও কিছুক্ষণের জন্য উপেন্দ্র, সাবিত্রী, কিরণময়ী প্রভৃতিকে ভুলিতে বাধ্য হয়। দিবাকর ও কিরণময়ীর পলায়ন ও প্রবাসের চিত্র আঁকিবার সময গ্রন্থকার অন্য সকল চরিত্রের জীবনযাত্রার উপর পর্দা টানিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আখ্যানের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও এই উপন্যাসে ঐক্যের অভাব হয় নাই। এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্রহীন সতীশ, কিন্তু প্লটের কেন্দ্রস্থ চরিত্র হইতেছেন চরিত্রবান্ উপেন্দ্র। তাঁহার সঙ্গে সকলেবই সম্পর্ক আছে, এবং তাঁহার চবিত্রের পরিবর্তনকে উপন্যাসেব কেন্দ্র বলিয়া ধরিলে ইহার যোগসূত্রকে পাওয়া সহজ হইবে। প্রথম দিকে দেখি সাবিত্রীব সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নাই, এমন কি

সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের সংশ্রবের কথা উল্লেখ করিয়া রাখালবাবু যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহা তিনি অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মনে কখনও সন্দেহ হয় নাই যে এইরূপ নীচ সংশ্রবে তাঁহার সোদরপ্রতিম সতীশ আসিতে পারে। সাবিত্রী সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধতা চরমে পৌঁছিল (চরিত্রহীন—২০) সেই দিন যেদিন কথামাত্র না বলিয়া তিনি সুরবালাকে লইয়া সতীশের বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। উপন্যাসের প্রথমার্ধ এইখানে সমাপ্ত হইল। দ্বিতীয়ার্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ—তাহার পরিসমাপ্তিতে তিনি অনুতপ্তচিত্তে সাবিত্রীকে বলিতেছেন, "সেই রাত্রে তুই যদি, দিদি, আত্মপ্রকাশ ক'রে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতিস্ আমার শেষ জীবনটা হয়ত এত দুঃখে কাটতোনা।" এবং এই সাবিত্রীর হাতেই তাহার অসমাপ্ত কর্তব্যের ভার দিয়া তিনি সংসার হইতে বিদায় লইলেন। উপন্যাসের নায়িকাদ্বয়—সাবিত্রী ও কিরণময়ী—পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু ইহাদের মাঝখানে রহিয়াছেন উপেন্দ্র। কাহিনীর প্রারম্ভে দেখি তিনি কিরণময়ীর পরমাত্মীয়, কিন্তু সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁহার কোন সংশ্রব নাই। উপসংহারে দেখি যে সাবিত্রী তাঁহার অতি নিকটে আসিয়াছে, কিন্তু কিরণময়ী সরিয়া গিয়াছে অনেক দূরে। এই অসম্ভব পরিবর্তনই এই বিরাট উপন্যাসের প্লট, এবং উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় এই দুই পরমাশ্চর্য রমণী একত্রিত হইয়া কাহিনীর ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

উপরে যে তিনটি উপন্যাসের আলোচনা করা হইল তাহাদের গল্পে দুইটি আখ্যায়িকা মিশিয়া গিয়াছে। 'পল্লীসমাজ' ও 'শ্রীকান্ত'—এই দুই উপন্যাসের কাহিনীও খুব জটিল ও বিস্তৃত। এই দুই উপন্যাসে বহু নরনারী একত্রিত হইয়াছে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কোথাও নিবিড় নহে, এবং অনেক জায়গায় কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই মনে হয়। এই বিচ্ছিন্নতা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেই বেশী প্রকট, এই গ্রন্থ ভ্রমণকাহিনী হিসাবে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে উল্লিখিত উপন্যাস দুইখানির মধ্যেও প্লটের অল্পাধিক ঐক্য আছে, এবং শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য যতই থাকুক তাহার বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি একেবারেই অসংলগ্ন নহে। 'পল্লীসমাজ' এ রমা ও রমেশের প্রণয় ও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর অপরূপ কাহিনী অন্য সকল ঘটনাকে একত্রিত করিয়াছে। বেণী, গোবিন্দ, ভৈরব—সমাজের এই সকল ক্রুর অথবা দুর্বল-চরিত্র লোকের চিত্র খুব সজীব হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকার ইহাও দেখাইয়াছেন যে ইহারা

(এমন কি বেণী পর্যন্ত) উপন্যাসে নিজেদের দাবীতে আসিতে পারে নাই। রমা ও রমেশের মধ্যে যে দুরধিগম্য ও জটিল সম্পর্ক রহিয়াছে ইহারা তাহাকে আরও জটিল করিয়াছে; উপন্যাসে ইহাই তাহাদের দান ও দাবী। বিশ্বেশ্বরী আদর্শ-লোকবাসিনী, উপন্যাসে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব হইয়া উঠেন নাই, কিন্তু তবু তিনি সেইখানেই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত হইয়াছেন যেখানে তিনি রমা-রমেশের সম্পর্ক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। রমেশের জীবনের একটা দিক্ আছে যাহার সঙ্গে রমার সংস্রব কম। ইহা তাহার পল্লী-সংস্কার চেষ্টা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কাহিনীর সঙ্গে ইহার যোগসূত্র খুব স্পষ্ট ও সহজ না হওয়ায় রমেশের জীবনের এই দিক্‌টা খুব প্রত্যক্ষ ও সত্য হইতে পারে নাই।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কাহিনী অসাধারণ বৈচিত্র্যমণ্ডিত, এবং অগণিত নরনারী ইহাতে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা নিজেদের প্রয়োজনে আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে; কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই। বর্তমান কালে দীর্ঘ উপন্যাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। রোমা রল্যাঁর John Christopher, টমাস্ ম্যানের Buddenbrooks, The Magic Mountain ও রেমণ্টের Peasants প্রভৃতির কথা সকলেরই মনে আসিবে। শুধু পরিধির বিশালতা দিয়া বিচার করিতে গেলেও 'শ্রীকান্ত'র তুলনা বিরল। অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বা কোন একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই। শুধু যে ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদিই তাহাদের জীবনের পরিসমাপ্তির সন্ধান দিয়া যায় নাই তাহাই নহে; অন্যান্য ক্ষুদ্রতর চরিত্রগুলিও এই সংযমের পরিচয় দিয়াছে। গৌরী তেওয়ারীর মেয়ে পিত্রালয় যাইতে পারিয়াছিল কিনা, 'নতুনদা' ডেপুটি হইয়াছেন কিনা, যে ব্রহ্মরমণী নিষ্ঠুর বাঙালী যুবকের দ্বারা প্রতারিত হইল সে কেমন করিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যবহারকে গ্রহণ করিবে, বিগত যৌবনের ন্যায় নন্দ মিস্ত্রীও টগরের নিকট হইতে খসিয়া পড়িল কিনা—এই সব কথা গ্রন্থকার নিঃশেষে বলিতে চাহেন নাই।

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়ের ইতিহাস প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে, এবং অন্যান্য খণ্ড আখ্যান এই কাহিনীকেই পরিপুষ্ট করিয়াছে। অন্নদাদিদি ও অভয়াকে রাজলক্ষ্মী দেখে নাই, কিন্তু তাহাদের কাহিনীর সঙ্গে সে নিজের সমস্যার সম্পর্ক দেখিতে পাইয়াছে। তাহার মনে মন্ত্রপড়া স্বামীর প্রতি যে ভক্তি ছিল অন্নদাদিদির কাহিনী তাহাকে প্রবলতর

করিয়াছে, অভয়া বিদ্রোহের তারে আঘাত করিয়াছে, সুনন্দা দিয়াছে ধর্মনিষ্ঠার আগ্রহ, আবার শিবুপণ্ডিতের মন্ত্র শুনিয়া রাজলক্ষ্মীর মনে মন্ত্রের সজীবতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছে। শ্রীমান্ বঙ্কু রাজলক্ষ্মীর অপরিতৃপ্ত মাতৃত্বের আহার জোগাইয়াছে, কিন্তু যেই দেখা গেল এই মিথ্যা মাতৃত্বের ছেলেভুলানো খেলায় রাজলক্ষ্মীর চলে না অমনি বঙ্কু গৌণ হইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় প্রত্যেক কাহিনীর সঙ্গে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর আখ্যায়িকার সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের চতুর্থ পর্ব খুব নীরস, তাহার প্রধান কারণ এই যে মূল গল্পের সহিত ক্ষুদ্র আখ্যানগুলির সম্পর্ক সহজ নহে। পুঁটুকে লইয়া যে কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অসংলগ্ন নহে, কারণ একবার বঙ্কু যাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল তাহারা মিলিত হইয়াছিল শ্রীকান্তের বিবাহের প্রস্তাবেই (শ্রীকান্ত—দ্বিতীয় পর্ব, ১), আবার সুনন্দা ও গুরুদেব যে আড়াল রচনা করিয়াছিল তাহা অপসারিত হইল পুঁটুর অভ্যাগমে, এই আখ্যায়িকা অসংলগ্ন না হইলেও ইহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। কমললতার আখ্যায়িকার সঙ্গে মূল গল্পের সংযোগ খুবই কৃত্রিম। কমলের বিরুদ্ধে রাজলক্ষ্মীর মনে কোন প্রকৃত ঈর্ষা নাই, কারণ রাজলক্ষ্মী মন্ত্রভীত, সুতরাং সে জানে যে মন্ত্রপড়া স্বামী শ্রীকান্তকে তাহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে। শ্রীকান্ত অন্য রমণীতে আসক্ত হইবে, এইরূপ সন্দেহ রাজলক্ষ্মীর মনে কখনও স্থায়ী ভাবে আসিতে পারে না, তাহা হইলে তাহাদের প্রণয়ের দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাস মিথ্যা হইয়া যাইত। প্রকৃতপক্ষেও দেখা যায় যে রাজলক্ষ্মী ও কমলের মধ্যে সহজেই ভাব হইল, এবং সঙ্গীত বিষয়ে যে প্রতিযোগিতার আভাস আছে তাহার মধ্যে রাজলক্ষ্মীকে পাই না, যে পিয়ারী নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছিল সেই যেন আবার জাগিয়া উঠিয়াছে—কাহিনীর উপসংহারে এই পুনরুজ্জীবন অনুপযোগী ও আকর্ষণহীন হইয়াছে। কমললতার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর কোন সত্য সম্বন্ধ নাই, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া সে নিজের সমস্যা সম্পর্কে কোন নূতন আলোকের সন্ধান পায় নাই। কাজেই এই আখ্যায়িকা অপ্রাসঙ্গিক।

প্রথম তিন পর্বে বর্ণিত প্রায় প্রত্যেক আখ্যানের সঙ্গে মূল গল্পের সংস্রব আছে, কিন্তু এমন দুই একটি কাহিনী বা ঘটনা আছে যাহাদের সঙ্গে শ্রীকান্তের যোগ থাকিলেও রাজলক্ষ্মীর কোন সংস্রব নাই। শুধু প্লটের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাদের সার্থকতা কোথায় এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইবে। শ্রীকান্ত কর্মবীর মহামানব নহে। রাজলক্ষ্মী অপেক্ষা সে দুর্বল, রাজলক্ষ্মী তাহাকে

টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে বাধা দিতে পারে নাই, বাজলক্ষ্মীকে সে নিজের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীকান্ত-বাজলক্ষ্মীর কাহিনী যে ভাবে চলিয়াছে তাহার মধ্যে শ্রীকান্তেব দান আছে। শ্রীকান্ত কোনদিন জোর খাটায় নাই, তথাপি সে নিঃস্ব হইয়া ধরা দেয় নাই, তাহার দুবলতাব মধ্যেই তাহাব মহত্ত্বের বীজ নিহিত বহিয়াছে। শ্রীকান্তকে যে বাজলক্ষ্মী পাইয়াছিল তাহাব একটি প্রধান কাবণ শ্রীকান্তেব চবিত্রেব প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততা। এই প্রশস্ততা আসিয়াছিল তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে। সুতবাং এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাব সঙ্গে মূল আখ্যায়িকাব পরোক্ষ সংযোগ রহিয়াছে। সংসাবেব বহুবিধ চিত্র দেখিয়া সে খাঁটি ও মেকিব মধ্যে পার্থক্য কবিতে শিখিয়াছিল এবং এই বিস্তীর্ণ দৃষ্টিই তাহাব মনে সাংসাবিক লাভালাভ সম্পর্কে ঔদাসীন্যও আনিয়া দিয়াছিল। বাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে চিনিত, তাই সে বলিয়াছিল, "ওর (সুনন্দার) ছেলেকে এই আশীর্বাদ কবে যাও যেন বড হয়ে ও তোমাব মত মন পায় · তাব চেযে বড় ত আমি কিছুই জানি না।"

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেব প্রথম তিন পর্ব আলোচনা কবিলে দেখা যাইবে যে ধীবে ধীবে (স্রষ্টাব অলক্ষিতে) ইহাব রচনারীতিব পবিবর্তন হইয়াছে। এই কাবণে যাঁহাবা প্রথম পর্ব পডিয়া বিস্মিত, বিমুগ্ধ হইযাছিলেন, তাঁহাবা তৃতীয পর্বেব বচনাচাতুর্য স্বীকাব কবিলেও তাহাকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিযা মনে কবেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই পর্ব বিভিন্ন শ্রেণীব বচনা। প্রথম পর্ব বচিত হইয়াছিল ভ্রমণকাহিনী হিসাবে, তৃতীয পর্ব উপন্যাস। প্রথম পর্বে পিযাবীর উপাখ্যান বহু কাহিনীব একটি মাত্র, কিন্তু তৃতীয পর্বে ভ্রমণ-কাহিনীব কথা প্রাবম্ভে উল্লিখিত হইলেও, ইহা বিশেষভাবে শ্রীকান্ত বাজলক্ষ্মীর প্রণয়ের ইতিহাস। প্রথম পর্বে গেরুয়া পবা শ্রীকান্ত অসুস্থ হইযা বাজলক্ষ্মীকে যে সংবাদ পাঠাইযাছিল সে যেন নিতান্ত খেয়ালেব বশে। কিন্তু তৃতীয় পবে দেখি শ্রীকান্ত যেখানেই যাক্ তাহাকে বাজলক্ষ্মীর উপগ্রহ হইয়া যাইতে হইবে। প্রথম পব ও দ্বিতীয় পবেব প্রথমার্ধ ভ্রমণকাহিনী। ইহা অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে, কত লোক আসিতেছে ও যাইতেছে, কেহ স্থিব হইয়া বসিয়া নাই, কেহই অবাস্তব নহে, আবাব কেহই অত্যাবশ্যকও নহে। তৃতীয পর্বে কাহিনীব সেই দ্রুতগতি নাই, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মন দেওযা-নেওয়া অতি ধীরে ধীবে চলিতেছে। এই মন্থবতা উপন্যাসেব গৌবব, কিন্তু ভ্রমণবৃত্তান্তে অনুপযোগী। তৃতীয পর্বেও ঘটনাবাহুল্য আছে, কিন্তু অবাস্তব কাহিনীগুলিব

সেই নিজস্ব মাধুর্য নাই। বজ্রানন্দ, সুনন্দা, এমনকি সতীশ ভরদ্বাজ ও চক্রবর্তী-গৃহিণী—ইহারা উপন্যাসে জায়গা পাইয়াছে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়ের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য। ইহাদের নিজেদের জীবনে যে তাৎপর্যই থাকুক না কেন, এখানে তাহা একেবারে গৌণ। এই সকল কাহিনী শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিলেও এখানে প্রথম পর্বে বর্ণিত কাহিনীর সরসতা নাই। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মনের যে বিশ্লেষণ এখানে দেওয়া হইয়াছে তাহার গভীরতা ও সূক্ষ্মতা অনন্যসাধারণ, কিন্তু তাহার মধ্যে ভ্রমণ-কাহিনীর বৈচিত্র্য ও চলতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় পর্ব প্রথম পর্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, ইহা ভিন্ন জাতীয় রচনা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রচনারীতি

শরৎচন্দ্রের ষ্টাইল বা রচনারীতির মাধুর্য সর্বত্র উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছে। যাহারা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী বা ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না তাহারাও তাহার শব্দসম্পদ্ ও রচনাসৌষ্ঠবকে শিরোধার্য করেন। শরৎচন্দ্র রমণীহৃদয়ের গভীরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার গোপন কাহিনীকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার রচনায় ভাবাতিশয্য থাকা স্বাভাবিক। তাঁহার অপেক্ষাকৃত অপরিণত রচনায় উচ্ছ্বাসের বাহুল্য আছে, কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ রচনার মাধুর্য সংযমের মাধুর্য। মনে হয় হৃদয়ের রহস্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু নিজেকে রিক্ত করে নাই। শরৎচন্দ্রের নীতি সম্ভোগ-বিরোধীর নীতি, তাঁহার ভাষা সংযত, শান্ত। তাহার শ্রেষ্ঠ রচনায় বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে, অপরূপ ইঙ্গিত আছে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে গভীর সহানুভূতি আছে, কিন্তু যে উচ্ছ্বাস আপনার আতিশয্যেই আপনাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে তাহার পরিচয় নাই।

'দেবদাস' শরৎপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে। ইহার মধ্যে ভাবপ্রবণতার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও শরৎপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই পার্বতী রাত্রি একটার সময় দেবদাসের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, কুমারী তাহার সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া প্রণয়াস্পদকে

নিজের মনের কথা বলিতে আসিয়াছে। তাহার ব্যবহারে উচ্ছ্বাস, আতিশয্য ও নির্লজ্জতাই প্রত্যাশা করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার সর্বাপেক্ষা বেদনাময় উক্তিতে রহিয়াছে অপরিসীম সংযম ও অতলস্পর্শী গভীরতা। দেবদাস তাহাকে প্রশ্ন করিল, "কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না?" পার্বতী অসঙ্কোচে উত্তর দিল, "মাথা কাটাই যেতো—যদি না আমি নিশ্চয় জানতুম, আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।" একটু পরেই যখন নৈরাশ্যের সম্ভাবনা স্পষ্ট হইল তখন সে কহিল, "দেবদা', নদীতে কত জল? (অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?" পার্বতী আবেগে আত্মহারা হইযাছে, কিন্তু সেই আবেগকে সে প্রকাশ করিয়াছে ধীর, স্থির, সংযতভাবে।)

'বিরাজবৌ' আর একখানি পরিণত উপন্যাস এবং ইহাতে লঘু উচ্ছ্বাসের অবধি নাই। কিন্তু এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে অনন্যসাধারণ বাক্‌সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাজ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে, নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে, নীলাম্বর দুঃখে অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছে, তাহাকে সর্বাপেক্ষা পীড়া দিয়াছে পুঁটির অভিযোগ। কিন্তু তাহার আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে শান্ত, অনাড়ম্বর ভাষায়—"না আর বোলনা—সে তোর গুরুজন।—শুধু সম্পর্কে নয় পুঁটি, তোকে মাযের মত মানুষ ক'রে তোর মায়ের মতই হয়েছে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু তোর মুখে ও কথায় গভীর অপরাধ হয়।" তারপর বিরাজের প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু! তাহার শেষ মুহূর্তে পুঁটি ও মোহিনী শোকে দিশাহারা, কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগী মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্বিকার। পুঁটির কান্না উদ্বেল হইয়া উঠিলে, সে বলিযা উঠিল, "চুপ কর পোড়ামুখি, চেঁচাস্‌নে।" এই সস্নেহ তিরস্কার, এই পুরানো সম্ভাষণ, এই কৃত্রিম ক্রোধ—ইহার মধ্য দিয়া বিরাজের অতীত জীবন ছায়াবাজির মত খেলিয়া গেল—যে অতীতে দারিদ্র্য ছিল না, ভ্রাতৃবিরোধ ছিল না, রাজেন্দ্র ছিল না। এই কথা কযটি খুবই অকিঞ্চিৎকর কিন্তু অপরূপ ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনায় এই সংযম আরও বেশী স্পষ্ট ও কলাকৌশলের পরিচায়ক। 'দত্তা'র নায়িকা বিজয়া মনের গোপন কথা প্রকাশ করিতে পারে না সঙ্কোচের বাধার জন্য; তাহার সঙ্কোচ গ্রন্থকারের স্বভাবসিদ্ধ সংযমের পরিচয় দেয। এই গ্রন্থখানির কল্পনা খুব গভীর বা ব্যাপক নহে, কিন্তু ইহার আর্ট খুব উচ্চাঙ্গের; বিজয়ার হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হইয়াছে নানা বাধার মধ্য দিয়া; তাই ইহার অভিব্যক্তি হইয়াছে অতিশয় মনোহর। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। কখনও কখনও তাহার

হৃদয়ের প্রবৃত্তি দুর্বশ হইয়াছে, কিন্তু তখনও লেখক সংযমের সীমা অতিক্রম করেন নাই। কখনও বিশ্বপ্রকৃতির নির্বাক সাক্ষ্যের প্রতি সঙ্কেত করিয়া থামিয়া গিয়াছেন, কখনও রাজলক্ষ্মীর গভীরতম প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করিয়াছেন অতি তুচ্ছ কাজের মধ্য দিয়া, আর যখন শুধু কথার দ্বারাই তাহার উদ্বেল হৃদয়ের রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে তখনও সেই অভিব্যক্তি লঘু উচ্ছ্বাসের ফেনিলতা হইতে অনেক ঊর্ধ্বে রহিয়াছে। তখনও প্রত্যেকটি কথা রাজলক্ষ্মী বহু চিন্তা করিয়া কহিয়াছে, ইহা সর্বদাই মনে হইয়াছে যে কথার অন্তরালে অনেক কিছুই রহিয়া গেল যাহা কথা হইতে অনেক বড়। অগ্রদানী চক্রবর্তীর বাড়ী হইতে শ্রীকান্ত ফিরিয়া আসার পর রাত্রিতে তাহার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর যে আলাপ হইয়াছিল ও পুঁটির সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবের সংবাদ পাইয়া শ্রীকান্তকে সে যে চিঠি লিখিয়াছিল—ইহাই রাজলক্ষ্মীর প্রকাশচঞ্চলতার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। কিন্তু গঙ্গামাটিতে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের কাছে তাহার মনের কথা যেভাবে খুলিয়া বলিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই সে শুধু প্রবল অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে না। শ্রীকান্তের উদ্দেশ্যহীন কর্মহীন জীবনের দীনতা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সজাগ, নিজেকে সে কঠিনভাবে চুলচেরা বিচার করিয়া দেখিতে চায়, অনুভূতিগুলিকে সে বুদ্ধি দিয়া আয়ত্ত করিতে চায় এবং যখন দুর্বশ হৃদয়াবেগকে সে আর গোপন রাখিতে পারে না, তখন তাহা প্রকাশিত হয় শান্ত সংযত ভাষায়, "তীর্থযাত্রা করেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখতে পাইনি, তার বদলে কেবল তোমার লক্ষ্যহারা বিরস মুখই দিন রাত্রি চোখে পড়েছে। আমার জন্যে তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু আর না। ভেবেছিলাম তোমার জন্যই একথা তোমাকে জানাবো না, কিন্তু আজ আর আমি থাকতে পারলাম না।" রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে যে চিঠি লিখিয়াছে তাহার মধ্যে অলঙ্কার-বাহুল্য আছে, কিন্তু উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নাই, মনে হয় কল্পনার ঐশ্বর্য ও ভাষার অলঙ্কার রাজলক্ষ্মীর হৃদয়কে গৌরব দান করিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে 'চরিত্রহীন' চিন্তার দৃঢ়তায় ও কল্পনার সাহসিকতায় অনন্যসাধারণ, কিন্তু রচনাসৌষ্ঠবে ইহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, কারণ ইহার মধ্যে ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও সংযম নাই। সতীশ, কিরণময়ী, শেষের দিকে উপেন্দ্র, এমন কি সাবিত্রীও অধিকাংশ সময়েই সরল, সহজ, সংযতভাবে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করিতে পারে না। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের শিল্প-কৌশল অনবদ্য। সুরেশ দুর্দমনীয় প্রকৃতির লোক, কিন্তু অচলা ও মহিম শান্ত সংযত। অচলা নানা অবস্থাবিপর্যয়ে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের বিচিত্র

ভাবের বহিঃপ্রকাশে কোথাও সীমা অতিক্রম করা হয় নাই, কোথাও কলাসংযমের বাঁধন নষ্ট হয় নাই। সুরেশ ও কেদারবাবু যখন মহিমের আচরণের গোপনতা লইয়া বকিয়া মরিতেছিল, তখন অচলা একটি কথাও বলে নাই, কিন্তু পরে দেখা গেল যে মহিমের দেশ ও পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে, এমন কি সুরেশের সহিত তাহার সম্বন্ধের সকল কথাই এই স্বল্পবাক্ রমণী জানে। সুরেশকে ভাবী জামাতার পদে বরণ করিয়া কেদারবাবুর স্ফূর্তির অবধি ছিল না, সুরেশও অচলার হৃদয় জয় করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। অচলা সুরেশকে তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে, কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল সুরেশ ও কেদারবাবুর আনন্দোৎসবের মধ্যে তরুণী শুধু মহিমের প্রতীক্ষায় একটি একটি করিয়া দিন গণিতেছে। মহিমের হাতে আংটি পরাইতে যাইয়া সে একটু অতিনাটকীয় ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু তাহার এই আচরণ অসহায় রমণীর একমাত্র সম্বল, এবং সে শুধু আংটিই পরাইয়া দিয়াছে, বাক্‌বাহুল্যের দ্বারা নিজেকে লঘু করে নাই। সুরেশের প্রতি তাহার যে অনুরক্তি ছিল তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে অলক্ষিতে, ক্ষুদ্র কথা বা তুচ্ছ ব্যবহারে, কণ্ঠস্বরের অপ্রত্যাশিত স্নিগ্ধতায়, গাড়ীতে বসিবার ভঙ্গীতে অথবা কাতর অনুনয়ে বা জিজ্ঞাসায়। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প 'মহেশ'এ রচনাসংযমের প্রকৃষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। এই গল্পের ট্র্যাজেডি প্রকাশ পাইয়াছে মহেশের নির্বাক বেদনা ও গফুরের নীরব সহনশীলতার মধ্য দিয়া, মহেশের মৃত্যুর পর গফুর তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহার অভিশাপের জ্বালা কথার বাহুল্যে নষ্ট হইয়া যায় নাই।

শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায় রমণীর রূপ বর্ণনায়। তাঁহার উপন্যাসের অধিকাংশ নায়িকা রূপসী। কিন্তু তিনি তাহাদের রূপের বর্ণনাকে দীর্ঘ করেন নাই। প্রথমতঃ দুই একটি কথায় তাহাদের রূপের সহজ, সরল বর্ণনা দিয়াছেন, পরে নানা অবস্থায় নানা লোকের উপর সেই রূপের প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অন্নদাদিদিকে বর্ণনা করিয়াছেন দুইটি বাক্যে: "যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তর ব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।" পিয়ারী বাইজীর প্রথম বর্ণনা আরও সংক্ষিপ্ত। "বাইজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।" তারপর ধীরে ধীরে তাহার রূপের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত নির্মল হাস্যে তাহার কানের দুল পর্যন্ত উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, তাহার মেঘের মত কালো চুলে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা ছড়াইয়া পড়িয়া অপূর্ব শোভার

সঞ্চার করে, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডের উপর ঝরা-অশ্রুর ধারা শুকাইয়া ফুলের মত ফুটিয়া থাকে।

অনেক সময় শরৎচন্দ্র রমণীর রূপ সোজাসুজি বর্ণনা না করিয়া অপরের উপর তাহার প্রভাব দেখাইয়া তাহার মাধুর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিজয়া সুন্দরী, তাহার সৌন্দর্য এমন চিত্তাকর্ষক যে নরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, যে ছবি আঁকতে জানে, তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে।" ইহা চাটুবাক্য নহে, সৌন্দর্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র। কিরণময়ীর রূপ হেলেনের রূপের মত—ইহা মুগ্ধও করে আবার ধ্বংসের ইন্ধনও জোগায়। শরৎচন্দ্র হোমারকে অনুসরণ করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু কিরণের রূপের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত—নাই বলিলেই চলে। শুধু যে কেহ তাহাকে দেখে সেই অন্ততঃ ক্ষণেকের তরে বিভ্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারে না, এবং হারানবাবু যে কিরূপ নিষ্ঠাবান্ ছাত্র ছিলেন, ইহা আমরা তখনই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যখন মনে করি এই স্ত্রীর সঙ্গে তিনি গুরুশিষ্যার সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনরূপ সম্পর্ক কল্পনা করিতে পারিলেন না। অচলা অসামান্যা সুন্দরী নহে, কিন্তু অপরাহ্নে রক্তিম রশ্মি পশ্চিমের জানালা দরজা দিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িলে এই তরুণীর ঈষদ্দীর্ঘ কৃশ দেহ সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সুরেশকে মুগ্ধ করিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে একটি রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। সাধারণতঃ নায়কনায়িকার (বিশেষতঃ নায়িকার) একটি পূর্ব ইতিহাস থাকে যাহার সঙ্গে উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী অসম্পৃক্ত নহে। সেই পূর্ব কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়া পাঠকের ধৈর্য পরীক্ষা করা হয় নাই। পিয়ারী বাইজীর মধ্যে রাজলক্ষ্মী কেমন করিয়া সঙ্গোপনে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, ঠিক কি অবস্থায় জীবানন্দের 'বাহন' অলকার বিবাহ হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া ভৈরবীর মধ্যে প্রবঞ্চিতা অলকা সুপ্ত ছিল, মেসে ঝি হইবার পূর্বে সাবিত্রী কি করিয়াছিল—এই সব কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়া শরৎচন্দ্র তাহার উপন্যাস ভারাক্রান্ত করেন নাই, উপন্যাসের মধ্যে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে এবং সেই কৌতূহলকে তিনি আভাসে ইঙ্গিতে, দুই একটি সংক্ষিপ্ত কথোপ-কথনের সাহায্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করেন নাই। নায়িকার জীবনের পূর্ব ইতিহাস রহস্যময়ই রহিয়া গিয়াছে, আমরা তাহার গোপন মহিমা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না। 'শ্রীকান্ত'র চতুর্থ পর্বে শরৎচন্দ্রের শিল্পের এই সংক্ষিপ্ততা ও সংযম নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। সেইখানে দেখি কমললতার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার বিগত জীবনের কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছে এবং দেখিতে পাই রাজলক্ষ্মী শুধু সুশ্রী সুকণ্ঠ বাইজী নহে, একজন পাকা বিজিনেস্ ওয়্যমান্। শ্রীকান্তের এই কাহিনী শুনিতে আগ্রহ ছিল না এবং আমাদের মনেও ইহা শুধু কৌতুকেরই সৃষ্টি করে।

শরৎচন্দ্রের রচনারীতির একটি প্রধান গুণ বাস্তবাপ্রবতা। শরৎচন্দ্রের অনুভূতির সঙ্গে রোমান্টিক কবির অনুভূতির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত বর্ণনা, তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ, অণুপরমাণুব্যাপী পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁহাকে রিয়ালিষ্ট বা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকপদবাচ্য করিয়াছে। তাঁহার ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে। বাঙলার প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' চলতি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উপন্যাস ব্যঙ্গচিত্রে ভরা, ইহার পক্ষে সাধুভাষা অনুপযোগী হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল; তাহাতে অনাবশ্যক গাম্ভীর্য নাই, কিন্তু তাহাও সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙলা। তাহা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্রের পক্ষে উপযোগী নহে। এই ভাষায় ভ্রমর, সূর্যমুখী প্রভৃতি আদর্শলোকবাসিনী রমণীব চরিত্র অভিব্যক্ত হইতে পাবে, কিন্তু সাধারণ জীবনেব কাহিনী এই ভাষায় রূপান্তরিত হইলে তাহাব সাধারণত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষাকে সমর্থন করিযাছেন, কিন্তু তাঁহার গদ্য কবির গদ্য; সুতরাং তাঁহার ভাষা উপন্যাসে তখনই খুব সুষ্ঠু হইয়াছে যখন বর্ণনা কল্পনায় অনুরঞ্জিত হইয়াছে অথবা কথোপকথন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের গদ্যে প্রচলিত ভাষা প্রথম তাহার ন্যায্য আসন পাইয়াছে অথচ তাহার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র অতিক্রম করে নাই। তাঁহার ভাষা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভাষা, বর্ণবহুলতার জন্য তাহার চিত্র কোথাও তাহার সহজ মাধুর্য হারায় নাই। ভাষা ভাবপ্রকাশের বাহন বটে, কিন্তু অনেক সময় ইহা মুখ্য হইয়া ভাবপ্রকাশের বাধা হইয়া দাঁড়ায়। শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ অলঙ্কার-বাহুল্যের দ্বারা তাঁহার বর্ণনাকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। মনে হয় যে ঘটনাটা যে ভাবে ঘটিয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই তাহা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে রূপান্তরিত হইযাছে; ভাষার ঐশ্বয কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ শরৎচন্দ্রের ভাষা স্বচ্ছ, আড়ম্বরহীন, প্রাত্যহিক জীবনের রসে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রচলিত ভাষার সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা থাকিলেও তাহার লঘুতা ও তুচ্ছতা নাই। শরৎচন্দ্র অনুভব করিয়াছেন যে প্রত্যেকের জীবনে এমন কতকগুলি মুহূর্ত আসে যাহা অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্যময় এবং

তাহাদিগের বর্ণনায় তিনি সংস্কৃতশব্দবহুল, অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিয়া তাহার বাস্তবপ্রিয়তার গভীরতাই প্রমাণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, শরৎচন্দ্রের ষ্টাইলের প্রধান গুণ এই যে এখানে তথাকথিত "সাধুভাষা" ও "চলিত ভাষা"র সমন্বয় হইয়াছে। চলিত ভাষার স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এবং সাধুভাষার সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে শরৎচন্দ্রের রচনার বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই বাস্তবতার প্রধান উপাদান অতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই শরৎচন্দ্রের কলাকৌশল উপলব্ধি করা যাইবে। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "আমাদের সাহিত্যে নৌযাত্রাবর্ণনার অভাব নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে এই বিষয়ে অনেক কবিত্বপূর্ণ, সূক্ষ্ম অনুভূতিময় বিবরণ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। ইহার মধ্যে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু কবিত্ব ইহার সম্বন্ধে প্রধান কথা নহে। ইহার মধ্যে যে অকুণ্ঠিত বাস্তবতা, যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর পাওয়া যায় তাহা কবিত্বকে অতিক্রম করিয়া অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে।" শরৎচন্দ্রের বর্ণনা এত প্রত্যক্ষ ও বাস্তব হইয়াছে কারণ তিনি তিল তিল করিয়া এই অভিযানের চিত্র আঁকিয়াছেন; প্রথম নৌকা ছাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভোরে বাড়ী ফেরা পর্যন্ত নৈসর্গিক, কাল্পনিক যত প্রকারের অভিজ্ঞতা হইয়াছে কিছুই বাদ পড়ে নাই। কাজেই সমগ্র চিত্রটি একেবারে প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। ছিদাম বহুরূপীর কাহিনী, মেজদা'র অত্যাচার, নতুনদা'র পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, বর্মাযাত্রা—এই সকল বর্ণনা শরৎ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ইহাদের প্রত্যেকটিকেই সজীব ও বাস্তব করিয়াছে শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি। •

শরৎচন্দ্রের বাস্তবপ্রিয়তা চরমে পৌঁছিয়াছে 'অরক্ষণীয়া'তে; সেইখানে ইহা সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কারবর্জিত হইয়া তীব্র, কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানদা স্বল্পভাষী; তাহার অনুভূতির প্রকাশে শরৎচন্দ্র স্বভাবসিদ্ধ সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রতিবেশের বর্ণনা হইয়াছে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। দারিদ্র্য তাহাকে নিপীড়িত করিয়াছে, ম্যালেরিয়া তাহার স্বাস্থ্য হরণ করিয়াছে, স্বর্ণমঞ্জরী গঞ্জনা দিয়াছে, তাহার প্রণয়াস্পদ অতুল তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, জননীর স্নেহ ভয়ে, শোকে ও কুসংস্কারে বিষাক্ত হইয়াছে। "কিন্তু সর্বাপেক্ষা সহনাতীত অপমান আসিয়াছে জ্ঞানদার নিজের হাত হইতে—বিবাহের পণ্যশালায় নিজেকে বিকাইবার জন্য তাহার স্বহস্তরচিত ব্যর্থ সজ্জানুষ্ঠানই

তাহার চরম লাঞ্ছনা।” এই চরম লাঞ্ছনার বর্ণনায় শরৎচন্দ্র কোন একটি তুচ্ছ দিক্ বাদ দেন নাই, কোথাও ইহাকে হাল্‌কা হইতে দেন নাই। কেমন করিয়া এই অবাঞ্ছিত সম্বন্ধ মা ও মেয়ের কাছে আকাঙ্ক্ষণীয় হইল, কে কে পাত্রী দেখিতে আসিয়াছিল, জ্ঞানদা কি কি অদ্ভুত সজ্জা করিয়াছিল, কোলের ছেলে কি বলিল, পাশের মেয়েরা কেমন করিয়া হাসিল, স্বর্ণমঞ্জরী কি কঠোর মন্তব্য করিলেন, প্রতিবেশী কি প্রশ্ন করিল, অতুল কি ভাবিল—সকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আর এই হট্টগোলের মধ্যে একটি লোক নির্বাক—সে জ্ঞানদা নিজে!

'অনেক সময় দুই একটি তুচ্ছ বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করিয়া শরৎচন্দ্র চিত্রকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তব করিয়াছেন। যে বাঙালী যুবক ব্রহ্মরমণীকে প্রতারিত করিয়া তাহার টাকা ও আংটি লইয়া পলায়ন করিল, সে অতিশয় নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বড় ভাই আরও বেশী নীচাশয় ও হৃদয়হীন। এই লোকটির চরিত্রের সঙ্কীর্ণতা একটি কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি শ্রীকান্তকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, “……পুরুষবাচ্চা, বিদেশে বিভুঁয়ে এসে বয়সের দোষে না হয় একটা সখ করেই ফেলেছে……তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এম্‌নি ক'রেই বেড়াতে হবে? ভাল হয়ে সংসারধর্ম করে পাঁচজনের একজন হতে হবে না? মশাই, এ বা কি? কাঁচা বয়সে কত লোক যে হোটেলে ঢুকে মুর্গী পর্যন্ত খেয়ে আসে?……” এই তুলনার মধ্য দিয়া লোকটির নীচতা ও বিকৃত মনোবৃত্তির যে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেও এমন সহজ ও তীব্র হইত না।

'শরৎচন্দ্রের শব্দনির্বাচনে, উপমা ও রূপকের উদ্ভাবনে এই বাস্তবতার ছাপ রহিয়াছে। তিনি নরনারীর সম্পর্কের গোপন রহস্যকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; 'ইহার জন্য তিনি স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ অপ্রকাশ্য রহস্য ইহার দ্বারা অতি সহজে প্রত্যক্ষ হইতে পারে।' নরেন্দ্রনাথের জন্য বিজয়ার আকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণার মত জাগিয়া থাকে, বিগত যৌবনের মত নন্দমিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে টগরের নিকট হইতে খসিয়া যাইতে পারে, অভয়ার স্বামী যখন শ্রীকান্তের কাছে উপস্থিত হইল তখন তাহার মনে হইল যেন বর্মার কোন গভীর জঙ্গল হইতে এক বন্য মহিষ অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি বর্ণনাই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অতিশয় বাস্তব, কারণ অতিশয় প্রত্যক্ষ। বর্মা হইতে ফিরিয়া শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর মধ্যে একটু ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া পীড়িত হইল, কিন্তু বাসায় গিয়া তাহার ঘরের

সাজসজ্জা দেখিয়াই রাজলক্ষ্মীর সুগভীর প্রেমের পরিচয় পাইল; তাহার মনে হইল যেন, "ভাটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে।" এইরূপ দৃষ্টান্তের অবধি নাই। রূপক ও উপমার সাহায্যে নিগূঢ় রহস্যকে স্পষ্ট করিবার শক্তি চরমে পৌঁছিয়াছে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। তথায় প্রত্যেকটি চিত্রে সংক্ষিপ্ততা ও সুস্পষ্টতার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া মনে পড়িবে সুরেশের মৃত্যুর পর অচলার বর্ণনার কথা—ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ শুধু ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই,—একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।

শরৎচন্দ্রের রচনার বাস্তবতা সর্বজনবিদিত, কিন্তু বাস্তবপ্রিয়তার সঙ্গে যে কবিপ্রতিভা জড়িত আছে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে না। শ্রীকান্ত বলিয়াছে যে তাহার মধ্যে ভগবান্ কল্পনা কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। কিন্তু একথা সত্য নহে,—শ্রীকান্তের সম্বন্ধেও নয়, তাহার স্রষ্টার সম্বন্ধে তো নয়ই। বিশ্ব-প্রকৃতির মহিমার প্রতি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ রহিয়াছে, এই দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির মত বিরাট বিস্তার নাই, কিন্তু অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণতা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি মানবহৃদয়ের গভীরতম বেদনার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছেন এবং ইহাই বিশ্বপ্রকৃতিকে সজীব করিয়াছে। তমসাচ্ছন্ন রজনী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা ক্রন্দন দেখিয়া হয়ত বা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু চরম নৈরাশ্যভাবাক্রান্ত হৃদয়ে বিজয়া যখন দয়ালের বাড়ী হইতে বাহির হইল তখন প্রকৃতির মধ্যে সে তাহার নিজের হৃদয়ের প্রতিরূপই দেখিতে লাগিল। "তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার পদতলের তৃণরাশি হইতে আরম্ভ করিয়া, কাছে দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ, প্রান্তর, গ্রামান্তরের বনরেখা, নদী, জল সমস্তই যেন নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, পরিচয় নাই, কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গেছে—এখন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে।" আবার বিজয়ার সুখের দিনে বিবাহসভায় তাহার লজ্জিত মুখের উপর দক্ষিণের বাতাস এবং আকাশের জ্যোৎস্না যেন একই কালে তাহার স্বর্গগত মাতাপিতার আশীর্বাদের মত আসিয়া পড়িল। অচলার জীবনের ট্র্যাজেডির সঙ্গে অন্ধকার রাত্রির উন্মত্ত দুর্যোগের নিকট সম্বন্ধ আছে; গফুর যখন তাহার প্রার্থনা ও অভিশাপ জানাইয়া জন্মভূমি হইতে বিদায় লইল তখন

আকাশ বোধ হয় এই নির্যাতিত কৃষকের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেই নক্ষত্র-খচিত হইয়াও অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের গভীরতম ঐক্য দেখিতে পাই 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বে। রাজলক্ষ্মী কর্তৃক অবহেলিত হইয়া শ্রীকান্তের উদ্দেশ্যহীন কর্মহীন দিন আর কাটিতে চাহিত না। "অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাব্‌লা গাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন একটা বাঁশঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে মাঝে মাঝে ভুল হইত সে বুঝি আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে।" গঙ্গামাটির কারাবাসে বাহিরের বাতাসই একমাত্র বন্ধু, কারণ সে দূরের সংবাদ বহিয়া আনিয়াছে এবং মুক্তির আস্বাদ দিয়াছে। "মনে হয়, কত লোকের গায়ের স্পর্শ এবং কত না অচেনা লোকের তপ্ত শ্বাসের আমি যেন ভাগ পাই। হয়ত, আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু ইন্দ্রনাথ আজিও বাঁচিয়া আছে, এবং এই উষ্ণ বায়ু হয়ত তাহাকে এই মাত্র ছুঁইয়া আসিল।·········কখনও মনে হয়, এই কোণেই ত বর্মাদেশ, বাতাসের ত বাধা নাই, কে বলিবে সমুদ্র পার করিয়া অভয়ার স্পর্শটুকু সে আমার কাছে বহিয়া আনিতেছে না।"

মানবহৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত নিছক নিসর্গবর্ণনা শরৎ-সাহিত্যে বিরল। যে দুই একটি জায়গায় এইরূপ বর্ণনা আছে তথায়ও শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রাত্রির রূপের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। অজানা অন্ধকার তাঁহাকে দূর হইতে দূরে লইয়া যায় নাই, তিনি ইহার দুরধিগম্য রহস্যকে স্পষ্ট, মূর্তিমান্ ও নিকট করিতে চাহিয়াছেন। অগাধ বারিধি, গহন অরণ্যানী, শ্রীরাধার দুচক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল—ইহাদের সঙ্গে তুলিত হইয়া রূপহীন মৃত্যুও অপরূপ রূপে সজ্জিত হইয়াছে এবং কবি তাহার অভ্যগ্রপদধ্বনিকে, তাহার সর্বদুঃখভয়ব্যথাহারী অনন্তসুন্দর মূর্তিকে অভিবাদন করিয়াছেন। যাহা রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়, দূরস্থিত তাহাও নিকটে আসিয়া সহজ ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ইহাই শরৎচন্দ্রের নিসর্গ-বর্ণনার বৈশিষ্ট্য, ইহাতে বিস্তৃতির অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার তীব্রতা বা স্পষ্টতা অনস্বীকার্য। 'শ্রীকান্ত'র দ্বিতীয় পর্বে ও 'চরিত্রহীন'-এ ক্ষুব্ধ সমুদ্রের যে বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে উপরি-উল্লিখিত বর্ণনার মহিমা নাই, কিন্তু এই দুইটি সমুদ্রবর্ণনাও শরৎচন্দ্রের কবিপ্রতিভার সাক্ষ্য দেয়। শরৎচন্দ্র সমুদ্র-তরঙ্গের শুভ্র-কৃষ্ণ রূপটিকে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সমুদ্রের সীমাহীনতা

সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অচেতন নহেন, কিন্তু তাঁহাকে সমধিক মুগ্ধ করিয়াছে মহাতরঙ্গের ভয়ঙ্কর সুন্দর বিরাট মূর্তি: "জাহাজের গায়ে উদ্দাম তরঙ্গ শুভ্র ফেনের কিরীট মাথায় পরিয়া উন্মত্তের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, আবার ছুটিয়া আসিয়া আবার মিলাইতেছে।" (চরিত্রহীন)

"একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এভাব মনে আসে না, কারণ তা' হইলে হিমালয়ের যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার চাবুকের মত ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।"

"কিন্তু সমুদ্র জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে সেই জ্বালা নানাপ্রকারে বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতে পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।" (শ্রীকান্ত—দ্বিতীয় পর্ব)

শরৎচন্দ্রের রচনায় কবিকল্পনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার গদ্য শুধু যে কল্পনাসমৃদ্ধ তাহাই নহে, ইহার গতিও ছন্দোবদ্ধ বাক্যের গতির মত সুমধুর। প্রথমতঃ, একটি বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন একটি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে যে, পাঠক শ্রুতিমাধুর্যে বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এই সামঞ্জস্যরীতির একটি সরল উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি:

"কিন্তু এ না থাকা যে কি না থাকা, এ যাওয়া যে কি যাওয়া, তাহা সতীশের চেয়ে কে বেশী জানে! সরোজিনীর চেয়ে কে বেশী দেখিয়াছে! সাবিত্রীর চেয়ে কে বেশী শুনিয়াছে!"

এইরূপ সামঞ্জস্য খুব দুর্লভ নহে এবং ইহা আয়াসলব্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ রচনায় তিনি বিভিন্ন অংশের যে সামঞ্জস্য আনিয়াছেন তাহা অতিশয় কলাকৌশলময় হইলেও এমন সাবলীল যে মনে হয় ভাষা আপনা হইতেই ছন্দোবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি শরৎচন্দ্রের রচনা-সৌষ্ঠবের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন:

"বাহিরের মত্ত রাত্রি তেম্নি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেম্নি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল

ঝড়জল তেম্‌নি ভাবেই সমস্ত প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুইটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।"

এই বর্ণনায় প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের যে তুলনা আছে তাহা কবি-প্রতিভার পরিচয় দেয়, ইহার শব্দসম্পদ অতুলনীয়, কিন্তু ততোধিক অতুলনীয় বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য। প্রত্যেক বাক্যাংশের শব্দগুলিও ছন্দোবদ্ধ বাক্যের মত সাজান হইয়াছে। যে কোন একটিকে বিশ্লেষণ করিলেই এই মাধুর্য সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইবে :

আকাশের বিদ্যুৎ | তেম্‌নি বারংবার | অন্ধকার চিরিয়া | খণ্ড খণ্ড করিয়া | ফেলিতে লাগিল।

এই দুটি | অভিশপ্ত নরনারীর | অন্ধ হৃদয়তলে | যে প্রলয় | গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল।

শরৎচন্দ্রের গদ্যছন্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ইহার আর একটি প্রধান উপাদান বিশেষণের সুপ্রয়োগ। বিশেষণগুলি বিশেষ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া পদ্যের চরণের মত সুবিভক্ত হইয়া পড়ে :

"বিহ্বল যৌবনের | লালসামত্ত বসন্তদিনে।"
"নিন্দিত জীবনের | সঞ্চিত কালিমা।"

"সেই অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত নারী-রূপই | আজ | ষোড়শীর তৈলহীন বিপর্যস্ত চুলে | তাহার নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতায় | তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শুষ্কতায়, শূন্যতায়।"

"এই ভ্রষ্ট জীবনের | বিশৃঙ্খল ঘটনার | শতচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলি।"

"সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটের | সমস্ত নীরব মাধুর্যকে | সে | সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া | স্বপ্নাবিষ্টের মত | শুধু এই কথা | ······"

(২)

'শরৎচন্দ্রের ষ্টাইল বা রচনারীতির মাধুর্য উচ্চ প্রশংসা লাভ করিলেও তাঁহার রচনার বহু দোষও আছে। 'কিন্তু'র আতিশয্য, 'অন্তর্যামী'র ছড়াছড়ি, 'এম্‌নি হয়', 'এম্‌নি বটে' প্রভৃতির পুনরুক্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অবশ্য এইরূপ কোন শব্দ বা পদের আতিশয্য লেখকের মুদ্রাদোষ, ইহাকে রচনার মৌলিক ত্রুটি বলিয়া মনে করিলে গৌণ লক্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। কেহ

কেহ মনে করেন যে তিনি সংস্কৃতরচনারীতির সঙ্গে পরিচিত নহেন; সুতরাং তাহার রচনায় 'ব্যাকরণ বিভীষিকা'র বহু নিদর্শন রহিয়াছে এবং গুরুচণ্ডালী দোষেরও অভাব নাই।

কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের উপর সংস্কৃত ব্যাকরণরীতি প্রয়োগ করিতে যাইবার পূর্বে অন্ততঃ একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক সাহিত্যই আপনার গতিতে চলিয়া থাকে এবং শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রয়োগই এই গতির নিয়ামক। য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যই গ্রীক ও লাটিনের নিকট ঋণী; কিন্তু এই ঋণকে সাহিত্যিকেরা প্রয়োগ করিয়াছেন নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের রীতি অনুসারে। রুচিবাগীশ এই সকল অপপ্রয়োগে আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য তাঁহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছে। বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। 'সৃজন' ও 'ইতিপূর্বে' প্রভৃতি এখন সাধু প্রয়োগ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র 'সংবাদ'কে 'সম্বাদ', 'বারংবার'কে 'বারম্বার' করিয়াছেন, তাঁহার 'কিংবা' 'কিম্বা' হইয়াছে, তাঁহার 'সংবরণ' 'সম্বরণ' হইয়াছে। এই সকল অপপ্রয়োগ কানে ততটা না বাজিলেও, চোখে লাগে। ভবিষ্যতে এই সকল অপপ্রয়োগ গ্রাহ্য হইবে কিনা কে জানে। ইহাদের সমর্থন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। শুধু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে,—এই প্রকারের প্রয়োগ নিয়মবিরুদ্ধ হইলেও মারাত্মক নহে, এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত লেখকের রচনারীতি আলোচনা করিতে হইলে মৌলিক গুণ ও দোষের প্রতিই লক্ষ্য করিতে হইবে। কোন একটি পদ সংস্কৃতব্যাকরণ-সম্মত হইল কিনা তাহার আলোচনা মুখ্য নহে। প্রচলিত রীতিকে লঙ্ঘন করিবার অধিকার সেই সব লেখকেরই আছে, যাঁহারা নূতন সৃষ্টির দ্বারা সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইয়া দেন, যাঁহারা নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। এইসব ব্যতিক্রমই অপরের পক্ষে রীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। অবশ্য, এই সব প্রতিভাবান্ লেখকদের সকল প্রয়োগই স্বীকার্য নহে, এবং ইহাদের রচনা ত্রুটিশূন্য এমন কথাও বলা যায় না।

শরৎচন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ তাহার সুস্পষ্টতা ও বাস্তবপ্রিয়তা। কখনও কখনও তিনি কোন ভাবকে প্রত্যক্ষ করিতে যাইয়া তাহাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন অথবা কোন চিত্রকে বাস্তব করিতে যাইয়া উদ্ভট করিয়া ফেলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে:

"আমার সমস্ত মন উন্মত্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়াছে"

ঊর্ধ্বশ্বাসের উন্মত্ততা কষ্টকল্পনা। 'শ্রীকান্ত'র প্রথম পর্বে রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয়ের

যে বর্ণনা আছে তাহার ওজস্বিতা ও মাধুর্য অনন্যসাধারণ ; কিন্তু সেইখানেও অনাবশ্যক 'কিন্তু', 'ও', 'ই', 'ত' প্রভৃতির আতিশয্য আছে :

"আপনি সে যাই হউক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাহুক, কিন্তু এ কথাও ত সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা! এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোন মতেই অপমানিত করিতে পারে না!"

প্রত্যেকটি বাক্য শেষ হইয়াছে, বিস্ময়সূচক চিহ্নে। 'কিন্তু'র দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে, যদিও ইহার প্রয়োজন ছিল না ; 'ত', 'ই', 'ও'র বাহুল্য পীড়াদায়ক।

অন্যত্র দেখিতে পাই :

"তাহার দুর্বশ হৃদয় ও প্রবুদ্ধ ধর্মবৃত্তি—এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়া এই দুঃখের জীবনে তাহার তীর্থের মত সুপবিত্র হইয়া উঠিবে·········" (শ্রীকান্ত—তৃতীয় পর্ব)।

এই বাক্যটি ভাবে ও ভাষায় অতিশয় মধুর, কিন্তু প্রথম 'তাহার' অনাবশ্যক, দ্বিতীয় 'তাহার' শ্রুতিকটু।

এইরূপ অনাবশ্যক শব্দের প্রয়োগে আরও দুই একটি বাক্যের মাধুর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে :

"ইহা সৌন্দর্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে······" (দত্তা)।

উচ্ছ্বসিত হইয়াছে স্তোত্র ; 'ইহা' শুধু অনাবশ্যক নহে ; ইহার অন্বয় করাও অসম্ভব।

শরৎচন্দ্রের রচনায় উপমার ঐশ্বর্য অনন্যসাধারণ। অনেক বর্ণনায়ই একাধিক উপমা পর পর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কেহ কাহারও জায়গা জুড়িয়া বসে নাই। কিন্তু কোন কোন জায়গায় দুইটি বিচ্ছিন্ন উপমা একই বাক্যে মিশিয়া গিয়াছে। ইহাতে রচনার প্রসাদগুণের অভাব হইয়াছে। দুই একটি বাক্যে মিশ্র উপমার পরিচয়ও আছে :

"এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎ রেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল।" (আঁধারে আলো)

এই বর্ণনায় একটি চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে—তড়িৎরেখার ক্ষিপ্রগতি ও তীব্র

আলোক যাহার সাহায্যে ক্ষণেকের তরে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়। অনাবশ্যক 'জাল' শব্দটি কোন নূতন চিত্র আনিতে পারে না। ইহাকে ঠিক মিশ্র উপমা বলা যায় না। কিন্তু নীচের বাক্যটি এই দোষে দুষ্ট।

"শুধু দেখি একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে স্মৃতির আলোড়নে।" (শ্রীকান্ত—চতুর্থ পর্ব)

এই সব অপপ্রয়োগের মূলে রহিয়াছে রচনাকে ওজস্বী ও সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা। এই প্রকারের চেষ্টাই অতিভাষণে রূপান্তরিত হইয়াছে। অনাবশ্যক শব্দ, বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়া একই ভাবের পুনরুক্তি, বিশেষণের বাহুল্য—এই সব দোষ কতকগুলি বর্ণনার মাধুর্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে শরৎচন্দ্রের রচনাসৌষ্ঠবের একটি প্রধান উপাদান বিশেষণের সুললিত প্রয়োগ। আবার বিশেষণের বাহুল্যই অনেক বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতিকে রুদ্ধ করিয়াছে। শেষ বয়সের রচনায় এই দোষটি বেশী করিয়া পরিলক্ষিত হয়:

.. "মনে হইতেছে এই জীবনে যত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে তাহাদের সহিত আজিকার এই অনাগত নিশার অপরিজ্ঞাত মূর্তি যেন অদৃষ্টপূর্ব নারীর অবগুণ্ঠিত মুখের মতই রহস্যময়।" (শ্রীকান্ত—তৃতীয় পর্ব)

কল্পনার ঐশ্বর্যে ও সাঙ্কেতিকতায় এই বর্ণনা অনন্যসাধারণ। কিন্তু 'অনাগত', 'অপরিজ্ঞাত', 'অদৃষ্টপূর্ব', 'অবগুণ্ঠিত'—এতগুলি বিশেষণে বাক্যটি অনাবশ্যকরূপে ভারাক্রান্ত হইয়াছে।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে এইরূপ শব্দবাহুল্যের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। দুই একটির উল্লেখ করিতেছি:

"বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত, অর্থহীন।"

এই বিশেষণগুলির মধ্যে পরস্পরবিরদ্ধতা ও পুনরুক্তি—উভয় দোষই লক্ষিত হয়।

"কিছুই না জানিয়া একদিন এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রতি অজিতের অন্তর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেদিন কমল তাহার নির্জন নিশীথ গৃহকক্ষে এই অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আপনার বিগত নারীজীবনের অসংবৃত ইতিহাস একান্ত অবলীলায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল, সেদিন হইতেই অজিতের পুঞ্জিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আর যেন অবধি ছিল না।"

একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে 'অসংবৃত' ও 'একান্ত অবলীলায় উদ্‌ঘাটিত' একই ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু তাহা বাদ দিলেও,

ইহা প্রত্যেক পাঠকই লক্ষ্য করিবেন যে অতিরিক্ত বিশেষণের প্রয়োগে এই বর্ণনার সহজ গতি বাধা পাইয়াছে এবং তাহাই বাক্যকয়টির প্রধান ত্রুটি।

এইরূপ শব্দবাহুল্য 'শেষ প্রশ্ন', 'শ্রীকান্ত'র চতুর্থ পর্ব প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্র পাওয়া যায়। সর্বত্রই ইহা দোষাবহ হইয়াছে এমন নহে, তবে শরৎচন্দ্রের প্রথম যুগের রচনার প্রাঞ্জলতার পরিচয় এই সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই প্রকারের রচনায় যে সৌন্দর্য আছে তাহা সহজ সৃষ্টির সৌন্দর্য নহে। 'শ্রীকান্ত'র প্রথম পর্বে একখানা চিঠি আছে অন্নদাদিদির। চতুর্থ পর্ব নিকৃষ্ট হইলেও রাজলক্ষ্মীর পত্রের মাধুর্যকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই দুইখানি চিঠির প্রকাশভঙ্গীতে কত প্রভেদ।* উভয় রমণীই চিঠি লিখিয়াছে গভীর আবেগের প্রেরণায়। অন্নদাদিদির কথা প্রকাশ পাইযাছে সরল সহজ কথার মধ্য দিয়া। অন্নদাদিদি তাঁহার নিজের কাহিনী প্রকাশ করিতেই ব্যস্ত, তাহাকে অলঙ্কৃত করিতে চাহেন না। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনের সঙ্গে তাঁহার ভাষার অনাড়ম্বরতা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর পত্রে এই নিরাভরণ ঐশ্বর্যের পরিচয় নাই। রাজলক্ষ্মী মনে মনে জানে অনুমতি ব্যতিরেকে শ্রীকান্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, কাজেই শ্রীকান্তের সম্বন্ধে আশঙ্কাও এখন তাহার কাছে ঐশ্বর্যের মত। সে তাহার মনের কথাকে বাড়াইয়া গুছাইয়া অলঙ্কার-সমৃদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। রাজলক্ষ্মীর পত্রের প্রধান লক্ষণ ভাষার মন্থরতা ও বৈদগ্ধ্য। শরৎচন্দ্রের রচনার ইহা একটি সুন্দরতম নিদর্শন, কিন্তু প্রথম বয়সের রচনায় যে সহজ সাবলীলতা ছিল তাহা ইহার মধ্যে নাই।

এই প্রভেদ আরও সুস্পষ্ট হইবে অপর একটি দৃষ্টান্তে। উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে প্রথম সম্ভাষণ জানাইয়াছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া। দ্বারিকাদাস বাবাজির আখড়ায় সে আর একবার তাহার সঙ্গীতনৈপুণ্যের পরিচয় দিল,—সেও পাষাণপ্রতিমাকে খুসী করিতে ততটা নয়, যতটা 'দুর্বাসা মুনিকে' মুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে। প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত লিখিতেছে :

"গভীর রাত্রি পর্যন্ত যেন শুদ্ধমাত্র আমার জন্যই তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।"

এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত অথচ সঙ্কেতময়। বাইজীর শিক্ষা ও সৌন্দর্য কণ্ঠের মাধুর্যের সহিত মিশিয়া গিয়া এক অপরূপ কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছে যেখানে

* অবশ্য একথা মানিতে হইবে যে অন্নদাদিদি লিখিয়াছিলেন বালক শ্রীকান্তকে আর রাজলক্ষ্মী লিখিয়াছে তাহার প্রণয়ী শ্রীকান্তকে। ইহা সত্ত্বেও পত্র দুইখানির রচনার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য।

পৃথিবীর কোন কদর্যতাই প্রবেশ করিতে পারে না, গভীর রাত্রির অস্পষ্টতা তাহাকে আরও রহস্যময় করিয়া দিয়াছে। এখানে বাইজী শুধু গান করিয়াছে সমঝদার শ্রোতাকে মুগ্ধ করিবার জন্য নহে, বহুকালবিচ্ছিন্ন প্রণয়ীকে সম্ভাষণ করিবার জন্যও। তাই তাহার স্তব্ধতা শুধু গায়িকার বিশ্রাম নহে, প্রণয়িনী নিজের শিক্ষা ও সৌন্দর্য নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়া নীরব হইয়া পড়িয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে এই বর্ণনার প্রধান লক্ষণ ইহার সংক্ষিপ্ততা, তাহার জন্য বাইজীর রূপ ও গুণ, চতুর্দিকের মদোন্মত্ততা ও পরিশেষে সর্বব্যাপী স্তব্ধতা পরস্পর সম্পৃক্ত হইয়াছে। আর একটি লক্ষণ এই যে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (বিশেষ করিয়া 'কদর্য', 'মদোন্মত্ততা', 'ডুবাইয়া', 'স্তব্ধ') তাহারা অতি সহজে এক একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে।

চতুর্থ পর্বের বর্ণনা এইরূপ:

"গান সুরু হইল। সঙ্কোচের দ্বিধা কোথাও নাই।—নিঃসংশয় কণ্ঠ অবাধ জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। এই বিদ্যায় সে সুশিক্ষিত জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা, কিন্তু বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের এই ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী যে তাহার কণ্ঠস্থ তাহা কে জানিত। শুধু সুরে তালে লয়ে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায়, প্রকাশভঙ্গীর মধুরতায়, সে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল তাহা অভাবিত—'

এই বর্ণনায় কবি কল্পনার পরিচয় নাই, ইহা সমালোচকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। ইহা দীর্ঘ, অথচ ইহার মধ্যে সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র আছে মাত্র একটি। অধিকাংশ শব্দ গুণবাচক, 'সঙ্কোচের দ্বিধা', 'প্রকাশভঙ্গীর মধুরতা'—প্রভৃতি পদে একাধিক গুণবাচক বিশেষ্য একত্রিত হইয়াছে। 'বাক্যের বিশুদ্ধতা'—কথার তাৎপর্য গ্রহণ করাই কঠিন। পূর্ববর্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে যে সে প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের পদাবলী কণ্ঠস্থ করিয়াছে। তবে রাজলক্ষ্মী কি শুধু গায়িকা নহে, বৈষ্ণব পদাবলীর 'পাঠ' সম্পর্কেও অভিজ্ঞ? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে 'বাক্যের বিশুদ্ধতা' ও 'উচ্চারণের স্পষ্টতা'—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। এই প্রকারের প্রাণহীন বর্ণনা সম্পর্কে এইসকল প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। ইহার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে গুণবাচক বিশেষ্যের বাহুল্যে গায়িকা নিজে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যবিচারে শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র বহুবার বলিয়াছেন, তিনি গল্পলেখক, রসবিচারক নহেন। তবুও নানা সাহিত্যসভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন এবং সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে তুই একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। এই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার মত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হইলেও ইহাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।* এই যোগসূত্রটি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মতবাদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এবং ইহার অনুসন্ধান করিতে পারিলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের স্বরূপও সম্যক পরিস্ফুট হইবে।

শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও ইহাও দাবী করিয়াছেন যে আধুনিক সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই।"* রবীন্দ্রনাথের নিকট তিনি নিজের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সাহিত্য সম্পর্কে দীর্ঘতম প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (সাহিত্যের রীতি ও নীতি—বঙ্গবাণী, ১৩৩৪) রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রবন্ধের জবাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য শুধু ব্যঙ্গ ও কৌতুক, কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে যে সাহিত্যধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত ও রবীন্দ্রনাথের মতের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে। সাহিত্যসম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট মতটি কি এবং এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ হইতে তাঁহার পার্থক্য কোথায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটি অনির্বচনীয় ঐক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাহার অভিব্যক্তিই সাহিত্যের প্রধান কাজ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কখনও এই ঐক্য নিয়তির রূপ ধরিয়া তাঁহার কাছে প্রতিভাত হইয়াছে, কখনও ইহাকে তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়রূপে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়েই ঐক্যানুভূতিকেই তিনি

* বর্তমান আলোচনায় শরৎচন্দ্রের যে সকল প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি সন্নিবিষ্ট হইল সেই সকল প্রবন্ধ 'স্বদেশ ও সাহিত্য'-গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্যের উপজীব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্যে সন্ধান করিয়াছেন পরিপূর্ণতাকে ; যে শক্তি প্রাত্যহিকের প্রয়োজনে আপনাকে খণ্ডিত করে নাই, তাহাকে তিনি সৌন্দর্যের উৎস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই প্রকারের অনুসন্ধানে পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ আদর্শবাদী ; একটি বিরাট্ আদর্শ—তাহার নাম যাহাই হউক না কেন—তাঁহাদের সাহিত্যজিজ্ঞাসাকে উদ্বোধিত করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র এই পথের পথিক নহেন। সাহিত্যে তিনি মুক্তিবাদী। তিনি যে শুধু রাজনৈতিক বিদ্রোহ বা সামাজিক বিদ্রোহের কথা লিখিয়াছেন তাহাই নহে। তিনি বলিয়াছেন, "ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ।" এই মুক্তি সম্পর্কে তাঁহার ধারণা খুব ব্যাপক। তিনি মনে করেন যে, সাহিত্য কোন বিশেষ আদর্শের বাহন হইবে না। 'গুরুশিষ্য সংবাদ' নামক ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ তিনি রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু সেইখানে ভূমার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মতবাদ হইতে তাঁহার মতবাদ কত বিভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন, "পরব্রহ্মই ভূমা। তাঁর আনন্দের নামই ভূমানন্দ।······ভূমা অন্তবিশিষ্ট অনন্ত, আকারবিশিষ্ট নিরাকার—অর্থাৎ নিরাকার কিন্তু সাকার, যেমন কালো কিন্তু সাদা,—বুঝিলে ?" এই ব্যঙ্গোক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের উল্লেখ না থাকিলেও সাহিত্য সম্পর্কে ইহার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্রের নায়িকা রমা সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের রূঢ় উক্তির উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "এ ধিক্কার art-এর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।" প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিয়াছেন, "বছর কয়েক পূর্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমসাহিত্যসভায় একবার উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। দেখলাম তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে' বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্যরসিক বহু স্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন, বক্তার পর বক্তা—সকলের মুখেই ঐ এক কথা,—বঙ্কিম 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তি-যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। সকলের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়লো একা 'আনন্দমঠে'র 'পরে।···কিন্তু কেউ নাম করলেন না 'বিষবৃক্ষের', কেউ স্মরণ করলেন না একবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল্'কে।" আবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নীতির আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন শরৎচন্দ্র একাধিকবার তাহারও নিন্দা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের মতে সাহিত্য মানবাত্মার বন্ধনহীন অভিব্যক্তি। বাহির হইতে কোন আদর্শ, কোন দার্শনিক মতবাদ দিয়া তাহাকে বাঁধিলে চলিবে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "মন্দের ওকালতী করিতে কোন সাহিত্যিকই কোন দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতি শিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না।......একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক-দুর্নীতির মূলে হয়ত একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।" ইহাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যধর্ম। মানুষ ভূমার উপাসক নহে, পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবিমাত্র নহে, তাহার জীবন নীতিকথার উদাহরণমাত্র নহে। সে মানুষ, এবং কোন আদর্শের দ্বারা তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা সাহিত্যিকের কাজ। হৃদয়ের সত্যিকার অনুভূতি-আনন্দ-বেদনার আলোড়নকেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যের একমাত্র বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইবে শরৎচন্দ্র কি আদর্শবাদী না বস্তুতান্ত্রিক, আইডিয়ালিষ্ট না রিয়ালিষ্ট? এই দুইটি ইংরেজি ছাপের কোন্‌টি তাঁহার সম্পর্কে প্রযোজ্য, ইহা লইয়া শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজে এই বিতর্কের উল্লেখ করিয়া ইহার সমাধানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। আইডিয়ালিষ্ট ও রিয়ালিষ্টের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। আদর্শ খেচর পদার্থ নহে, তাহাকে পার্থিবজীবনে অন্ততঃ আংশিকভাবে সত্য হইতে হইবে। তাহাই আদর্শ যাহা আমরা অনুসরণ করি অথবা অনুসরণ করা উচিত বলিয়া মনে করি। বাস্তবপন্থীরা নিছক বাস্তব লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহারাও মূল্যবিচার করেন, আমার আদর্শ না থাকিলে কোন পদার্থেরই কোন মূল্যই থাকিবে না—আমার কাছে। বাস্তবপন্থীরা বলেন, এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে অথবা ঘটিয়া থাকে। ইহাদের বর্ণনা দেওয়াই সাহিত্যিকের উচিত। এই ঔচিত্য-বোধ বাস্তবঘটনার মধ্যে নাই। ইহা বাস্তবপন্থীর অ-বাস্তব আদর্শ। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। অথচ, কি করে যে এ-দু'টোকে ভাগ ক'রে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত।...যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলিনে, তেম্‌নি যা ঘটেনা, অথচ সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘট্‌লে ভাল হয়, কল্পনার মধ্যে দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।"

আদর্শবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা এই দুইটিকে একেবারে পৃথক্ রাখা না গেলেও সকল সাহিত্যিকই এই উভয় উপাদান সমানভাবে প্রয়োগ করেন না। কোন কোন সাহিত্যিক চরিত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে চাহেন, চরিত্রের বিশ্লেষণ ও বাহিরের পরিবেষ্টনীর সঙ্গে তাহার সংযোগের প্রতি তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। ইঁহাদিগকে আমরা Realist বলিতে পারি। আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন যাঁহাদের সাহিত্যিক প্রেরণা আসে কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে নহে; মানবজীবন ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁহাদের কতকগুলি ধারণা ও আদর্শ আছে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাঁহারা সেই ধারণাগুলিকে যাচাই করিয়া স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহেন। ইঁহাদিগকে আদর্শবাদী সাহিত্যিক বলা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র এই উভয় সম্প্রদায় হইতেই দূরে থাকিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে আদর্শবাদী অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিণতি দেখা যায় সেই সকল উপন্যাসে যেখানে মরা-ছেলে সন্ন্যাসীর মন্ত্রবলে প্রাণ পায় এবং সচ্চরিত্র দরিদ্র কালীভক্ত নায়ক স্বপ্নাদেশ-বলে সাত ঘড়া সোনার মোহর গাছতলা হইতে খুঁড়িয়া পাইয়া বড়লোক হয়। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্নদিগকেও তিনি এই বলিয়া সাবধান করিয়াছেন, "সংসারে যা কিছু ঘটে—এবং অনেক নোংরা জিনিষই ঘটে—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা Photography হ'তে পারে কিন্তু সে কি ছবি হবে?" শরৎচন্দ্র স্বচ্ছ মোহ-নির্মুক্ত দৃষ্টি ও অশৃঙ্খলিত মন লইয়া মানবজীবনকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন। তিনি নৈতিক বা কল্পনাপ্রসূত কোন আদর্শ বা আইডিয়ার দ্বারা নিজেকে ভারাক্রান্ত করিতে চাহেন নাই। এই হিসাবে তিনি বাস্তব-পন্থী বা Realist। কিন্তু পূর্বকল্পিত আদর্শের দ্বারা ভারাক্রান্ত না হইলেও তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে শুধু বাহিরের ঘটনা হিসাবেই দেখেন নাই। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার অন্তরালে অনুভূতির অনুধাবন। অনুভূতি দুর্নিরীক্ষ্য, এবং ঘটনার মধ্যে তাহার যে প্রকাশ হয় তাহা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ। এইজন্য যে সাহিত্যিক আনন্দ ও বেদনার আলোড়নকেই সাহিত্যের মৌলিক উপাদান বলিয়া গ্রহণ করেন তিনি আদর্শের দ্বারা চালিত না হইলেও বাহিরের ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে পারেন না। বেদনাবোধের প্রাচুর্য তাঁহাকে উদ্বেলিত করে এবং এই হিসাবে তিনি রোমান্টিক ও আদর্শবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কারণ অনুভূতিকেই কেন্দ্র করিলে বাহিরের ঘটনার প্রাধান্য কমিয়া যাইবে। বাহিরের ঘটনা শুধু অনুভূতির বাহন

হিসাবেই বর্ণিত হইয়া থাকে। অন্তর্লীন অনুভূতি অ-বাস্তব এবং আদর্শের মতই তাহা বাস্তব চিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। শরৎচন্দ্র নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমি ত জানি কি করে' আমার চরিত্রগুলি গোড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,("মানবের সুগভীর বাসনা, নরনারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ ক'র্বে না ত ক'র্বে কে?"*) মানবের এই সত্যকার পরিচয় গ্রন্থকারের কোন আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না—ইহাই শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য এবং এই হিসাবে তিনি বাস্তব পন্থী। কিন্তু 'সুগভীর' ও 'নিগূঢ়ে'র অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি বস্তুতান্ত্রিকতাকে অতিক্রম করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যকে আদর্শের ভার হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, যে অনুভূতি সকল সময়ে স্থায়ী হইয়া থাকে তাহা আদর্শেরই রূপান্তর মাত্র। অনুভূতিকে আদর্শ ও বাস্তবের শাসন হইতে মুক্ত করিয়াছেন বলিয়া শরৎচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টিতে ক্ষণিকতার জয়গান করিয়াছেন। তিনি বারংবার বলিয়াছেন যে, সাহিত্যে নিত্যবস্তু বলিয়া কোন পদার্থ নাই।' দাশু রায়ের পাঁচালী এক সময়ে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল, আজ তাহা বাসি মালার মত অনাদৃত। শকুন্তলা, চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবপদাবলী—ইহাদের আয়ুষ্কাল দাশু রায়ের পাঁচালীর আয়ুষ্কাল অপেক্ষা দীর্ঘ, কিন্তু তাহারাও অমর নহে। মানুষের মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। আজ যাঁহারা লাঞ্ছনা ও তিরস্কার লাভ করিতেছেন তাঁহাদেরও লজ্জার কারণ নাই, অনাগতের মধ্যে তাহাদের দিন আছে, শত বর্ষ পরের পাঠকসম্প্রদায় হয়ত তাঁহাদের সমস্ত কালিমা মুছিয়া দিবে। তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন নাই, "গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে।" কোন কালের কোন

---

* শুধু সাহিত্যে নহে পার্থিব বিচারেও তিনি নিগূঢ়কে প্রাধান্য দিয়াছেন। দেশবন্ধু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "লোকে বলিতেছে এত বড় দাতা, এত বড় ত্যাগী দেখি নাই। দান হাত পাতিয়া লওয়া যায়। ত্যাগ চোখে দেখা যায়, ইহা সহজে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ় বৈরাগ্য ?

আদর্শ তাহাকে খণ্ডিত করিতে পারিবে না, মানুষের অনুভূতির প্রতিচ্ছবি মানুষের মনের মতই চঞ্চল। জনৈকা পাঠিকাকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তুমি চিত্তরঞ্জন কথাটা নিয়ে অনেক লিখেচো, কিন্তু এটি একবার ভেবে দেখোনি যে ওটা দু'টো শব্দ। শুধু 'রঞ্জন' নয়, চিত্ত বলেও একটা বস্তু রয়েছে। ও পদার্থটা বদ্‌লায়।" এই দিক্ দিয়া কমল ও তাহার স্রষ্টার মতের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই চিত্তচঞ্চলতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। সাহিত্যে গতিশীলতার উপরে ঝোঁক দিয়াছেন বলিয়া শরৎচন্দ্র কোন কিছুকেই চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। (কমলের ভাষায়) "সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু।" গতির ছন্দ যাহাতে অব্যাহত থাকে শরৎচন্দ্র সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পক্ষ হইতে শুধু সেই দাবীই জানাইয়াছেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মতের পার্থক্য সহজেই প্রতিভাত হইবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্যে সন্ধান করিয়াছেন সার্বজনীনকে, চিরন্তনকে। তাহার মতে—"To detach the individual idea from its confinement of everyday facts and to give its soaring wings the freedom of the Universal: this is the function of poetry. Creation throbs with Eternal Passion, Eternal Pain." শরৎচন্দ্রও সাহিত্যকে বন্ধনহীন করিতে চাহিয়াছেন, তিনিও দৈনন্দিন ঘটনাকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি দৈনন্দিন ঘটনার অন্তরালে ক্ষণজীবী অনুভূতিকে রূপ দিয়া চরিত্রসৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, তাহার মতে অন্যান্য বন্ধনের মত বাস্তবাতীত আদর্শও সাহিত্য সৃষ্টির অব্যাহত গতিকে অবরুদ্ধ করে।

সাহিত্যে নশ্বরতায় বিশ্বাস করিতেন বলিয়া শরৎচন্দ্র কোন কিছুই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কি, তাহার মতে, আবর্জনারও মূল্য আছে। বহু গলিত পত্রে ভূমির উর্বরতা সাধিত হইলে সেইখানে বিরাট মহীরুহের জন্ম সম্ভবপর হয়। সৎসাহিত্যের অতিপ্রাচুর্য কোন সময়েই দেখা যায় না। তাহারও সৃষ্টি হয় বহু আবর্জনার মধ্যেই। যেদিন আবর্জনা থাকিবে না সেইদিন সৎসাহিত্যও থাকিবে না। বহুলোক যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত হইতেছে তাহাতে অন্ততঃ এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে দেশে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে এবং ইহারই প্রেরণায় সৎসাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইবে। এই জন্য শরৎচন্দ্র আবর্জনার মধ্যেও সার্থকতা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সাহিত্যিক মতের ঔদার্যের পরিচয় দেয়। তিনি বলিয়াছেন, "আবর্জনাই

সকল সাহিত্যের বনিয়াদ, তাহারাই সাহিত্যের অস্থি-মজ্জা···আবর্জনা যেদিন দূর হইবে, সেদিন যাহাকে তাঁহারা সার-বস্তু বলিতেছেন, সেও সেই পথেই অন্তর্হিত হইবে। আবর্জনা চিরজীবী হইয়া থাকেনা ; নিজের কাজ করিয়া সে মরে, সেই তাহার প্রয়োজন, সেই তাহার সার্থকতা।"[১]

(২)

শরৎচন্দ্র ক্ষণিক অনুভূতির অভিব্যক্তিকে সাহিত্যের মূল উপাদান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে তিনি Art for art's sake নীতিতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। যে অনুভূতি সাহিত্যের প্রাণ তাহা নিছক মরমী অনুভূতি নহে, তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট। সাহিত্যের যে অংশ শুধু অন্তর্দৃষ্টি বা নিছক অভিব্যক্তি তাহা হয়ত বিশ্লেষণাতীত প্রতিভা, কিন্তু তাহাই সাহিত্যের প্রধান বস্তু নহে। সাহিত্য-সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "সংজ্ঞা নির্দেশ করে' অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা' বুঝান যায়।" ইহা সাহিত্যিকের আইডিয়া, তাঁহার চিন্তা ও মত, ইহা অনুভূতিকে প্রভাবান্বিত করে, তাহার রসদ জোগায়। ইহা অভিব্যক্তির বিষয় এবং যুগে যুগে ইহার পরিবর্তন হয় বলিয়াই সাহিত্যেরও স্বরূপ বদলায়। সাহিত্যের যে চির-চঞ্চলতা, গতিশীলতার কথা তিনি বলিয়াছেন তাহারও মূল রহিয়াছে এইখানে—সাহিত্যে যে অনুভূতির প্রকাশ পায় তাহা ধরা-ছোঁয়ার অতীত পদার্থ নহে। তাহা কবির সমগ্র মনের সৃষ্টি, তাহার একাংশ বুদ্ধির দান। লোকের মতিগতিব পরিবর্তন হইয়াছে ; সুতরাং এখনকার পাঠক প্রতাপের আদর্শকে চবম বলিযা গ্রহণ করিতে পারে না, আবার রোহিণীব অপমৃত্যুকেও অকুণ্ঠিতভাবে শিরোধার্য করিতে পারে না। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিযাছেন, "বিষ্ণুশর্মার দিন থেকে আজও পর্যন্ত আমরা গল্পের মধ্যে থেকে কিছু একটা শিক্ষালাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।" কিন্তু যে কথা শিখিব তাহার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা অচল থাকে না ; তাই সাহিত্যেরও রূপ বদ্‌লায়। প্রকৃতপক্ষে প্রচারহীন সাহিত্য প্রচারও নহে, সাহিত্যও নহে, তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি, প্রত্যেক অনুভূতিরই রূপ আছে, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে অপর অনুভূতি হইতে পৃথক্ করিতে হইবে। ইহা বুদ্ধির কাজ। এমনি করিয়া ওতপ্রোতভাবে বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পৃক্ত হইয়া গিয়াছে এবং

এই কারণেই সাহিত্যে প্রচারনীতির প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "জগতের যা' চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তা'তেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণীতে আছে, ইব্‌সেন-মেটারলিঙ্ক-টলষ্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েল্‌স্‌-এ আছে।" এই জন্যই শরৎচন্দ্র সাহিত্য রচনায় বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহলমাত্রই নয়, কার্যকারণের বিচার।" "তাই বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্মপুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করা যায়, রূপকথা-সাহিত্য রচনাও করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে।"

সাহিত্য যে অনুভূতিকে প্রকাশ করে তাহা শুধু কল্পনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিরও স্থান আছে। কবি প্রতিভার কতটুকু অংশ কল্পনা ও কতটুকু অংশ বুদ্ধি এবং কেমন করিয়া ইহাদের সামঞ্জস্যের ফলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় রসতত্ত্বের ইহা একটি মৌলিক প্রশ্ন। শরৎচন্দ্র এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি রসস্রষ্টা, তত্ত্ববিচারক নহেন। তাঁহার আলোচনা খানিকটা সীমাবদ্ধ হইবেই। সাহিত্যবিচারে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান এই যে তিনি সাহিত্যিককে যথাসম্ভব ভাবমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি, এই অনুভূতি বাস্তবের মধ্যে জন্মলাভ করে এবং বাহিরের ঘটনার মধ্য দিয়া আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাস্তবকে বাদ দিয়া সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর হইবে না। আদর্শের জন্য মানবের আকাঙ্ক্ষা তাহার অনুভূতির অঙ্গীভূত হইতে পারে এবং সেই হিসাবে আদর্শও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে। কিন্তু বাহিরের কোন আদর্শের মাপকাঠিতে সাহিত্যের বিচার হইবে না, বাহিরের আদর্শের দ্বারা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে তাহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলা হইবে। আবার যে বাস্তব শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া যায় তাহা একের ভোগের বস্তু, তাহা বিশ্বমানবের ঐশ্বর্য হইতে পারে না। "সত্যকার যা ঐশ্বর্য সে চিরদিনই মানুষের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত।" এই ঐশ্বর্য অনুভূতির ঐশ্বর্য, দৈনন্দিন প্রয়োজন ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে ইহার যোগ থাকিলেও, ইহা তাহাদের অতীত, ইহা বিশ্বমানবের সম্পদ্। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সমন্বয় হইয়াছে বলিয়া শরৎচন্দ্র নিছক আদর্শবাদী নহেন, নিছক বস্তুতান্ত্রিকও নহেন। তিনি সাহিত্যকে প্রশস্ত, বন্ধনমুক্ত করিতে

চাহিয়াছেন, রসতত্ত্ব বিচারে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব; কোন আদর্শের খাতিরেই তিনি সাহিত্যের দাবীকে খাটো করিতে চাহেন নাই। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, ("সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা।") কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে সাহিত্যের চরম মূল্য সামাজিক লাভ-ক্ষতি ও রাজনৈতিক কলহ-মিলনের অনেক উর্ধ্বে। সাহিত্যবিচারে তিনি চিন্তার বিস্তৃতি ও মতের ঔদার্যের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল; শুধু রস-সৃষ্টিতে নহে রস-বিচারেও তিনি অনন্যসাধারণ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শেষের পরিচয়

['শেষের পরিচয়' উপন্যাস শেষ করিবার পূর্বেই শরৎচন্দ্রের জীবনাবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী এই গ্রন্থ শেষ করিয়া উপন্যাসাকারে প্রকাশ করেন। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর রচনা হিসাবে আনা হয় নাই। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে যে অংশ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল শুধু তাহার বৈশিষ্ট্যের বিচার করা হইয়াছে।]

মনে পড়ে কোন এক প্রসঙ্গে বার্ণার্ডশ' বলিয়াছিলেন যে তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন, কারণ কল্পিত পরিস্থিতিতে কল্পিত অথচ জীবন্ত নরনারীকে বসাইয়া তাহাদের মুখে ভাষা দিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। বার্ণার্ডশ' সকৌতুকে নাটক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উপন্যাস সম্পর্কেও তাহা প্রযোজ্য। উপন্যাসই হউক আর নাটকই হউক, তাহার মধ্যে একটি কল্পিত পরিস্থিতিতে কল্পিত নরনারীকে এমনভাবে কথা বলাইতে হইবে বা কাজ করাইতে হইবে যে মনে হইবে তাহারা জীবন্ত। কবি প্রজাপতির মত; তিনি নিত্য নূতন মানুষ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন যাহারা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া, ভাষা ও কার্যের মধ্য দিয়া প্রাণশক্তির প্রমাণ দিতেছে।

শরৎচন্দ্রের এই শক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি নরনারী ও শিশুকে নানা ঘটনাবিপর্যয়ের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে প্রাণবন্ত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন। যাঁহারা শুধু পরিস্থিতির বৈচিত্র্যের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারা চিরকালই বলিয়াছেন এই সকল ঘটনা অসম্ভাব্য; ইহারা চমক

লাগাইতে পারে, কিন্তু ইহারা সত্য নহে। বাইউলী পাঠশালার সাথীর উদ্দেশ্যে পবিত্র প্রেম সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, মেসের ঝি শুচিতার আদর্শ হইবে, রুগ্ন বন্ধুকে ফেলিয়া তাহার পত্নীকে লইয়া বন্ধু পলায়ন করিবে—এই সকল পরিস্থিতি একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সকল ব্যাপারকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে চলিবে না। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, সুরেশ ও অচলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই সকল অসম্ভব ঘটনাকে বিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল চরিত্রের অনন্যসাধারণত্ব অদ্ভুত ঘটনার সাহায্য ছাড়া প্রকাশিত হইতে পারিত না। 'শেষের পরিচয়' গ্রন্থে যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রথম দৃষ্টিতে অতিনাটকীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। কুলত্যাগিনী রমণী তের বৎসর পরে তাহার পরিত্যক্ত সন্তানের বিবাহে বাধা দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে এবং তাহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পূর্বেকার আশ্রিত যুবকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে এবং সেইখানে সেই স্বামীর সঙ্গে হঠাৎ তাহার সাক্ষাৎ হইল যে স্বামীকে তের বৎসরের মধ্যে সে দেখে নাই। সেই মেয়ের অসুখের উপলক্ষ্য করিয়া হঠাৎ সে সেই পুরুষের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইল যাহাকে আশ্রয় করিয়া তের বৎসর পূর্বে সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘ তের বৎসর সে যাহাকে সঙ্গ দান করিয়াছে। এমনি আরও অতিনাটকোচিত ব্যাপার এই কাহিনীতে আছে। ইহারা অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শরৎচন্দ্র যে রহস্যের সন্ধান করিতেছিলেন তাহার জন্য অনন্যসাধারণ চরিত্র ও বিস্ময়কর পরিস্থিতির প্রয়োজন হইয়াছে।

(২)

সেই রহস্যটি কি? শরৎচন্দ্র নারী হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নারীকে ন্যায্য মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কিনী বলিয়া অপাংক্তেয় করিয়া দিয়াছে, হৃদয়ের শুচিতায় অনুভূতির গৌরবে তাহারা অনন্যসাধারণ হইতে পারে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে বিধবার প্রণয়ে বাস্তবিক পক্ষে কোন কলঙ্ক নাই, রমা রমেশকে যে ভালবাসিত তাহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু তাহাতে গভীরতা বা পবিত্রতার অভাব ছিল না। শরৎচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছেন যে এই সকল রমণী শুধু যে সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী বিড়ম্বিত করিয়াছে সমাজের দেওয়া সংস্কার। রাজলক্ষ্মী, রমা প্রভৃতির হৃদয়ে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে গভীর প্রণয় ও

দুরতিক্রম্য ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে। তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই যে কোন্ শক্তি প্রবলতর অথবা কাহার মর্যাদা বেশী। অচলার চরিত্র বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র আরও একটু সাহসী হইয়াছেন। সেইখানে সংঘর্ষ হইযাছে অনুভূতি ও বুদ্ধির মধ্যে অথবা অনুভূতির অভ্যন্তরেই। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ রহস্য এই যে তথায় যে সকল গভীরতম অনুভূতি আছে তাহাদের মধ্যে অনেক সময় স্ববিরোধিতা থাকে। এই জন্যই তাহারা দুর্জ্ঞেয় ও অলঙ্ঘ্য। নিজে যাহাকে ভাল করিয়া বোঝা যায় না তাহাকে অপরের কাছে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় না এবং সেই কারণেই তাহাকে আয়ত্তে আনাও কঠিন। অচলা মনে করিত যে সে মহিমকে ভালবাসিত এবং সুরেশকে পরস্ত্রীলুব্ধ বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে সুরেশের প্রতি তাহার মন অগ্রসর হইয়াছে। সুরেশ যে অতিনাটকীয় ও দুঃসাহসিক উপায়ে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল ইহা যেন সেই গুহাস্থিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষারই প্রতীক। তাহার হৃদয়ে এই পরস্পরবিরোধী অনুভূতি কেমন করিযা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সে তাহা বুঝাইতে পাবে নাই। সমস্ত ব্যাপারটিকে সে দৈবের অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়াছেন। এই উপন্যাসের নায়িকা সবিতা স্বামীর প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ও ভক্তিমতী ছিল। কিন্তু সেই স্বামীকেই ত্যাগ করিয়া সে বাহির হইযা গেল রমণীবাবু নামক এক দূরসম্পর্কিত আত্মীয়ের সঙ্গে। পিছনে পড়িয়া রহিল তাহার তিন বৎসরের মেয়ে রেণু, তাহার ধর্মপরায়ণ স্বামী, গৃহদেবতা গোবিন্দজী এবং কুলবধূর মর্যাদা। তের বৎসর রমণীবাবুর রক্ষিতারূপে বাস করিবার পর সবিতার সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। কাহিনীর সেইখানেই আরম্ভ। তের বৎসর পরেও দেখি স্বামীর প্রতি সবিতার ভক্তি পূর্বের মতই অচলা, মেয়ের জন্য তাহার স্নেহ অম্লান এবং রমণীবাবুর বিরুদ্ধে তাহার বিতৃষ্ণার সীমা নাই। যদি মনে করা যাইত যে রমণীবাবুর সঙ্গে বসবাসের ফলে তাহার এই বিরক্তি আসিয়াছে তাহা হইলে প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া যাইত। তাহাকে 'ঘরে বাইরে'র মোহনির্মুক্ত বিমলার সঙ্গে তুলনা করা যাইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে তাহার চরিত্রের রহস্য আরও জটিল ও গভীর। যেদিন সে রমণীবাবুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছে সেইদিনও সে রমণীবাবুকে ভালবাসে নাই। অথচ তের বৎসর সে রমণীবাবুর ঐশ্বর্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রী দেহের যে শুচিতা রক্ষা

করিয়াছে সবিতা তাহা করে নাই। হয়ত সে মনে করিয়া থাকিবে যে, যে নারী কুলত্যাগ করিয়াছে, স্বামী ও কন্যার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে তাহার পক্ষে দেহকে অকলঙ্কিত রাখিয়া লাভ কি? কিন্তু প্রশ্ন এই, তবে সবিতা গৃহত্যাগ করিল কেন? গভীর নিশীথে অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া যাওয়ার সময় সে বলিয়াছিল, "তোমরা কেউ ওঁর গায়ে হাত দিও না। আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ী থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।" তবে তাহার গৃহত্যাগের কারণ কি রমণীবাবুর প্রতি অনুকম্পা? তাহাকে অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার ইচ্ছা? কিন্তু যে মানুষকে কোনদিন ভালবাসে নাই তাহার প্রতি এই অনুকম্পা তাহার হইবে কেন? বিশেষতঃ সে নিজে এইরূপ কোন ব্যাখ্যা দিয়া স্বীয় পাপকে হাল্কা করিতে চেষ্টা করে নাই। যদি রমণীবাবুর প্রতি দয়াই তাহাকে প্রণোদিত করিয়া থাকিত তাহা হইলে কোন না কোন সময়ে সে তাহার উল্লেখ করিত। তারপর একান্ত অনুগত রাখাল বাহিরের চক্রান্তের উপর যতই জোর দিক না কেন, ব্রজবাবুর গৃহে থাকিতে রমণীবাবুর সঙ্গে সবিতার সম্বন্ধ যে শুচিতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যে অবস্থায় নির্জন গৃহে গভীর নিশীথে তাহাদিগকে পাওয়া যায় তাহার ব্যঞ্জনাই যথেষ্ট। সবিতা নিজে তাহার পদস্খলনকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইয়াছে। স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বেকার আচরণকে সে কখনও অনিন্দনীয় বলিয়া মনে করে নাই। অথচ স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির অভাবও তাহার কোনদিনই হয় নাই। তবে কেন তাহার পদস্খলন হইয়াছিল? নারী-হৃদয়ের রহস্যের ঠিক এই দিকটা শরৎচন্দ্র অন্য কোন উপন্যাসে উদ্ঘাটিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। অথচ পূর্ববর্তী উপন্যাসে তিনি যে সকল সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে এই উপন্যাসের সমস্যার সংযোগ আছে। তিনি বহু পদস্খলিতা রমণীকে তাঁহার উপন্যাসের কেন্দ্র করিয়াছেন, নানা দিক দিয়া তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনি তাহাদের জীবনের মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন—ইহাদের পদস্খলন হয় কেন এবং সেই পদস্খলন ইহাদের জীবনের বা চরিত্রের উপর রেখাপাত করে কি না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই উপন্যাস সত্য সত্যই শরৎচন্দ্রের শেষ পরিচয় দেয়।

যে সুগভীর কলঙ্কের বোঝা লইয়া সবিতা সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল তাহার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পায় নাই। সে জোর করিয়া বলিয়াছে যে রমণীবাবুকে সে কোনদিনই ভালবাসে নাই, কোনদিন শ্রদ্ধা করে নাই, নিজের

স্বামী অপেক্ষা কোনদিন বড় মনে করে নাই, যেদিন গৃহত্যাগ করিয়াছিল সেই-দিনও নহে। সে নিজেকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু উত্তর পায় নাই। তাহার স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিয়াছে, কিন্তু স্বামীর প্রশ্নের সে উত্তর দিতে পারে নাই। সে বলিয়াছে যেদিন নিজে সে উত্তর পাইবে সেইদিন স্বামীকে তাহার উত্তর জানাইবে। অথচ রমণীবাবুকে সে ত্যাগ করিয়াছে জীর্ণ বস্ত্রের মত, কি তদপেক্ষা কোন হেয় বস্তুর মত। তাহাদের যৌথ জীবনযাত্রার যে চিত্র পাই তাহাতে মনে হয় কোনদিন ইহাদের মধ্যে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। রমণীবাবু প্রতিদিন আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পান ও দোক্তায় একটা গাল আঁবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচি-কর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিয়াছে,—তাহার লালসালিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধীরতা—এই কামার্ত অতিপ্রৌঢ় ব্যক্তির বিরুদ্ধে পবতাকার ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া প্রতি রাত্রে সে তাহার শয্যাসঙ্গিনী হইযাছে। তবু এই ভাবে তাহার একযুগ কাটিয়া গিয়াছে। এক যুগ কাটিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহারই সংস্পর্শে আসিয়া তাহার পদস্খলন হইয়াছিল কেন? এই 'কেন'র সে কোন জবাব খুজিয়া পায় নাই, বার বৎসরের অধিককাল ধরিয়া সে ইহার আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু উত্তর পায় নাই, সারদার প্রশ্নের উত্তরে সে বলিয়াছে, "পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচম্কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়"। নিজের হৃদয়ের অলিতে গলিতে সঞ্চরণ করিয়া এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সবিতা এই রহস্যের সন্ধান পায় নাই। ইহা তাহার স্রষ্টারও শেষ উত্তর কিনা বলিতে পারি না। হয়ত শরৎচন্দ্র মনে করিয়া থাকিবেন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে যৌন আকর্ষণ তাহার সঙ্গে হৃদযের অনুভূতির সম্পর্ক কম, ইহাকে বুদ্ধি দিয়া বিচার করা বা যাচাই করা অসম্ভব। ইহার মধ্যে কোন 'কেন' নাই।

ঔপন্যাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসাই করুন আর প্রশ্নের উত্তরই দিন তাঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নরনারীর সম্পর্কের জীবন্ত ছবি আঁকিবেন; তাঁহার চিত্রের মধ্য দিয়া হৃদযের রহস্য প্রতিবিম্বিত হইবে, তাহার জিজ্ঞাসা সমাধানের সঙ্কেত দিবে। সবিতার চরিত্র যদি সম্পূর্ণ হইতে পারিত তাহা হইলে হয়ত অসতর্ক কথার মধ্য দিয়া অথবা তাহার ব্যবহারের দ্বারা এই রহস্য সুস্পষ্ট হইতে পারিত। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ চিত্র আমরা পাই না। যে উপন্যাস ঔপন্যাসিক শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও আলোচনা সম্ভব

নহে। তবু একটা কথা মনে হয়। গ্রন্থের মূল বিষয় হইল পদস্খলিতা নারীর চরিত্র অঙ্কন। অথচ উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে পদস্খলনের তের বৎসর পরে এবং কাহিনী অগ্রসর হইতে না হইতেই প্রতিনায়ক রমণীবাবুর অন্তর্ধান হইয়াছে। কাহিনীতে দুইটি ব্যাপার প্রাধান্য পাইয়াছে—সবিতা তাহার স্বামীর কাছে আশ্রয় চাহিয়াছে আর বিমলবাবু সবিতার নিকট আসিতে চাহিয়াছেন। সবিতার স্বামী ও মেয়ে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে তাহাদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। বিমলবাবু বন্ধুত্ব দাবী করিয়াছেন ও পাইয়াছেন, কিন্তু নরনারীর সম্পর্ক যেখানে গভীর, নিবিড় ও রহস্যাচ্ছন্ন এই বন্ধুত্ব সেইখানে পৌঁছায় নাই। সুতরাং কি ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র সবিতার চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতেন এবং ইহাকে তিনি পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দিতে পারিতেন কিনা তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সবিতার চরিত্রে তিনি একটি পরমাশ্চর্য রমণীর চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহার মধ্য দিয়া নারীহৃদয়ের গোপনতম ও গভীরতম রহস্যের প্রতি আলোকসম্পাত করিয়াছেন। অসম্পূর্ণ হইলেও এই উপন্যাস তাহার প্রতিভার স্বকীয়তার পরিচয় দেয়।

—

নির্ঘণ্ট

১

২

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী